ব্রিটিশ ভারতে হবিগঞ্জ

মুহম্মদ সায়েদুর রহমান তালুকদার

ব্রিটিশ ভারতে হবিগঞ্জ
মুহম্মদ সায়েদুর রহমান তালুকদার

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ১৪৪২ হিজরী

প্রকাশক ও গবেষণা সহযোগী
ইকবাল মাহমুদ

প্রচ্ছদ
মাহমুদ সাজ্জাদুর রহমান তালুকদার

মুদ্রণ
ইমপ্রেশন্স, ৬০ / সি নয়াপল্টন, ঢাকা।

পরিবেশক :
শব্দকথা প্রকাশন
হোল্ডিং ৩৪৩৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, হবিগঞ্জ।

মূল্য : টাকা : ৩০০

British Bharotae Habiganj by Mohammed Sayedur Rahman Talukdar
Published by Iqbal Mahmud, cell. 01942383037
Tk. 300 Only.

উৎসর্গ

প্রিয় দৌহিত্র

ওয়াসিফ রহমান তালুকদারকে

লেখকের অন্যান্য বই

হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস
প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ
হাওর : স্বরূপ ও সমস্যা
মুক্তিযুদ্ধে মাধবপুর
বেদনার নীলে (কাব্য)
মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও মুক্তিবাহিনীর প্রথম সদর দপ্তর তেলিয়াপাড়া
জননেতা আব্দুস সামাদ আজাদ (সম্পাদনা)
মুক্তিবাহিনীর উপ-সর্বাধিনায়ক লে. কর্নেল এম এ রব (সম্পাদনা)
বাংলাদেশের হাওর (প্রকাশিতব্য)
মাধবপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য (অপ্রকাশিত)
হবিগঞ্জের প্রবাদ-প্রবচন (অপ্রকাশিত)
মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিসাক্ষী তেলিয়াপাড়া (অপ্রকাশিত)

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইতিহাস সমাজের দর্পন। সমাজ-ইতিহাসের গবেষক তাঁর গবেষণাধীন বিষয়ের নতুন ব্যাখ্যা ও পাঠ নির্মাণের চেষ্টা করেন। সেসব ব্যাখ্যা তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন তা তথ্য ও তত্ত্বের বিচারে সঠিক ও সত্যনিষ্ট হয়। যাঁরা তথ্য ও তত্ত্বের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে আন্তরিক তাঁরা স্থানীয় ইতিহাস রচনার মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখেন। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, স্থানীয় ইতিহাসের বস্তুনিষ্টতা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস রচনা অসম্ভব। স্থানীয় ইতিহাস বলতে জেলা উপজেলা কিংবা গ্রামের ইতিহাসকেও বুঝানো যেতে পারে।

স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে কাজ করা সহজ কাজ নয়। সার্থকতার সঙ্গে এই কাজ সম্পন্ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট স্থান সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা দরকার। এজন্য নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হয়; বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়; প্রবীণ লোকদের সাক্ষাৎকার নিতে হয়; প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনা পরিদর্শন করতে হয় এবং নানা জনের অবজ্ঞা আর অবহেলার তীর্যক বাক্যবাণও সহ্য করতে হয়। এ সমস্ত কাজ করতে গিয়ে একজন গবেষককে যে কতটা পরিশ্রম করতে হয় তা কেবল ভুক্তভোগীই জানেন।

এই গ্রন্থের লেখক মুহম্মদ সায়েদুর রহমান তালুকদার একজন শেকড়সন্ধানী আঞ্চলিক ইতিহাস-গবেষক। তিনি হবিগঞ্জ জেলাভিত্তিক অনেক কাজ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে হবিগঞ্জের ইতিহাসের নানা দিক উন্মোচনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। হবিগঞ্জের ইতিহাস চর্চায় ইতোমধ্যে তিনি অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। *ব্রিটিশ ভারতে হবিগঞ্জ* এই জেলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে ঔপনিবেশিক আমলের হবিগঞ্জের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। কোনো সন্দেহ নেই, এটি হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য দলিল। এর মাধ্যমে হবিগঞ্জবাসী কেবল নিজেদের অতীত জানার সুযোগ পাবেন তা নয়, জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার অনেক উপাদানও তাদের হাতের কাছে থাকবে।

বইটিতে ৯টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটিশ উপনিবেশ ও আঞ্চলিক সীমানাগত অস্থিরতা বর্ণিত হয়েছে। এরপরে প্রশাসনিক ক্রমবিকাশ, ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, পরগণা পরিচিতি, আসাম প্রদেশকাল ও সাবডিভিশন গঠন, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনীতি চর্চা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষ অংশে হবিগঞ্জ নামকরণ সম্পর্কে একটি তথ্যভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে লেখক এ সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠিত অথচ ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। বহু তথ্যের ভিত্তিতে তিনি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, ১৭৮৬ সালের পূর্বেই এই স্থানটি হবিগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল– যাকে ইবনে বতুতার বর্ণনায় ‘হবঙ্গ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, ‘হবঙ্গ’ থেকে হবিগঞ্জ নামের উৎপত্তি। তিনি এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতে হয়তো এই তথ্য আবিষ্কৃত হবে, ইবনে বতুতার হবঙ্গ বা হবিগঞ্জ স্থান-নামের ঐতিহাসিক তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েই তৎকালীন প্রশাসন নব প্রতিষ্ঠিত সাবডিভিশন-এর নামকরণ করেছিল।

এই গ্রন্থে লেখকের দেয়া সব তথ্য ও বিশ্লেষণ সকলে গ্রহণ করবেন এটা মনে করা যাচ্ছে না। কিছু বিষয়ে হয়তো ভিন্নমত ও বিতর্ক হবে। ইতিহাসের গভীর অনুসন্ধান ও সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখকের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হতে পারে। *ব্রিটিশ ভারতে হবিগঞ্জ* গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটি পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

সেপ্টেম্বর ২০২০

ড. জালাল আহমেদ
পরিচালক
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

লেখকের কথা

পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটার পর এ দেশে কোম্পানি শাসনের সূচনা হয়। তখন কোম্পানি বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি লাভ করে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করত ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করে প্রত্যক্ষভাবে শাসন কার্যে অংশ নেয়। তিনি তখন প্রথম সমন্বিত জেলা সৃষ্টি করে সারা দেশকে মোট ১৯টি জেলায় বিভক্ত করেন। তৎকালীন জেলাগুলোর নাম যথাক্রমে হুগলী, মোহাম্মদশাহী, নদীয়া, দিনাজপুর, রংপুর, বীরভূম, যশোর, ঢাকা, রাজশাহী, লস্করপুর, রোকনপুর, ত্রিপুরা, কলিন্দা (নোয়াখালী), জাহাঙ্গীরপুর, চুনাখালি, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, ও কলকাতা। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে জেলা প্রথা প্রত্যাহার করে জেলার পরিবর্তে দেশকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রদেশগুলোর নাম যথাক্রমে কলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ঢাকা। সিলেট ছিল লস্করপুর জেলার অন্তর্গত এবং বিভাগ সৃষ্টির পর তা ছিল ঢাকার অধীন।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে জারীকৃত ভারত শাসন আইনের বলে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে ন্যাস্ত হয়। রানী ভিক্টোরিয়া তখন থেকে ভারতের শাসনভার নিজ হতে তুলে নিলে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপরে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করার জন্য যে নোটিফিকেশন জারি হয় তাতে সদর, সুনামগঞ্জ, লস্করপুর ও লাতু বা করিমগঞ্জ নামে ৪টি সাবডিভিশনের (মহকুমা) কথা বলা হয়েছে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাবডিভিশনের কার্যক্রম লস্করপুরেই শুরু হয়।

পরবর্তীতে তা যখন লস্করপুর থেকে স্থানান্তরিত হয় তখন থেকে হবিগঞ্জ নামের প্রচলন শুরু হয়। হবিগঞ্জে মহকুমা কার্যালয় স্থানান্তরের পর থেকে লস্করপুর নামের কোনো ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু ইতিহাসকে তো আর অস্বীকার করার সুরেযাগ নেই। তাই হবিগঞ্জ নামকরণ ও প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে এর ব্যাবহার বিষয়ে ধারণা ার্জন একান্ত প্রয়োজন।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গের অস্তিত্বের সাথে হবিগঞ্জ অঞ্চলের সম্পর্ক নিবিড় তা ‘হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস’ গ্রন্থে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে তখন এ অঞ্চলটি ‘হবিগঞ্জ’ নামে ছিল না। প্রাচীন কালেতো নয়ই ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ‘হবিগঞ্জ’ নামে কোনো প্রশাসনিক স্থান-নামের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় না। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ‘হবিগঞ্জ’ নামে মহকুমা প্রতিষ্ঠার কাল থেকে হবিগঞ্জ প্রশাসনিক ইউনিটের মর্যাদা লাভ করে। এর আগে লস্করপুর, নবীগঞ্জ ও শঙ্করপাশা এই ৩টি রাজস্ব জিলায় হবিগঞ্জ অঞ্চল বিভক্ত ছিল।

মোগল আমল থেকে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম ভাগে এ অঞ্চলটি বিভিন্ন পরগণা প্রশাসনে এবং তৎপরবর্তী শতাধিক বছরকাল ৩টি রাজস্ব জিলা প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের ভ্রমণ বৃত্তান্তে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলায় 'হবঙ্ক' বা 'হবঙ্গ' নামে যে শহরের কথা উল্লেখ করেন, কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে তা-ই বর্তমান কালের হবিগঞ্জ। প্রাচীন যুগ থেকে এ হবিগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন রাজ্য বা প্রশাসনিক ইউনিট স্ব স্ব স্থান নামের পরিচয়ে পরিচিত ছিল।

ব্রিটিশপূর্ব কালের সে সব বিষয় 'হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে ব্রিটিশ শাসনকালে ইতিহাসের উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সম্মিলিত ভাবে হবিগঞ্জের আঞ্চলিক বিষয়ে ইতিহাসে বিশদ আলোচনার সঙ্কট ছিল। সিলেটের ইতিহাস আলোচনায় হবিগঞ্জ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে খুবই সীমিতভাবে আলোচিত হয়েছে মাত্র।

ব্রিটিশ শাসনকালে এর বিভিন্ন অংশ কখনও সিলেট, কখনও ঢাকা, কখনও ত্রিপুরা (কুমিল্লা), কখনও বা ময়মনসিংহের সাথেও সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। কোথাও এর ধারাবাহিক বিবরণ না থাকায় কালের পরিক্রমায় এর গ্রন্থনা কিছুটা ছন্দহীন মনে হতে পারে। এখানে কেবল ইতিহাসের উপাদান সন্নিবেশ করাকেই গুরুত্ব দেয়া হল। এ বিষয়গুলো বিস্তারিত ভাবে আলোচনার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কারণেই সংক্ষিপ্তাকারে বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশ ও এ অঞ্চলে তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা একান্ত আবশ্যক।

অতীতে হবিগঞ্জের ইতিহাস বিষয়ে পৃথকভাবে গুরুত্ব সহকারে কোনো আলোচনা না হলেও সম্প্রতি বিভিন্ন গুণীজন বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন। ইতোমধ্যে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। কেউ কেউ সিলেটের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার সাথেও হবিগঞ্জ প্রসঙ্গটিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এতে অনেক অজানা তথ্য সামনে চলে আসছে। গবেষণার ক্ষেত্রে এসব বিষয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে মারাত্মক বিভ্রান্তিরও জন্ম দিচ্ছে। এর কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্যের সূত্র উল্লেখ না করা।

অসতর্কতার কারণেই হোক কিংবা মুদ্রণজনিত কারণেই হোক কিছু কিছু তথ্য বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। সূত্রের উল্লেখ পূর্বক এ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তব্যানুরোধে বিনয়ের সাথে তুলনামূলক আলোচনাও করতে হয়েছে। এ জন্যে আমি আমার পূর্বসুরি সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এখানে আন্তরিকতার সাথে মোটামুটি নির্ভুল একটি তথ্যচিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মফস্বলে তথা গ্রামে বসে অধিক রেফারেন্স বই পাওয়া কতটা দুঃসাধ্য তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। সীমিত সামর্থ্যের আওতায় গ্রন্থটি রচনার কাজ সমাপ্ত করা হলো। তাই নির্ভুল দাবি করার মতো ধৃষ্টতা দেখাবো না। তবে যেটুকু পেরেছি তাতে যদি বিদগ্ধ পাঠক মহলের হাজারো প্রশ্নের সামান্য জবাবও পাওয়া যায় তবেই শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

বইটিতে প্রদত্ত তথ্যসম্ভার অপ্রতুল বা অসম্পূর্ণ বিবেচিত হতেই পারে। এ জন্যে যেকোনো মন্দভাষণ হজম করার ধৈর্য আমার আছে। যে কেউ যৌক্তিক আলোচনা-সমালোচনা করলে প্রীত হবো। যদি কোনো সহৃদয় পাঠক গ্রন্থে পরিলক্ষিত ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবগত করেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে তা প্রতিস্থাপন করে আগামী প্রজন্মের হাতে একটি নির্ভুল ইতিহাস উপহার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ!

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

মহান আল্লাহ সবার সহায় হোন!

তারিখ : সেপ্টেম্বর ২০২০

মুহম্মদ সায়েদুর রহমান তালুকদার

কালিকাপুর (বড়বাড়ি)

বাঘাসুরা, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

sayedur59@yahoo.com

মোবাইল : ০১৭২৬ ৩৪২০৬০

প্রথম অধ্যায়

ব্রিটিশ উপনিবেশ ও আঞ্চলিক সীমানাগত অস্থিরতা

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের কতিপয় ব্যবসায়ী ত্রিশ হাজার পাউণ্ড (সাড়ে চার লাখ টাকা) মূলধন নিয়ে একটি যৌথ কোম্পানি গঠন করে। পর বছর ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট থেকে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে সনদ লাভ করে ভারতের সাথে ব্যবসা শুরু করে। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে একটি অনুমতিপত্র নিয়ে ওরা সুরাট বন্দরে প্রথম বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করে।[১]

১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা দুর্ঘটনাক্রমে অগ্নিদগ্ধ হলে তার চিকিৎসার জন্য সুরাটে অবস্থানরত ইংরেজ চিকিৎসক ডা. গ্যাব্রিল বাউটনকে নিযুক্ত করা হয়। তার চিকিৎসায় শাহজাদী জাহানারা অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। এতে ডা. বাউটনের গুণমুগ্ধ হয়ে তার অনুরোধে সম্রাট ইংরেজ বণিকদেরকে কতিপয় ক্ষেত্রে বিনাশুল্কে বাঙলায় বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন। সে বছরের শেষ ভাগে ওরা বাংলায় এসে উপস্থিত হয়। তখন সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র শাহ শুজা বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার। এ সময়ে শাহ শুজার পরিবারের জনৈক মহিলা কোনো এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন। ডা. বাউটনের চিকিৎসায় তিনিও আরোগ্য লাভ করেন। এর পুরস্কার স্বরূপ শাহ শুজা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বার্ষিক তিন হাজার টাকা নজরানায় ইংরেজদেরকে লিখিত ভাবে বাঙলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেন। যার ফলে এ দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তার ঘটে।[২]

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। তখন ইংরেজরা বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও কৌশলগত কারণে নিজেদের হাতে শাসন ক্ষমতা না রেখে তাদের এ দেশীয় বিশ্বাসভাজন দোসরদেরকে নবাব নিযুক্ত করে যাবতীয় ব্যবসায়িক সুবিধা ভোগ করতে থাকে।

অতঃপর ১২ আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে লর্ড ক্লাইভ বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের শর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।[৩] একই সময়ে (১৭৬৫ খ্রি.) সিলেটও (শ্রীহট্ট) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে।[৪]

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সিলেট মোগল অধিকারে আসে। 'সরকার সিলেট' মোগল শাসনামল থেকেই বাংলার নবাবদের অধীন ছিল। অর্থাৎ ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার ১৯টি সরকারের মধ্যে সিলেট অন্যতম।[৫] যথা : ১. প্রতাপগর (পঞ্চখণ্ড) ২. বানিয়াচঙ্গ ৩. বেজোড়া বাজু ৪. জৈন্তা ৫. হাবেলী সিলেট ৬. সতরখণ্ডল ৭. লাউড় ৮. হরনগর, রায়তি ও সাইর।[৬] তন্মধ্যে বানিয়াচঙ্গ ও

বেজোড়া সম্পূর্ণভাবে এবং লাউড় আংশিকভাবে[৭] হবিগঞ্জ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসন কালে সিলেটের নানা রকম প্রশাসনিক রদবদলের সাথে সাথে হবিগঞ্জ অঞ্চলের প্রশাসনিক রদবদল ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পরেও মোগল আমলের সরকার ব্যবস্থা বহাল ছিল। তখনও সরকারের প্রধান ছিলেন ফৌজদার, ভূমি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রধান ছিলেন আমিল এবং বিচার ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন কাজী। তাদের পৃথক পৃথক অধিক্ষেত্র ছিল। ফৌজদারের এলাকাকে সরকার, আমিলের এলাকাকে পরগণা এবং কাজীর এলাকাকে জেলা বলা হত।[৮] তখন সিলেটের বিস্তৃতি ছিল বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল (সতর খণ্ডল) পর্যন্ত।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের সময়ে সিলেটের আয়তন ছিল ২৮৬১ বর্গমাইল।[৯] তখন সরকার সিলেটের ফৌজদার ছিলেন মুহম্মদ আলী খান কুইমজং (১৭৬৩-১৭৬৫)।[১০] এরপরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হতে ফৌজদার হিসেবে নিয়োগ পান ১. ভিকু খান (১৭৬৫) ২. হায়দর আলী খান (১৭৭৮) ৩. সৈয়দ কুতুব (১৭৮২) ৪. আজাদ খান (১৭৮৪) ৫. মুরিদ খান (১৭৮৫) ৬. নওয়াব মোবারক-উদ-দৌলা (১৭৮৮) ৭. এহতেশাম খান (১৭৯২) ৮. সাদাকাত আলী খান (১৮০৬) ৯. মুহাম্মদ হাদী (১৮০৮-১৮১০) এবং নায়েব ফৌজদার হিসেবে নিয়োগ পান ১. মুহাম্মদ হাদী ২. আবু তোরাব খান ৩. কাসিম খান ৪. গোনার খান। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে গোনার খানের সময় থেকেই নায়েব ফৌজদার পদের সমাপ্তি ঘটে। নায়েব ফৌজদারগণের ভূমি দানের কোনো ক্ষমতা ছিল না।[১১]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সময় থেকে সিলেট ছিল ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলা গঠিত হওয়ার সময়ও এ জেলা ঢাকার অধীনে ছিল। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে[১২] চিফ কমিশনার পদধারী একজন কর্মকর্তার কর্তৃত্বে আসাম প্রদেশের কার্যক্রম শুরু হয়।

এ বিষয়ে সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে:

> *Until 1874 Sylhet formed an integral part of Bengal, being included in the Dacca Division, but in that year, by a Proclamation, dated the 12th September, it was transferred to the newly created province of Assam, together with the adjoining district of Cachar.*[১৩]

প্রদেশ গঠনের পর নানা বিবেচনায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিলেটকে আসামের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন পর্যন্ত সরকারের ধারণা ছিল, শাসন বিষয়ে সরকারের যে কোনো সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ নির্বিবাদে মেনে নিবে। কিন্তু তা হয়নি। সিলেটবাসী এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ একসময় ব্যাপক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করলে সরকারের টনক নড়ে। আন্দোলন সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থ ব্রুককে সিলেটে আসতে হয়।

আসাম প্রদেশভুক্তি

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্রহ্মরাজ্যের সাথে এক সন্ধিবলে আসাম ইংরেজদের শাসনাধীনে আসে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কাছাড় ইংরেজদের হস্তগত হয়। এর পরে গারো পর্বত, খাসি পর্বত, জয়ন্তিয়া পর্বত, নাগা পর্বত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ব্রিটিশ কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করে। তখন এই বিজিত অঞ্চলের শাসনভার ছিল বাঙলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সির সিলেট, গোয়ালপাড়া ও কাছাড় এ তিনটি জেলাসহ আসামকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট চিফ কমিশনারশিপ গঠন করা হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক এবং সামরিক গুরুত্ব বিবেচনায় লুসাই পাহাড়কে আসামের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের চিফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড বাংলা হতে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামকে আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক বাধার কারণে তা বাস্তবায়ন হয়নি।[১৪]

আসামের তৎকলীন জনগণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠী হওয়ায় তারা আইন-কানুন বিষয়ে তেমন কোনো ধারণাই রাখতো না। তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড নর্থব্রুক। প্রশাসন থেকে উক্ত অঞ্চলে পৃথক চিফ কমিশনার নিয়োগ করার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, আসামের আয় ও লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প। যা দিয়ে প্রশাসনের ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব নয়। তাছাড়া আসাম অঞ্চলে শিক্ষিত ও সভ্য জনগোষ্ঠীর সঙ্কটও ছিল। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী সিলেট যেমন ছিল একটি আয়বহুল এলাকা তেমনি এখানে শিক্ষিত জনবলও ছিল আশানুরূপ। এসব দিক বিবেচনায় সিলেটকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত হয়।

এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায় সমগ্র সিলেটবাসী। এর কারণ আসামের জনগণ পাহাড়ি জাতি হওয়ায় তাদেরকে শাসন করা বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণীত আইনের দ্বারা সম্ভব নয়। এর পরিবর্তে তাদের উপযোগী করে আইন-কানুন প্রণয়ন করতে হবে যা সিলেটবাসীর জন্য কেবল অস্বস্তিদায়কই নয় বরং কষ্টসাধ্যও হবে। তাই সিলেটবাসী আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। এর প্রেক্ষিতে গভর্নর জেনারেল নর্থব্রুক সিলেটে আগমন করেন।[১৫]

তার আগমন উপলক্ষে সিলেটকে আসামের সাথে যুক্ত করা হলে এখানকার জনসাধারণের কী কী অসুবিধা হতে পারে তার বিবরণ দিয়ে গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে লর্ড নর্থব্রুক সরকারের সিদ্ধান্তে অটল থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সিলেটের বিধিব্যবস্থা, রাজস্ব সংগ্রহ ও ভূমি বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে বাঙলার সর্বত্র যে নীতি প্রচলিত সে অনুযায়ীই চলবে। অর্থাৎ সিলেটে আসামের শাসন প্রণালী অনুসৃত হবে না।[১৬]

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে সিলেটকে আসামের সাথে সংযুক্ত করে চিফ কমিশনার অব আসামের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়।[১৭] সিলেটের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট পদের স্থলে ডেপুটি কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং অক্টোবর মাসে এ এল ক্লে প্রথম ডেপুটি কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন।[১৮] তখন শিলং ছিল আসাম প্রদেশের রাজধানী। আসাম সুরমা উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পার্বত্য প্রদেশ এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়।[১৯] সিলেট তখন সুরমা

উপত্যকা বিভাগের অন্তর্গত। তখন থেকেই সিলেটের সাথে বেজোড়া পরগণাও আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সিলেট জেলার আয়তন ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গ মাইল। এতবড় একটি এলাকা সিলেট শহর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা অসুবিধা জনক মনে করে আসামভুক্তির পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সিলেটকে সাবডিভিশন বা মহকুমায় বিভক্ত করার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।[২০] কিন্তু তখন এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলাকে সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সদর এই চারটি সাব-ডিভিশনে (মহকুমা) ভাগ করার লক্ষ্যে গেজেট নোটিফিকেশন জারি হয়।[২১] কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তখন তা বাস্তবায়ন হয়নি। এর দশ বছর পর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২] এরপরে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মৌলভীবাজার মহকুমা সৃষ্টি হয়।[২৩]

সিলেট জেলা ৪টি মহকুমায় বিভক্ত হওয়ার পর দেখা যায়, সদর মহকুমার আয়তন এবং কাজকর্মও অনেক বেশি। সে বিবেচনায় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সদর মহকুমাকে উত্তর সিলেট ও দক্ষিণ সিলেট নামে বিভক্ত করা হলে মহকুমার সংখ্যা পাঁচটিতে উন্নীত হয়।[২৪] ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ সিলেট মহকুমার নাম পরিবর্তন করে মৌলভীবাজার করা হয়।[২৫]

বঙ্গভঙ্গ : পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ

আসাম সরকারের অধীনে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মহকুমার মর্যাদা লাভ করে। এ সময়ে ব্রিটিশ ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ ছিল বেঙ্গল বা বাংলাদেশ। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত এ প্রদেশ একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসনাধীন ছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ছোট লাট স্যার উইলিয়াম গ্রে ও ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে স্যার জন কেম্পবেল এই বৃহৎ প্রদেশ একজনের পক্ষে শাসন করা দুরূহ বলে রিপোর্ট করলে শ্রীহট্ট, কাছার ও গোয়ালপাড়া জেলাকে একজন চিফ কমিশনারের অধীন করা হয়।[২৬]

এরপরও ১৮৯২ ও ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি মহল হতে রিপোর্ট করা হয় যে, আসাম ও পূর্ব বাংলার জেলাগুলো নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ করা উচিৎ। এরই প্রেক্ষিতে বড়লাট লর্ড কার্জন ভারত সচিব লর্ড হেমিল্টনের সাথে পরামর্শ ক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সাথে যুক্ত করার পরিকল্পনা প্রকাশ পায়। এতে বাংলার হিন্দু সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি ঢাকার সুহৃদ সংঘ আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগগুলো নিয়ে (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার বাদে) একটি নতুন প্রদেশ গঠনের দাবি পেশ করে।[২৭]

ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন ঢাকা এসে প্রথমে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর সাথে মতবিনিময় করেন। এরপরে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও আসাম নিয়ে 'পূর্ব

বাংলা ও আসাম’ প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সচিব ব্রডারিক-এর অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাকে বিভক্ত করে নতুন প্রদেশের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। উক্ত পরিকল্পনা ১০ জুলাই প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গের এ পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ এবং মালদহ ও পার্বত্য ত্রিপুরার জেলাগুলো নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার কথা। এই নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হওয়ার কথা ঢাকায়। নবগঠিত এ প্রদেশের জন্য একজন ছোট লাট, একটি ব্যবস্থাপক পরিষদ ও একটি রাজস্ব বোর্ডের ব্যবস্থা হয়।[২৮]

এ সংবাদ প্রকাশিত হলে হিন্দু নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এতদসত্ত্বেও বড়লাট তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম’ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশের ঘোষণা দেন।[২৯]

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হবার পর নবগঠিত প্রদেশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সুরমা উপত্যকা ও আসাম উপত্যকা এই ৫টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ছিল– ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগে– ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা; রাজশাহী বিভাগে– দিনাজপুর, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলা; সুরমা উপত্যকা বিভাগে– শ্রীহট্ট, কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় ও লুসাই পাহাড় জেলা; আসাম উপত্যকা বিভাগে– গোয়াল পাড়া, কামরূপ, দরঙ্গ, নওগাঁ, লক্ষীমপুর, শিবসাগর ও গারো পাহাড় জেলা।[৩০]

এ সময়েই সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন সংশ্লিষ্ট নতুন প্রদেশভুক্ত হয় এবং মনতলা পরগণাকে ত্রিপুরা জেলার চাকলে রোশনাবাদ থেকে সিলেটের শঙ্করপাশা রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কিন্তু বাংলার এই বিভক্তি হিন্দু নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেননি। স্বদেশী আন্দোলনের নামে তারা এর তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে সরকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করলে পুনরায় আসামে চিফ কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আসাম গভর্নর শাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত হয়।[৩১]

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে সিলেট পুনরায় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩২] চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুনরায় সুরমা উপত্যকা বিভাগের সাথে সিলেটকে যুক্ত করা হয়। সেই থেকে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন তথা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ জেলা আসামের সাথেই থাকে। আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সুবিধা তখন সিলেটবাসী ভোগ করতে পারেনি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের পর তারা সে অধিকার লাভ করে।[৩৩]

বিভিন্ন অঞ্চলগত সীমানা পরিবর্তন

মোগল শাসনামল থেকেই সিলেটের সীমানা সরাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস সরকার, পরগণা ও জেলাকে সমন্বিত করে ডিস্ট্রিক্ট বা জেলা প্রশাসন নামক নতুন প্রশাসনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। নবসৃষ্ট জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট নামকরণ করা হয়।[৩৪] তখন সিলেট জেলার আয়তন ছিল ৩৮০০ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ছিল ৪,৯২,৯৪৫ জন।[৩৫] সে সময় সিলেট অঞ্চলের শাসনভার ছিল ঢাকা কাউন্সিলের কাছে ন্যস্ত।[৩৬]

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার পর সেখানে আসামের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসাম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলার অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, ভূমি ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন ঘটে। ভূমি অধিকারকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে মোটামুটি ভাবে তা ছিল : ক. জমিদার, মিরাশদার ও তালুকদার সমন্বয়ে ভূস্বামী শ্রেণি; খ. ভূমির মালিকানাসহ ব্যবসা ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণি; গ. ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিক নিম্নবিত্ত শ্রেণি।

সিলেটের সবচাইতে দুঃখজনক বিষয় হল, জাতীয় ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসনকালের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনায় সিলেট অঞ্চল গুরুত্বহীন বা অনুপস্থিত বলা হলেও অত্যুক্তি হবে না। এর কারণ, ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৬৭ বছর[৩৭] সিলেট অঞ্চলের বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। ব্রিটিশপূর্ব কালের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যগত অপ্রতুলতার কারণে সে সময়কালের সিলেট সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হলেও ব্রিটিশ উপনিবেশ কালের ঐতিহাসিক তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন রেকর্ডপত্রে রয়েছে।

অচ্যুৎচরণ চৌধুরী, সৈয়দ মুর্তাজা আলী প্রমুখ সিলেট অঞ্চলের খ্যাতিমান ক'জন তাঁদের রচনায় এ সময়কালের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তথ্য সামনে নিয়ে আসায় সিলেটের ইতিহাস জাতীয় ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছে। তাদের রচনায় অধিকাংশ তথ্য উঠে আসলেও এসমস্ত বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতায় ছন্দপতন ঘটেছে তা বলার অবকাশ আছে।

তাছাড়া আসামভুক্ত ৬৭ বছরের ইতিহাসও কিছুটা অস্পষ্ট বলেই অনুমিত হয়। এ অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য আসামভুক্ত সিলেটের সরকারি রেকর্ডপত্র[৩৮] গভীর ভাবে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ধারণা করা যায়, তাহলে সে সময়কার অনেক দুর্লভ তথ্য প্রাপ্তি যেমন সম্ভব হবে তেমনি অনেক প্রচলিত তথ্যও পুরিশুদ্ধ হবে।

বলাবাহুল্য, হবিগঞ্জ যেহেতু সিলেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তৎকালে বিশেষত ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'হবিগঞ্জ' নামে পৃথক কোনো প্রশাসনিক এলাকা ছিল না– সেহেতু সিলেট বিষয়ক ভূমি, রাজস্ব, প্রশাসন প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রতিটি নীতিগত মৌলিক বিষয়সমূহ হবিগঞ্জের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

হবিগঞ্জ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ সময়ে সময়ে সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যের সাথেও সংযুক্তি বা বিয়োজনের ঘটনা ঘটেছে। তথ্যগত অস্পষ্টতার কারণে তাই এ বিষয়ে

অনেকে অনেক রকম ভ্রমাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করাটা অসৌজন্যমূলক মনে হতে পারে বিধায় কেবল সংক্ষেপে কালানুযায়ী রেফারেন্স উল্লেখসহ অপরিহার্য ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনার চেষ্টা করা হলো।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে সরাইল, জোয়ানসাহি ও তরফ এই তিনটি বৃহৎ পরগণাকে চাকলে সিলেট থেকে খারিজ করে ঢাকার নাওরা বিভাগভুক্ত করা হয়।[৩৯] ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত জেমস রেনেলের মানচিত্র অনুযায়ী বর্তমান কালের হবিগঞ্জ ও মাধবপুর থানা এলাকা যা তখন জিলা লস্করপুর হিসেবে খ্যাত ছিল তা ঢাকার সাথে সংযুক্ত ছিল।[৪০]

১৭৭৯ সালে আদি তরফ, ফয়জাবাদ, আনন্দপুর, রিয়াজপুর, গদাহাসন নগর, উসাইনগর, মুগিশপুর, রিচি, গিয়াসনগর, উচাইল, বেজোড়া , চৈতন্যনগর, রঘুনন্দন, নুরুলহাসন নগর, পুটিজুরী, দাউদনগর, বামৈ ও বিথঙ্গল পরগণা তথা বর্তমান হবিগঞ্জ এলাকার বৃহদাংশ ঢাকার সাথে যুক্ত করা হয়।[৪১]

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি সিলেট অঞ্চল ঢাকা প্রশাসন থেকে পৃথক হয়।[৪২] বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জেম্‌স রেনেল বঙ্গদেশ ও সিলেটের মানচিত্র তৈরি করেন। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উক্ত মানচিত্রের বরাতে বলা হয়েছে:

> *that the present thanas of Habiganj and Madhabpur, known as Zila Lashkarpur, were not than transferred to Sylhet district but formed part of Dacca.*[৪৩]

এতে আরো বলা হয়েছে:

> *The second addition to the district was the area known as Zila Lashkarpur which corresponds to the existing thanas of the Habiganj and Madhabpur.*
>
> *From paragraphs 421, 423, 444 and 445 of the Fifth Report of the select Committee on the affairs of the East India Company, it appears that Taraf was originally included in Sylhet. The tract was transferred in 1779 to Dacca, but in 1790-91 it was retransferred to Sylhet along with parganas Faizabad, Anandpur, Reagpur, Gada Hassannagar, Usainagar, Raghunandan, Nurul Hassannagar, Daudnagar, Putijur and Bama which had, in the interval, been separated from pargana Taraf.*
>
> *…The area of the district at the time of the Hastabud survey (1788-90) was 3,800 sq. mils. This area did not include Jaintia and certain parganas of Zila Lashkarpur which were added to the district after the Decennial Settlement.*[৪৪]

লিন্ডসের দায়িত্বের শেষ সময়ে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন রাজস্ব ক্ষমতার সাথে ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিচারের ক্ষমতা একীভূত করে কালেক্টরকে জেলার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। জন উইলিস সিলেটের কালেক্টর থাকা কালে দশসনা বন্দোবস্ত কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি

সিলেটকে ১৬৪টি পরগণায় এবং ১০টি রাজস্ব ইউনিটে ভাগ করে প্রতিটি ইউনিটকে রাজস্ব জিলা হিসেবে নামকরণ করেন। প্রতি জিলার রাজস্ব আদায়কারীর পদবি ছিল তহশিলদার।

১৭৮৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হলে হবিগঞ্জ অঞ্চলের বামৈ, দাউদনগর, ফৈজাবাদ, গদাহাসন নগর, আনন্দপুর, মোড়াকৈর, নুরুলহাসন নগর, উসাইনগর, রঘুনন্দন, পুটিজুরী, রিয়াজপুর, তরফ, উচাইল ও বেজোড়া পরগণা ময়মনসিংহ জেলার সাথে যুক্ত হয়।[৪৫]

১৭৮৮-৮৯ খ্রিস্টাব্দে হস্তবুদ জরিপের সময় সিলেটের আয়তন ৩,৮০০ বর্গমাইল উল্লেখ হওয়ার কারণ হিসেবে জানা যায়, তখন জৈন্তা পরগণা এবং জিলা লস্করপুর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ঢাকা থেকে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট এলাকা সিলেটের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৪৬] ১৭৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে ইতোপূর্বে তরফ থেকে পৃথককৃত পরগণা ফয়েজাবাদ, আনন্দপুর, রিয়াজপুর, গদাহাসন নগর, উসাইনগর, রঘুনন্দন, নুরুলহাসন নগর, দাউদনগর, পুটিজুড়ি ও বামৈসহ সমগ্র তরফ পরগণাকে পুনরায় সিলেটের সাথে যুক্ত করা হয়।[৪৭] কিন্তু কেদারনাথ মজুমদার ময়মনসিংহের Collector's letter d. 11-5-1789 to the B. R. এর বরাতে ১৭৮৯ সালে ঐ সকল পরগণা পুনরায় সিলেটের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় বলে জানান।[৪৮]

১৭৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ থেকে বৃহত্তর তরফ পরগণা সিলেটের সাথে যুক্ত হলেও বেজোড়া অংশ ময়মনসিংহের সাথেই থেকে যায়। কেদারনাথ মজুমদার অবশ্য দাবি করেন, ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে ময়মনসিংহ তরফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৪৯] তরফের ইতিহাসে বলা হয়েছে: '*১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইহা শ্রীহট্ট জেলার কালেক্টরিভুক্ত হইয়া ঢাকার কমিশনের অধীনে বাঙ্গালার লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের কর্ত্তৃত্বাধীনে শাসিত হইতেছিল।*'[৫০]

অচ্যুৎচরণ চৌধুরী Dacca blue book (p. 291)-এর বরাতে বলেন, এ সময় লস্করপুর ঢাকার রাজস্ব বিভাগ হতে পৃথক হয়ে শ্রীহট্টের কালেক্টরভুক্ত হয়।[৫১] এতে অনুমিত হয়, ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুর সিলেটের অধীন রাজস্ব জিলার অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে হয়তো তা পুনরায় ময়মনসিংহ তথা ঢাকা বিভাগের সাথে সংযুক্ত হয় এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে তা পুনরায় সিলেটের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পরও ঢাকা কমিশনের অধীনেই ছিল।

আদি তরফ, তপে বিষগাও, বালিশিরা ও সপ্তগ্রাম নামে যে কয়েকটি পরগণা তরফ হতে খারিজ হয়েছিল বলে জানা যায় তন্মধ্যে বিষগাও ও বালিশিরা পরগণা দু'টি সম্পর্কে জানা যায় :

> *১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের এক বিশ্বস্থ কর্ম্মচারী ও সহচর রামহরি ঘোষ বিশ্বাস বিষগাও মধ্যে এক জমিধারী ক্রয় করে বাড়ি নির্মাণ করেন। কিন্তু তৎকালেই মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হন। এ অবস্থায় রামহরি ঘোষ বাণিয়াচঙ্গে অন্য এক জমিদারী ক্রয় করত প্রভূর প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা বশত বিষগাওস্থ জমিদারী মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের অনুকূলে ত্যাগ করেন। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য রামহরি ঘোষের উপহার গ্রহণ করত অনুচরগণসহ সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। এ স্থানে অবস্থান কালে তিনি বালিশিরার অনেক অংশ ক্রয় করে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পুনরায় ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করতে সক্ষম*

হন। এ সময় থেকে বিষগাও ও বালিশিরার জমিদারী ত্রিপুরাধিপতির অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। এই জমিদারীর আয়তন ছিল ১১৩ বর্গ মাইল এবং আয় ছিল ৬৭,০০০ টাকা।[৫২]

১৮১১ সালে একদিকে ত্রিপুরা অন্যদিকে ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার সীমানায় সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাকে ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম সীমানা রূপে নির্ধারণ করা হয়। ১৮৩০ সালে সরাইল-সতরখণ্ডল, দাউদপুর, হরিপুর ও বেজোড়া প্রভৃতি পরগণা ময়মনসিংহ থেকে ত্রিপুরা জেলার অধীনে ন্যস্ত হয়।[৫৩] কিন্তু পরে সতরখণ্ডল পর্যন্ত এলাকা শ্রীহট্ট জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়।[৫৪]

রাজমালা মতে মনতলা পরগণা ১৮৬১-৬৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত ত্রিপুরা জেলার ভূমি সার্ভে রিপোর্ট মোতাবেক সে জেলার চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালে এর ভূমির পরিমাণ ছিল ৬৭১১ একর।[৫৫] রাজমালা প্রকাশ হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ)। সুতরাং এটি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের পরে সিলেটের সাথে যুক্ত হয়ে থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বঙ্গভঙ্গ কালে (১৯০৫-১৯১১) সিলেটের চট্টগ্রাম বিভাগভুক্তির সময়ে হয়ে থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

তথ্যনির্দেশ:

১. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, *আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম*; বাংলা একাডেমি ১৯৭৮। পৃষ্ঠা ৫

২. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৬

৩. ক. অধ্যাপক কে. আলী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ,)* আলী পাবলিকেশনস ১৯৮৯। পৃষ্ঠা ৪৯৬। খ. ড. এম এ রহিম ও অন্যান্য সম্পাঃ, *বাংলাদেরেশ ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৮১। পৃষ্ঠা ৪৩৯

৪. S.N.H.Rizvi , *East Pakistan District Gazetteers SYLHET,* East Pakistan Government Press, Dacca 1970. Page 351

৫. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ১৫৩। সিলেট সরকারে তখন ৮টি মহাল ছিল।

৬. Abul Fazl Allami, *THE AIN-I-AKBARI (VO. 11),* Translated by H. Blochman. Page 152

৭. কুরশা, জন্তরি, পাইকুড়া, সতরসতী, সুনাইতা, জলসুকা, বিথঙ্গল, মুড়াকৈর প্রভৃতি পরগণা তখন লাউড়ের অধীন ছিল। সূত্রঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ১১

৮. ক. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ৬২। খ. ABUL FAZAL ALLAMI, *THE AIN-I-AKBARI (VOL-II),* Translated by H. BLOCHMANN. Page 152.

৯. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড;* উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩

১০. ক. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ৬১। খ. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড*। উৎস প্রকাশন ২০১০। পৃষ্ঠা ২৬১

১১. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 71

১২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৩৭

১৩. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 1

১৪. ড. এম এ রহিম ও অন্যান্য; *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান **১৯৮১**। পৃষ্ঠা ৫১৬

১৫. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 79

১৬. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৭

১৭. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা **১৯৯৮**। পৃষ্ঠা ৬৩ সৈয়দ মোস্তফা কামাল *সিলেট বিভাগের পরিচিতি* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৩) '৬ ফেব্রুয়ারি' উল্লেখ করেছেন।

১৮. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৮

১৯. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩। এর অন্তর্গত জেলাসমূহ হল: **সুরমা উপত্যকা–** শ্রীহট্ট ও কাছাড়। **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা–** গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, দরঙ্গ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর। **পার্বত্য প্রদেশ–** গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুসাই পাহাড়।

২০. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৮

২১. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 352

২২. *Ibid,* Page 353

২৩. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি **১৯৮৩**। পৃষ্ঠা **১৬৪**। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (পৃষ্ঠা ৩৯০) **১৮৮৮** খ্রিস্টাব্দে ৯৯৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে হবিগঞ্জ সাব-ডিভিশনের কার্যক্রম শুরু হয় বলা হয়েছে।

২৪. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৯

২৫. রব্বানী চৌধুরী, *মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা ২০০০। পৃষ্ঠা **১১**

২৬. এম এ রহিম, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, ৯২তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উদযাপন স্মারক, বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র **১৯৯৭**। পৃষ্ঠা **১১**

২৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা **১২**

২৮. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা **১২**

২৯. মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, *আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম*, বাংলা একাডেমি **১৯৭৮**। পৃষ্ঠা **১৮১**

৩০. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩

৩১. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *সিলেট বিভাগের পরিচিত*, রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৩

৩২. ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রকাশনায় : আলহাজ্ব এম. এ. সাত্তার **১৯৯১**। পৃষ্ঠা **১১৮**

৩৩. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা **১৯৯৮**। পৃষ্ঠা **১০৪-১০৫**

৩৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৬২

৩৫. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৬৩

৩৬. রবার্ট লিন্ডসে, *সিলেটে আমার বারো বছর*, অনুঃ আবদুল হামিদ মানিক; মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট ২০০২। পৃষ্ঠা ৩০

৩৭. **১৯০৫** থেকে **১৯১১** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ কালের ৬ বছর সিলেট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অধীন চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত ছিল। সে কারণে মোট ৭৩ বৎসর থেকে ৬ বছর বাদ গেলে এ সময়কালের পরিমাণ ফল ৬৭ বছর।

৩৮. এ সমস্ত রেকর্ডপত্র আসাম থেকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমানে আগারগাওস্থ ন্যাশনাল আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে।

৩৯. শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, দ্বিতীয় অক্ষর সংস্করণ **১৪০৫** বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা **১৫৮**। Population Census of Bangladesh-1974. District Census Report Comilla; Page 11

৪০. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 351

৪১. ক. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *সিলেট বিভাগের পরিচিতি*, রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৩। খ. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 352

৪২. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি **১৯৮৩**। পৃষ্ঠা **১৬১**

৪৩. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 351

৪৪. প্রাগুক্ত। Page 352. এতে Bami এর স্থলে Bama এবং Putijuri এর স্থলে Putijur শব্দটি গুলো সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ।

৪৫. শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ ১৯৮৭। পৃষ্ঠা ৫৮

৪৬. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 352

৪৭. প্রাগুক্ত। Page 352. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৮-৭৯) 'বামৈ' এর পরিবর্তে 'গিয়াস নগর'এর উল্লেখ আছে।

৪৮. ময়মনসিংহের ইতিহাস, শ্রী কেদারনাথ মজুমদার; ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ ১৯৮৭। পৃষ্ঠা ৬১

৪৯. শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, *ময়মনসিংহের বিবরণ*, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ ১৯৮৭। পৃষ্ঠা ৩

৫০. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ২৫

৫১. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ২২

৫২. প্রাগুক্ত। *দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৮১

৫৩. ক. Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gezetter Comilla*, Government Press, Dacca 1970. Page 41 খ. মুহম্মদ হাবীবুর রশিদ, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার কুমিল্লা*, ১৯৮১। পৃষ্ঠা ১। গ. Nurul Islam Khan, *Bangladesh District Gezetteers–Comilla 1977*. Page 2

৫৪. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা : ব্রিটিশ ও বর্তমান যুগ; *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, সম্পাঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ও অন্যান্য, কুমিল্লা জেলা পরিষদ ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ৩১২

৫৫. শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, অক্ষর সংস্করণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২৫৫ ও ২৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশাসনিক ক্রমবিকাশ

স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো বলতে যা বুঝায় অতীতে তা ছিল না। মূলত রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। নবাবি আমলে সাম্রাজ্য সুবায় (বিভাগ) বিভক্ত করে তার অধীনে অনেকগুলো সরকার যা অনেকটা পরবর্তী কালের জেলার আয়তন নিয়ে গঠিত হয়। সরকারগুলোর নিম্নস্তরে ছিল পরগণা। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এর তেমন কোনো গুরুত্ব না থাকলেও সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ও রাজস্ব ইউনিট ছিল পরগণাই। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাঠান বা মোগল আমলের শাসন ব্যবস্থায় জমিদারেরাই ছিলেন প্রশাসক।[১]

মোগল প্রশাসনে সরকারের প্রশাসক ছিলেন ফৌজদার আর রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন আমীল। সরকারের প্রশাসনিক স্তর ছিল সরকার, পরগণা, থানা, মৌজা, মহল্লা ও গ্রাম। পরগণার প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন শিকদার, থানার প্রধান থানাদার, মৌজার প্রধান চৌকিদার, মহল্লার প্রধান ছিলেন মহল্লাদার ও গ্রাম প্রধান ছিলেন মোকাদ্দম। গ্রামে বিচার-সালিশের জন্য একটি পঞ্চায়েত কমিটি ছিল।[২] তবে কোনো কোনো বর্ণনা বা স্থান বিশেষে এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়।

যেমন, ব্রিটিশ উপনিবেশের পূর্বে মোগল সরকারে সাধারণ প্রশাসন প্রধান ছিলেন ফৌজদার; ভূমি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রধান ছিলেন আমিন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন কাজী। তাদের আলাদা আলাদা অধিক্ষেত্র ছিল।[৩] তখন ফৌজদারের এলাকাকে সরকার, আমিনের এলাকাকে পরগণা এবং কাজীর এলাকাকে জিলা বলা হতো।[৪]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করে মোগল আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে মোটামুটি ভাবে বহাল রেখে সময়ে সময়ে তার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। ধাপে ধাপে তারা প্রশাসনকে বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটায়।

মোগল আমলের শাসনকার্যে দেওয়ানী ও নিজামত নামে দু'টি বিভাগ ছিল। দেওয়ানি বিভাগের অধীনে রাজস্ব সংগ্রহ, রাজস্ব সংক্রান্ত বিচার ও দেওয়ানি বিচার হতো। নিজামতের অধীনে ছিল ফৌজদারী মোকদ্দমা, পুলিশ বিভাগ ইত্যাদি। দেওয়ানের সাহায্যকারী হিসাবে বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব পালন করতেন সদর কানুনগো।[৫]

সম্রাট বা সুবাদার কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত হয়ে সদর কানুনগো ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন। ভূমির জরিপ, রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব, লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমির হিসাব, ভূমিদান বা বিক্রি অনুমোদন ও এর সংশোধিত হিসাব প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতেন সদর কানুনগোগণ। এ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব ও দলিল-দস্তাবেজ তাদের জিম্মায় থাকতো। তারা বংশানুক্রমে বেতন বাবদ বিভিন্ন পরগণায় বহুল পরিমাণ ভূমি লাখেরাজ স্বরূপ ভোগ করতেন। উক্ত ভূমি নানকার কানুনগো নামে পরিচিত ছিল।[৬]

সদর কানুনগোর সহকারি হিসেবে প্রত্যেক পরগণায় একাধিক পাটোয়ারি ছিলেন। এরাও বংশানুক্রমে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেতেন। তারা বেতন বাবদ সংশ্লিষ্ট পরগণায় যে নিষ্কর ভূমি ভোগদখল করতেন তা নানকার লাখেরাজ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৩০-১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইটা, লংলা, কানিহাটি, বরমচাল, তরফ, বেজোড়া ও কাশিমনগর পরগণায় কানুনগো পদের সৃষ্টি হয়। তবে তাদেরকে পাটোয়ারির পরিবর্তে মজুমদার বলা হতো। সাধারণত পরগণার পাটোয়ারি ও কানুনগোগণ কানুনগো, মজুমদার বা পুরকায়স্থ নামেও অভিহিত হতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কানুনগো পদের বিলুপ্তি ঘটে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে পাটোয়ারি পদেরও বিলুপ্তি ঘটে।[৭]

ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করে। তখন তাদের হাতে ছিল কেবল রাজস্ব আদায়ের ভার। এ অবস্থায় দেশরক্ষা ও শাসনভার থাকে সুবাদার বা নবাবের হাতে। অল্পকালের মধ্যে কোম্পানি দেশরক্ষা তথা সমর বিভাগের ভারও নিয়ে নিলে নবাবের হাতে থাকে কেবল বিচার ও শাসনভার। এতে নবাবের ক্ষমতা কেবল কাগজে-কলমেই থাকে। এমনিভাবে চলার এক পর্যায়ে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ইংল্যান্ডের রাণী মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

নবাবি আমলে সিলেট অঞ্চলে চৌধুরী, শিকদার, কানুনগো, পুরকায়স্থ প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হতো। এরা সকলেই ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল চৌধুরীদের উপর। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে ক্ষেত্র বিশেষে চৌধুরী খেতাব দেওয়া হলেও দশসনা বন্দোবস্তের পরে এই খেতাব রহিত করা হয়। তখন থেকে চৌধুরীগণ জমিদার ও তালুকদার রূপে খ্যাত হন।[৮]

মোগল শাসনামলে বাংলার নবাবের আত্মীয়-স্বজনরাই সাধারণত সিলেটের শাসক বা আমিল পদে নিয়োজিত হতেন বিধায় এ পদটি অতি গৌরবান্বিত বিবেচিত হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি গ্রহণের পর পূর্ব বঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত ঢাকায় রেভিনিউ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে ইংরেজ কর্মকর্তারাও সিলেটের দায়িত্বের বিষয়টিকে গৌরবজনক বা লোভনীয় মনে করে সেখানে আসার জন্য তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। যাহোক রেভিনিউ বোর্ড কর্তৃক রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সর্ব প্রথম মি. থেকারে সিলেটের সর্বোচ্চ কর্মচারি রূপে যোগদান করেন।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম সমন্বিত জেলা সৃষ্টি করেন। কিন্তু ১৭৭২ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত অন্যান্য প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ন্যায় জেলা প্রথা এবং জেলা সীমানাও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্ট্রিংস সারা দেশকে মোট ১৯টি জেলায় বিভক্ত করে প্রত্যেক জেলায় কালেক্টার নামে একজন জেলা প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তৎকালীন জেলাগুলোর নাম যথাক্রমে হুগলী, মোহাম্মদশাহী, নদীয়া, দিনাজপুর, রংপুর, বীরভূম, যশোর, ঢাকা, রাজশাহী, লস্করপুর, রোকনপুর, ত্রিপুরা, কলিন্দা (নোয়াখালী), জাহাঙ্গীরপুর, চুনাখালি, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, ও কলকাতা। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে জেলা প্রথা প্রত্যাহার করে জেলার পরিবর্তে দেশকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রদেশগুলোর নাম যথাক্রমে কলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ঢাকা।[৯]

সিলেট অঞ্চল তখন ছিল লস্করপুর জেলার অন্তর্গত এবং বিভাগ সৃষ্টির পর তা ছিল ঢাকার অধীন। এ সময়ে দেওয়ানি শাসন (রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিচার) ছিল কোম্পানির হাতে এবং নিজামত শাসন (ফৌজদারি বিচার ও পুলিশি ক্ষমতা) ছিল নবাবের হাতে। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ নবাবকে তাঁর নিজামত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেন। এর মাধ্যমে নিজামত ও দেওয়ানি জেলার মধ্যে পার্থক্যের অবসান ঘটে।

এতে অনুমিত হয় যে, ব্রিটিশ সরকার সর্বপ্রথম জেলা কার্যক্রম শুরুর সময়ে সিলেট অঞ্চলকে 'লস্করপুর' নামে ও স্থানে বৃহৎ বাংলার ১৯টি জেলার অন্তর্ভুক্ত করে। তখন এ জেলা ছিল নবাবের অধীন নিজামতের অন্তর্গত। সুবাদারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজী বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন। মুফতিগণ কাজীদের ইসলাম ধর্মীয় আইন সম্বন্ধে অবহিত করতেন। হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে রাজ-পণ্ডিতগণ বিচারককে সাহায্য করতেন। প্রত্যেক প্রধান প্রধান পরগণার জন্য নবাব থেকে জায়গীর ভোগকারী রাজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হতেন।[১০]

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের প্রদেশ প্রথায় মোট জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ২৮টি দেওয়ান শাসিত জেলাকে পুনর্বিন্যস্ত করে ১৪টি জেলায় রূপান্তরিত করা হয় এবং জেলা দেওয়ান প্রথা বিলুপ্ত করে প্রতি জেলায় একজন ইউরোপীয় কালেক্টার নিযুক্ত করা হয়।[১১]

আধুনিক অর্থে জেলা প্রথার সৃষ্টি হয় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে। এর পূর্বে দেওয়ানি শাসন কোম্পানি ও নিজামত শাসন নবাবের হাতে থাকায় দুই কর্তৃপক্ষের মধ্যে তেমন কোনো সমন্বয় ছিল না। কালেক্টার নিযুক্তির পর বিচার, পুলিশ ও রাজস্ব এ তিনটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই তাকে দেয়ায় কালেক্টাররা স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এমনি অবস্থায় লর্ড কর্নওয়ালিশ বিচার ক্ষমতাকে পৃথক করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতি জেলায় একজন জজ নিযুক্ত করা হয়।[১২]

হেস্ট্রিংস প্রশাসন প্রতি জেলায় একজন ইউরোপীয় কালেক্টার এবং একজন দেশীয় দেওয়ান নিয়োগ করে তাদের সাহায্যে রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন ব্যবস্থার বিন্যাস করে। কালেক্টরকে জেলা দেওয়ানি আদালতের জজ পদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কালেক্টরের পরিদর্শনাধীনে ফৌজদারি মোকদ্দমা সমূহের বিচার কাজী ও মুফতির মাধ্যমে সম্পন্ন হত।[১৩]

এ সময় পর্যন্ত সিলেট সদরে কোনো মুন্সেফি আদালত ছিল না। তরফের সুলতানসীতে ছিল সিলেট জেলার প্রধান বিচারালয় (মুন্সেফি আদালত)। বিচারের জন্য সকলকেই তখন সুলতানসী আসতে হতো।[১৪] এ বক্তব্যের সমর্থনে দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন,

> *তরফের সুলতানশীতে মুসলিম আমলে এবং কোম্পানী আমলেও জেলার প্রধান আদালত অবস্থিত ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। কিন্তু তরফ রাজ্যের রাজধানী ও রাজবাড়ির কোন ধ্বংসাবশেষও আর অবশিষ্ট নেই। ভূমিকম্পে সব শেষ হয়ে গেছে।*[১৫]

লস্করপুরে তহশিল কাছারি ছিল। তহশিলদার, শিকদার (বিচারক), কাজী প্রভৃতি রাজ কর্মচারিরা সেখানে বসবাস করতেন। সেখানেই সিলেটের মুন্সেফি আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬]

তরফের ইতিহাসে বলা হয়েছে:

এই স্থান এতদিন পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং লস্করপুরের মুন্সেফ চৌকির অধীনে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ১৮৭৮ খৃ. অব্দের ডিসেম্বর মাসে হবিগঞ্জ সবডিবিসন স্থাপিত হওয়ায় তাহার এলাকাধীন হইয়াছে। একটি পোলিস ষ্টেসন এবং একটি আউট পোষ্টের দ্বারা ইহার শান্তি রক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে।[১৭]

১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের[১৮] এক বর্ণনায় অচ্যুতচরণ চৌধুরী বলেন,

লস্করপুরের যে স্থানে মুন্‌সেফী কাছারী ছিল, পূর্ব্বে সেই স্থানেই নবাবী তহশীল কার্য্যালয় ছিল। খোন্দকার, শিকদার, কাজি প্রভৃতি রাজকীয় কর্ম্মচারীবর্গ ঐ স্থানে বাস করিতেন। কাজি বিচার বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, শিকদার গ্রাম্য হাকিমের উপাধি ছিল। তৎকালে কৃষ্ণ শিকদার নামক এক ব্যক্তি তরফে থাকিতেন। ঐ একই স্থানেই লস্করপুর ও সুলতানশির জমিদারদের কাছারী থাকায় ঐ স্থান সহর তুল্য ছিল ও লোকারণ্যের কোলাহলময় থাকিত।[১৯]

সৈয়দ মুসা ও সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁদের সন্তানেরা জমিদারির মালিকানা নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হলে সে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষ দিল্লীর সম্রাটের দরবারে নীত হন। সে মীমাংসা মতে মুসাপুত্র আদম তরফের নয় আনা ও সুলতানপুত্র ইউনুস ও জিক্রিয়া সাত আনা অংশে সম্রাট কর্তৃক রিয়াসত; আদম ফৌজদারি বিচারাধিকার ও সুলতান তনয় দেওয়ানি বিচারের অধিকার প্রাপ্ত হন।[২০]

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিলেট ও কাছাড় জেলায় দেওয়ানি মোকদ্দমা বিচারের জন্য বাংলাদেশ থেকে মুন্সেফ, সাবজজ, জেলাজজ ইত্যাদি পদবির কর্মকর্তাদের পাঠানো হতো।[২১] সম্ভবত তখন থেকেই লস্করপুরস্থ নবাবি বিচারালয়ের গুরুত্ব হ্রাস পায়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠার পর এর পরবর্তী কোনো এক সময়ে বিচারালয় লস্করপুর থেকে হবিগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়।

ঔপনিবেশিক আমলে স্থানীয় সরকার

ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তখন পর্যন্ত গ্রামীন সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি ছিল পরগণা ও পঞ্চায়েত প্রশাসন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় পরগণা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো হয়। তখন স্থানীয় সরকারের মূল ভিত্তি হয় দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন এবং আদালত। এ সময় জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যাধিকারীগণ সমাজের স্বাভাবিক নেতায় পরিণত হন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে চৌকিদারি আইন পাসের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যেক জেলায় জেলা বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড ও কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন কমিটির বিধান করা হয়।

১৯১৯ সালের আইনে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করে বিদ্যমান চৌকিদারি পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ড তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং তিনি জেলা বোর্ড ও থানা প্রশাসনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

প্রাচীন ভারতে পাঁচজন সদস্য নিয়ে যে গ্রামীণ পরিষদ গঠিত হতো তাকেই বলা হতো পঞ্চায়েত। মোগল আমলে এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই ভারতের সকল গ্রাম্য সমাজ পরিচালিত হতো। সামাজিক বিরোধ সাধারণত পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি হতো। বড় সমস্যা না হলে কেউ বিচারালয়ের শরণাপন্ন হতো না। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মানুষ যত দ্রুত এবং ন্যায় বিচার লাভ করতে পারতো বিচারালয়ের মাধ্যমে তেমনটা হতো না।

তবে প্রাচীনকাল থেকেই তরফ অঞ্চলে সামাজিক সমস্যা নিরসনের প্রয়োজনে একটি সামাজিক নেতৃত্ব বিষয়ক অনানুষ্ঠানিক সংগঠন ছিল বলে জানা যায়। পাঁচ, বারো, আঠাশ ইত্যাদি নামে অনেকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে এই অনানুষ্ঠানিক সংগঠন সমাজের নেতৃত্ব দিতো। আঞ্চলিক ভাষায় এই সংগঠন 'ছান' নামে অভিহিত হতো।

তুঙ্গেশ্বর থেকে লস্করপুর হয়ে সুলতানসী পর্যন্ত যে 'ছান' ছিলো সে সম্পর্কে তরফের ইতিহাসে বলা হয়েছে :

> *ক্রমে এক সময়ে দেশের কোন রাজনৈতিক কি সামাজিক ক্ষতি, লাভস্বত্ত্ব সম্বন্ধে ও মানমর্য্যাদা বিষয়ক মীমাংসা আবশ্যক হইলে ৬টি দস্তখতের দ্বারা মীমাংসিত হইত এবং তাহাই সাধারণ মত বলিয়া গ্রহীত হইত। ১. লস্কর পুরের সৈয়দ বংশ; ২. সুলতানশির সৈয়দ বংশ; ৩. ফরিদপুরের সৈয়দ বংশ; ৪. তুঙ্গেশ্বরের মজুমদার বংশ; ৫. জয়পুরের মজুমদার বংশ; ৬. সুখরের মজুমদার বংশ।*[২২]

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রাম চৌকিদারি আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের অধীন গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের তিনটি স্তর কার্যকর হয়। যথা: গ্রাম স্তরে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা স্তরে স্থানীয় পরিষদ ও জেলা স্তরে জেলা বোর্ড।

জেলা বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ। মহকুমা স্তরে গঠিত স্থানীয় পরিষদের কোনো স্বতন্ত্র ক্ষমতা ছিল না। এ ব্যবস্থার ফলে গ্রাম স্তরে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি এ দু'টি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের প্রতিবেদনে এক-একটি গ্রামকে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চৌকিদারি ও অন্যান্য স্থানীয় কাজের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট একক গ্রামীণ সংস্থার হাতে অর্পণের প্রস্তাব করে।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সরকার যে জেলা প্রশাসন কমিটি গঠন করে সে কমিটির সুপারিশ ছিল, গ্রামাঞ্চলে এমন এক শাসন কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলতে হবে যাতে ইউনিয়ন কমিটি, চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পাস হয় বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন। এ আইনে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে উভয় ক্ষমতা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু আসাম প্রদেশে এ বিধান কার্যকর হয়নি। তাই সিলেট অঞ্চলে পঞ্চায়েত প্রথাই অব্যাহত থাকে।

ফলে ১৮৮৫, ১৯১৯ ও ১৯৩৬ সালে স্থানীয় সরকার বিশেষত ইউনিয়ন পর্যায়ে বঙ্গে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সিলেট অঞ্চলে তা ছিল অনুপস্থিত। বঙ্গে যখন 'ইউনিয়ন কাউন্সিল' ব্যবস্থা চালু হয়, আসাম অঞ্চলে তখনও 'সরপঞ্চ' পদ্ধতি ছিল। তখন স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ছিল 'ওয়ার্ড'। কয়েকটি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত হতো 'সার্কেল'।

প্রত্যেকটি থানা কয়েকটি সার্কেলে বিভক্ত ছিল। সার্কেল প্রধানকে বলা হতো 'সরপঞ্চ' এবং ওয়ার্ড প্রধানকে বলা হতো 'সহকারি সরপঞ্চ'। সহকারি সরপঞ্চ নির্ধারিত এলাকার মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হতেন।[২৩] সরপঞ্চকেই স্থানীয় ভাবে 'পঞ্চায়েত' বলা হতো। সরপঞ্চ চৌকিদারি টেক্স আদায়, সালিশের মাধ্যমে গ্রাম্য বিরোধ নিস্পত্তি ও বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করতেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়।

থানা ব্যবস্থা

সুলতানি আমল থেকেই পরগণাভিত্তিক স্থানীয় প্রশাসন ছিল। তখন খুন, ডাকাতিসহ সকল প্রকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব জমিদারদের উপরই ন্যস্ত ছিল। পরগণার জমিদারগণ খাজনা আদায় ও আইন-শৃঙ্খলার সুবিধার্থে থানাদার ও পুলিশ নিয়োগ করতেন। প্রত্যেক থানাদারের অধীনে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সদস্য থাকত। এদের অধিকাংশই থানাদারের বাড়ির আশপাশে থাকতো বলে সংশ্লিষ্ট বস্তিটি থানা নামে অভিহিত হতো।[২৪] এ ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসও জমিদারদের দ্বারা সংগঠিত পুলিশ ব্যবস্থা বহাল রাখেন।

গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশের সময়ে (১৭৮৬-১৭৯৩) ভারতে ব্যাপক শাসন-সংস্কার হয়। কর্নওয়ালিশের এই সংস্কারের মধ্যে পুলিশ বিভাগের সংস্কার অন্যতম বড় ঘটনা। তিনি প্রদেশকে জেলায় ও জেলাকে থানায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক থানায় তখন একজন করে ভারতীয় দারোগা নিযুক্ত হয়। জেলার পুলিশ বিভাগের কর্তৃত্ব দেয়া হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে। এর মাধ্যমে জমিদারদের নিজ নিজ এলাকায় পুলিশ বাহিনী পোষা ও শান্তি রক্ষার যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল তা খর্ব করা হয়।[২৫]

এ পর্যায়েই মূলত সরকারি ভাবে পুলিশী থানার সৃষ্টি হয়। তখন সিলেট জেলায় পারকুল, তাজপুর, নবীগঞ্জ, আবিদাবাদ, শঙ্করপাশা, লস্করপুর, নোয়াখালী, রাজনগর, হিংগাজিয়া, লাতু, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, ছাতক, মূলাগোল, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও বাজে বেজোড়া এই ১৭টি থানা ছিল।

তন্মধ্যে নবীগঞ্জ, আবিদাবাদ, শঙ্করপাশা, লস্করপুর ও বাজে বেজোড়া এই ৫টি হবিগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বানিয়াচঙ্গ থানা প্রতিষ্ঠিত হলে[২৬] আবিদাবাদ থানাটির কার্যক্রম রহিত হয়। আবিদাবাদ তখন থেকে আজমিরীগঞ্জ নামে বানিয়াচঙ্গের আউট পোস্টে পরিণত হয়। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে মাধবপুর থানা প্রতিষ্ঠিত[২৭] হওয়ার পর হতে শঙ্করপাশা ও বাজে বেজোড়ার নাম থানার তালিকায় দৃষ্ট হয় না। তখন থেকে মাধবপুরের অধীনে লাখাই একটি আউট পোস্ট স্থাপিত হয়।

১৮৬১ সালের পুলিশ আইনে (Act V of 1861) মোগল শাসনব্যবস্থা থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় পুলিশের উত্তরণ ঘটে। সে আইন অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীর ক্ষমতা, নিয়োগবিধি, পদোন্নতি ও বদলি, তদন্ত পদ্ধতি এবং সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন, গোয়েন্দা কার্যক্রম, শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুলিশবাহিনী মোতায়েন সংক্রান্ত বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট হয়।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী তাঁর জালালাবাদের কথা গ্রন্থে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের থানা, মৌজা ও জনসংখ্যার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ[২৮]:

ক্রমিক নং	থানার নাম	মৌজার সংখ্যা	লোক সংখ্যা
১	পারকুল	৪৩৯	১,৪৭,৫৭০
২	তাজপুর	৬২১	৯৯,৪৩০
৩	নবীগঞ্জ	৪২৯	১,১০,০০০
৪	আবিদাবাদ	৩২৫	৮৮,৫৬৬
৫	শঙ্করপাশা	৩০৫	৭৮,৮৬৪
৬	লস্করপুর	৫২৪	১,৭৭,৫৩৭
৭	নোয়াখালী	১৮১	৭৪৩৩৮
৮	রাজনগর	২৭১	১,০৯,৯৪৩
৯	হিংগাজিয়া	২০১	৯৮,৮৯৩
১০	লাতু	৬৭৪	২,৬৮,৪৩৩

জনাব হোসেন চৌধুরী একই গ্রন্থের অন্যত্র (পৃষ্ঠা ১৬৩) লিখেছেন,

> ২৬-১১-১৭৯০ *খ্রীস্টাব্দে বড় বড় শহর বাজার ও গঞ্জকে থানায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়। ইহাতে তরফের হবীগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জকীগঞ্জ, জগন্নাথপুর, বানিয়াচঙ্গ, নবীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, হেতিমগঞ্জ, বাজে বেজুরা, শমসেরগঞ্জ ও আজমিরিগঞ্জসহ মোট ৩০টি থানার উল্লেখ পাওয়া যায়।*

এ তথ্যটিকে পরবর্তী কালের বিভিন্ন লেখক তাদের লেখায় কোনো সূত্রের উল্লেখ না করেই গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হবিগঞ্জ পরিক্রমায় মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান 'হবিগঞ্জের জমিন ও জীবনের ঐতিহাসিক রূপরেখা' প্রবন্ধে '২৬-১১-১৮৯০ *খৃষ্টাব্দে বড় বড় শহর ও গঞ্জকে থানায় রূপান্তর করা হয়*' বলে হবিগঞ্জসহ ৩০টি থানার উল্লেখ করেছেন।'[২৯] আবার

একই গ্রন্থে সৈয়দ মোসতাকীম আলী ও আব্দুল হাই আজাদ '১৭৯৩ *খৃষ্টাব্দে বড় বড় গঞ্জ [বাজার]কে থানায় রূপান্তরিত করা হয়'* বলে হবিগঞ্জসহ ২০টি থানার কথা বলেছেন।[৩০]

সৈয়দ মোস্তফা কামাল তাঁর হবিগঞ্জের মুসলিম মানস গ্রন্থে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হবিগঞ্জসহ ২০টি থানা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩১] আবার তিনি তাঁর 'সিলেট বিভাগের ভৌগলিক ঐতিহাসিক রূপরেখা বিবিধ' গ্রন্থে লিখেছেন, *'থানা হিসেবে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৮০ থেকে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে'*।[৩২] অথচ সৈয়দ আহমদুল হক ও সৈয়দ গাজীউর রহমান থানা প্রতিষ্ঠার কাল ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুর থেকে হবিগঞ্জে স্থানান্তরের কথা বলেছেন।[৩৩]

বলা আবশ্যক, এসব তথ্যের কোনো সূত্র উল্লেখ নেই। গভীর অনুসন্ধান করেও মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। কোনো সমালোচনা নয় বরং সত্যানুসন্ধানের স্বার্থেই বিষয়টি আলোচনা করা হলো। বর্তমান কালের কেউই সূত্র উল্লেখ না করেই হবিগঞ্জের বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সিলেটের ইতিহাস বিষয়ে সর্বাধিক তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। অনুমান করা যায়, বর্তমান আলোচকগণের এ সমস্ত তথ্যের বৃহৎ অংশ জনাব হোসেন চৌধুরীর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে চয়ন করা। তিনি 'হবিগঞ্জ' নামকরণ ও থানা সম্পর্কিত বিষয়ে 'শ্রীহট্ট দর্পণ'র সহায়তা নিয়েছেন।

১৮৭৪ খিস্টাব্দে সিলেটের আসামভুক্তির পর পর পুলিশি কার্যক্রমের বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন হয়। এ সময়ে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার ১৮ জুন, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের এক নোটিফিকেশনের বরাতে সিলেটের যে ১৬টি থানা বা পুলিশ সার্কেলের উল্লেখ করেছেন তা হলঃ আবিদাবাদ, নবীগঞ্জ, হবীগঞ্জ, শঙ্করপাশা, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, ছাতক, নোয়াখালী, রাজনগর, তাজপুর, পারকুল, গোয়াইনঘাট (Gosainghat), জৈন্তাপুর, মুলাগোল, হিংগাজিয়া (HinfJI) ও করিমগঞ্জ।[৩৪]

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে আসামের সাথে সিলেটের অন্তর্ভুক্তির তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর।[৩৫] কিন্তু স্টেটিস্টিকেল একাউন্টে আসাম সরকারের এই থানা সংক্রান্ত নোটিফিকেশনের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে একই বছরের ১৮ জুন। অর্থাৎ আসাম প্রদেশ গঠনের পূর্বেই আসাম সরকারের নোটিফিকেশনের বরাত দেওয়ার ভিত্তি কি? তাই কোন তথ্যটি সঠিক বা ভ্রমাত্মক সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তৃতীয় কোনো সূত্রের আবশ্যকতা রয়েছে।

'শ্রীহট্ট দর্পণ' নামক ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ-এর সংশ্লিষ্ট চটি গ্রন্থে সিলেটের ১৫টি থানা ও ১৫টি আউট পোস্টের কথা বলা হয়েছে। এতে হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের ৪টি থানা হিসেবে লস্করপুরের পরিবর্তে 'হবিগঞ্জ'-এর উল্লেখ আছে। অথচ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে লস্করপুর থেকেই এর কার্যক্রম পরিচালিত হতো এমন যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোটান্দর থেকে থানা কার্যালয় এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা কার্যালয় লস্করপুরের কোটান্দর থেকে হবিগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়।[৩৬] যে কারণে হবিগঞ্জ নামকরণ ও মহকুমা কার্যালয়ের বিষয়টি সৈয়দ আবদুল আগফর প্রণীত তরফের ইতিহাসে অনুল্লেখিত রয়ে গেছে।

লস্করপুর থানাটি সদর থানা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতো বিধায় মৌলভীবাজারের অধিবাসী মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ সম্ভবত ভ্রম বশত তাঁর শ্রীহট্ট দর্পণ পুস্তিকায় সদর থানা হিসেবে লস্করপুরের পরিবর্তে 'হবিগঞ্জ' উল্লেখ করে থাকবেন। আর এ তথ্যকে পুঁজি করেই কেউ কেউ কথিত ২০টি বা ৩০টি থানার সাথে 'হবিগঞ্জ' নামটি গুলিয়ে ফেলতে পারেন।

জনাব হোসেন চৌধুরী ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে তরফের'হবীগঞ্জ'কে সংশ্লিষ্ট ৩০টি থানার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করলেও তা বাস্তবতার পরিপন্থী বলে মনে হয়। কারণ যে সূত্র (শ্রীহট্ট দর্পণ) থেকে হবিগঞ্জ নামকরণের তথ্যটি প্রথম আসে সে সূত্র মতে আনুমানিক ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ বা এর কাছাকাছি সময়ে হবিবগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় বলে দাবি করা হয়েছে।[৩৭] কিন্তু সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে হবিগঞ্জ শহরের ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, তখন এ শহরে দু'টি বাজার ছিল যা খোলা জায়গায় বসতো।[৩৮]

যদি ধরেও নেয়া হয়, এ দুটি খোলা বাজারের একটিই হবিবগঞ্জ বাজার তা হলে প্রশ্ন আসতেই পারে যে, একটি বাজার প্রতিষ্ঠার শতাধিক বছর পরও সেটি খোলা বাজার হিসেবেই স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল কি-না? আর সেই খোলা বাজার কেন্দ্রিক ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত থানাকে কখন লস্করপুরের কোটান্দরে স্থানান্তর করা হলো? যদি হবিগঞ্জ থেকে অনিবার্য কারণবশত থানা কার্যালয় লস্করপুরে স্থানান্তরিত হয়েই থাকে এবং সেখানেই সাবডিভিশন কার্যালয় স্থাপিত হয়ে থাকে তাহলে পুনরায় তা হবিগঞ্জে স্থানান্তরের কি আবশ্যকতা ছিল। চৌধুরী সাহেব এসব বিষয়ে কোনোই কথা না বলে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের ১০টি থানার তালিকায় হবিগঞ্জের পরিবর্তে লস্করপুর নামটিই উল্লেখ করেছেন।

১৭৯০ বা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সরকারি আদেশের বরাতে 'হবীগঞ্জ'সহ ২০টি বা ৩০টি থানার তথ্যে যেমন কোনো স্পষ্টতা নেই তেমনি নেই সূত্রের উল্লেখ। উল্লেখিত অব্দের পরের সকল তথ্যে সকলেই হবিগঞ্জ-এর পরিবর্তে লস্করপুর থানার কথা উল্লেখ করেছেন। এসব কারণে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে 'হবীগঞ্জ' নামে থানার উল্লেখ কল্পনাপ্রসূত মনে করা সঙ্গত। জনাব হোসেন চৌধুরীর এ তথ্যটি ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি-না তা জানি না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তথ্যটি যাচাই-বাছাই না করেই সবাই নিজ নিজ লেখায় ব্যবহার করছেন। কেউ কেউ 'হবিগঞ্জ' নামকরণের যৌক্তিকতার সাথেও এ তথ্যটিকে গুলিয়ে ফেলছেন।[৩৯]

জনাব হোসেন চৌধুরী অন্যত্র লিখেছেন, '*আধুনিক থানাসমূহের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় কর্নওয়ালিসের সময়ে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২ই মে। ১০ বর্গক্রোশ এলাকার দায়িত্ব এক একটি থানা সংগঠনের ম্যাজিস্ট্রেটদের উপরে অর্পিত হয়।*'[৪০] কিন্তু উইকিপিডিয়ায় 'বাংলাদেশ পুলিশ' নিবন্ধে বলা হয়েছে, ১৮৫৬ সালে ভারত শাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট হতে ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে। পুলিশ অ্যাক্ট ১৮২৯ এর অধীনে গঠিত লন্ডন পুলিশের সাফল্য ভারতে স্বতন্ত্র পুলিশ ফোর্স গঠনে ব্রিটিশ সরকারকে অনুপ্রাণিত করে। ১৮৬১ সালে the commission of the Police Act (Act V of 1861) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয়। এই আইনের অধীনে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে একটি করে পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়। প্রদেশ পুলিশ প্রধান হিসাবে একজন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং জেলা পুলিশ প্রধান হিসাবে সুপারিনটেনডেন্ট অব

পুলিশ পদ সৃষ্টি করা হয়। ব্রিটিশদের তৈরিকৃত এ ব্যবস্থা এখনও বাংলাদেশ পুলিশে প্রবর্তিত আছে।[৪১]

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট আসামভুক্তির পর কোনো কোনো থানার নাম ও স্থান পরিবর্তন, আউট পোস্টগুলোর কোনো কোনোটিকে নতুন থানায় উন্নীতকরণসহ অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন থানা সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে আজমিরীগঞ্জ, লাখাই, চুনারুঘাট, বাহুবল ও হবিগঞ্জ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে তখন পর্যন্ত ঐ সমস্ত থানা কার্যকর থাকলেও এসবের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কোনো গেজেট সম্ভবত হয়নি। যে কারণে পরবর্তীতে সময়ে সময়ে গেজেট জারি করে আসাম প্রাদেশিক সরকার থানাসমূহের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে তাগিদ বোধ করে।

সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার[৪২] সূত্রে ১৮৯৩ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সিলেট অঞ্চলে আজমিরীগঞ্জ, বাহুবল, বালাগঞ্জ, বানিয়াচঙ্গ, বড়লেখা, বিয়ানিবাজার, বিশ্বনাথ, ছাতক, চুনারুঘাট, দিরাই, ধর্মপাশা, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জগন্নাথপুর, জৈন্তাপুর, জামালগঞ্জ, কমলগঞ্জ, কানাইঘাট, কুলাউড়া, লাখাই, মাধবপুর, নবীগঞ্জ, রাজনগর, শ্রীমঙ্গল, সাল্লা ও তাহিরপুর মোট ২৭টি থানা প্রতিষ্ঠার তথ্য জানা যায়। এতে মহকুমা সদর থানার উল্লেখ নেই। উক্ত তালিকার সাথে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এই ৪টি থানা যুক্ত করা হলে মোট থানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১টিতে। জনাব হোসেন চৌধুরী কর্তৃক উল্লেখিত তালিকাভুক্ত নামের সাথে উক্ত তালিকার নামেও যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আসাম প্রাদেশিক সরকারের গেজেট নোটিফিকেশন No. 176 G. J., dated the 10th January, 1922 অনুযায়ী সর্বাধিক সংখ্যক থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত আদেশে আজমিরিগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ছাতক, চুনারুঘাট, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, জগন্নাথপুর, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, লাখাই, মাধবপুর, নবীগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল এই ১৪টি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রকৃত ইতিহাসের স্বার্থে বিষয়টি সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, পরগণা জমিদারদের দ্বারা থানা প্রতিষ্ঠিত হলেও ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পর প্রথম দিকে সে ব্যবস্থা চলমান থাকে এবং সময়ে সময়ে তার উন্নয়ন ঘটে। ব্রিটিশ উপনিবেশ কালে যদি বেঙ্গল প্রদেশের অধীন থাকাবস্থায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট অঞ্চলে ৩০টি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে তৎপরবর্তী আসামের অধীন প্রায় একশ বছর পরে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ঐ সকল থানার উন্নয়নের পরিবর্তে সে সংখ্যা মাত্র ১৬টিতে কখন এবং কেন নেমে আসল তার কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের এক তথ্যে এ সংখ্যা আরো নিম্নগামী হতে দেখা যায়।

বাংলা ভাষায় রচিত সিলেট অঞ্চলের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ 'শ্রীহট্ট দর্পণ' যা ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে, হবিগঞ্জ সাবডিভিশনে ৪টি থানা ও ৩টি আউটপোস্ট আছে। সেমতে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হবিগঞ্জ মহকুমার থানা হচ্ছেঃ হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, বানিয়াচঙ্গ ও মাধবপুর এই ৪টি। তন্মধে আউট পোস্ট হচ্ছেঃ হবিগঞ্জের অধীন মুছিকান্দি, বানিয়াচঙ্গের অধীন আজমিরীগঞ্জ এবং মাধবপুরের অধীন লাখাই। যদি আউট পোস্টগুলোকেও থানার মর্যাদায় গণনা করা হয় তবু তখন মোট ৭টি থানার অস্তিত্ব জানা যায়। বাহুবল থানাটি সংশ্লিষ্ট তথ্যে নেই।[৪৩]

এই অসামঞ্জস্য বিবেচনায় বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কাল থেকে হবিগঞ্জ নামে কোনো থানা ছিল না। হান্টারের আসাম স্টেটিস্টিক্যাল একাউন্টে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের তথ্যেও 'হবিগঞ্জ' নামের অস্তিত্ব নেই। তবে 'লস্করপুর' নামে থানার অস্তিত্ব আছে। লস্করপুর থানার বিষয়ে অনুসন্ধানে জানা যায়, বেঙ্গল প্রদেশের অধীন বর্তমান হবিগঞ্জ, বাহুবল ও চুনারুঘাট (মুছিকান্দি) এলাকা এর অধীনে ছিল।

আসামভুক্তির পর আসাম প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন আদেশে সিলেট জেলার প্রশাসনে গতিশীলতার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নতুন থানা প্রতিষ্ঠা ও থানা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তখন লস্করপুর থানা সদর ছিল এর নিকটবর্তী কোটান্দর নামক স্থানে।[৪৪] ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'হবিগঞ্জ' নামে ও স্থানে সংশ্লিষ্ট থানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের এক তথ্য অনুযায়ী[৪৫] তখন হবিগঞ্জ মহকুমায় হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, বানিয়াচঙ্গ ও মাধবপুর এই ৪টি থানা এবং তদধীন ৩টি আউটপোস্ট ছিল। সংশ্লিষ্ট থানা সমূহের তথ্যচিত্র নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	থানার নাম		সাব-ইন্সপেক্টর সংখ্যা	কনস্টেবল সংখ্যা
	থানা	আউটপোস্ট		
১	হবিগঞ্জ		৪	১৪
২		মুছিকান্দি	২	৮
৩	নবীগঞ্জ		২	১০
৪	বানিয়াচঙ্গ		২	৮
৫		আবিদাবাদ	১	৬
৬	মাধবপুর		২	৮
৭		লাখাই	১	৮

হবিগঞ্জ মহকুমার থানা সমূহের পুনর্বিন্যাস কালে আউটপোস্টগুলো পূর্ণাঙ্গ থানার মর্যাদা লাভসহ নতুন থানা গঠনের বাস্তবতাও অনুভূত হয়। এর অধীন 'মুছিকান্দি' আউট পোস্টটি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ থানার মর্যাদা লাভ করে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বাহুবল নামে নতুন থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুছিকান্দি থানাটি সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে চুনারুঘাট নামে এবং স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আসাম প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন আদেশে হবিগঞ্জ মহকুমার থানা সমূহের পুনর্বিন্যাসসহ ৮টি পূর্ণাঙ্গ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। জানা যায়, সে সরকারের Notification No. 2733, dated the 7th April, 1893 অনুযায়ী হবিগঞ্জ থানা[৪৬] প্রতিষ্ঠিত হয়। East Pakistan District Gazetteers Sylhet, 1970 থেকে জানা যায়, Notification; No. 997 G. J., dated the 16th September, 1921 অনুযায়ী বাহুবল (পৃ.৩৮৩); No. 176 G. J., dated the 10th January, 1922 অনুযায়ী মাধবপুর (পৃ. ৩৯৬), লাখাই (পৃ. ৩৯৬), নবীগঞ্জ (পৃ. ৩৯৯), আজমিরীগঞ্জ (পৃ.৩৮৩) ও চুনারুঘাট (পৃ.৩৮৭) এবং No. 2867 G. J., dated the 23rd August, 1934 অনুযায়ী বানিয়াচঙ্গ (পৃ.৩৮৪) থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহকুমা ব্যবস্থা

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলাকে বিভক্ত করে সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সদর এই চারটি ভাগে বিভক্ত করার জন্য একটি সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন জারি হয় বলে সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে।[৪৭] অনেকের মতে, মূলত এই গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমেই প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে 'হবিগঞ্জ' নামের ধারণা আসে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশন 'হবিগঞ্জ' শব্দের কোনো উল্লেখ ছিল না। হান্টারের স্টেটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব আসামে বলা হয়েছে:

> *The subdivisionsl system is nit yet (1876) inforce in Sylhet; but by a notification which appeared in the Assam Gazette of 6th May 1876, the District was devided into the four follwing subdivision :- 1) The Sadar or Head quarter; 2) Sonamganj; 3) Laskarpur; 4) Latu or Karimganj, the erection of permanent buildings, and the complete extension of the subdivisional organization is unavoidable postponed by reason of financial exigencies, the position, area, etc of four subdivisions, apparently corresponding to the four now sanctioned, is thus described in the `History and Statistics of the Dacca Division', page 297 of the section relating to Sylhet.*[৪৮]

এতে অনুমিত হয় যে, হিস্টরি এন্ড স্টেটিস্টিক্স অব ঢাকা ডিভিশন মতে, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলাকে ৪টি মহকুমায় বিভক্তকরণের কালে 'হবিগঞ্জ' নামের পরিবর্তে 'লস্করপুর' নামটিরই উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ বাংলাভুক্ত ঢাকা বিভাগের অধীন ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত নোটিফিকেশনে সিলেটকে সদর, সুনামগঞ্জ, লস্করপুর ও লাতু বা করিমগঞ্জ নামে যে ৪টি সাবডিভিশনে বিভক্ত করার কথা বলা হয়েছিল তা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের আসামভুক্তির পর আসাম সরকারের অধীন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশনে সিলেটের ৪টি ভাগে 'হবিগঞ্জ' নামের পরিবর্তে 'লস্করপুর' নামের উল্লেখই ছিল। সে হিসেবে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাবডিভিশনের কার্যক্রম লস্করপুরেই শুরু হয়। তখন মহকুমার সদর দপ্তর লস্করপুরের কোটান্দর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ '*হবিগঞ্জের ইতিহাস : কয়েকটি প্রসঙ্গ*' নিবন্ধে লস্করপুর থেকে সাবডিভিশন কার্যালয় স্থানান্তরের সময়কাল ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করেছেন।[৪৯] এর মতান্তরও লক্ষ্য করা যায়। হবিগঞ্জ পরিক্রমায় স্থানান্তরের কাল ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।[৫০] বস্তুত এর পরেই 'লস্করপুর'-এর পরিবর্তে সাবডিভিশনের 'হবিগঞ্জ' নামকরণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিভিন্ন সূত্রে লিপিবদ্ধ হয় বিধায় পরবর্তী সকল তথ্যে প্রতিষ্ঠাকালীন 'লস্করপুর'-এর পরিবর্তে 'হবিগঞ্জ' শব্দের ব্যবহারই দৃষ্ট হয়।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সুনামগঞ্জ সাব-ডিভিশন বা মহকুমা গঠিত হয়। একই সাথে হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ মহকুমার জন্যও উভয় ক্ষেত্রে একজন সেরেস্তাদার, পাঁচজন ক্লার্ক, একজন করে

পোতদার, দপ্তরি, চাপরাশি পদবিধারী স্টাফ মঞ্জুর করা হয়।[৫১] পর বছর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ মহকুমা।[৫২]

কেউ কেউ সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে বানিয়াচঙ্গ পরগণার একাংশ ও তরফের একাংশ নিয়ে হবিগঞ্জ মহকুমা গঠন করা হয়েছিল বলার চেষ্টা করেছেন।[৫৩] কিন্তু তা সঠিক নয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে, মহকুমা প্রতিষ্ঠার কাল ১৮৭৮ এর পরিবর্তে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করা হলেও একই গ্রন্থের অন্যত্র উল্লেখিত সূত্রের নিরিখে স্পষ্ট যে এটি মুদ্রণ প্রমাদ।

হান্টারের স্টেটিস্টিক্যাল একাউন্ট অব আসাম গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> *The third & fourth lines will contain the Habigonj subdivision apparently identical with that now officially known as Laskarpur, Noakhali, Sankharpasa, Ajmeriganj and Nabiganj, with an area of about 1400 square miles.*[৫৪]

এতে স্পষ্ট যে, লস্করপুর, নোয়াখালী, শঙ্করপাশা, আজমিরিগঞ্জ ও নবীগঞ্জ এই ৪টি এলাকা নিয়ে গঠিত হবিগঞ্জের আয়তন ছিল ১৪০০ বর্গ মাইল। অপর দিকে সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে :

> *The area of the subdivision, which is the smallest in the district, is 993 square miles. The Bibiyana river divides Sunamganj and Habiganj in the north, and on the south it is bounded by Tripura of India, on the west by Brahmanbaria of Comilla district up to Lakhai and then Kishoreganj subdivision of Mymensingh district and on the east by Maulvibazar subdivision.*[৫৫]

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মতও তাই। তাঁর মতে, উত্তর দিকে বিবিয়ানা নদী সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ মহকুমাকে বিভক্ত করেছে, দক্ষিণে ত্রিপুরা, পশ্চিমে লাখাই পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া এরপরে কিশোরগঞ্জ মহকুমা এবং পূর্ব দিকে মৌলভীবাজার মহকুমার অভ্যন্তরে হবিগঞ্জের আয়তন ৯৯৩ বর্গমাইল। অবশ্য ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে এর আয়তন ছিল ৯৫২ বর্গ মাইল।[৫৬]

উপরোক্ত স্টেটিস্টিক্যাল একাউন্ট ও ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বিশ্লেষণ করলে ৪০৭ বর্গমাইলের যেমন একটি ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় তেমনি 'নোয়াখালী' নামক একটি এলাকারও উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃত বাস্তবতা হলো 'নোয়াখালী' ছিল মৌলভীবাজার মহকুমাধীন একটি রাজস্ব জিলা।[৫৭] সিলেটকে প্রথমে ৪টি সাবডিভিশনে বিভক্ত কালে মৌলভীবাজার এলাকাটি সদরের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধায় সদর সাবডিভিশনের আয়তন ছিল অনেক বেশি। সে কারণে প্রথম পর্যায়ে এই নোয়াখালী রাজস্ব জেলাটি হবিগঞ্জের সাথে সংযুক্ত করা হয়। সে কারণে নোয়াখালীর আয়তনসহ হবিগঞ্জের আয়তন দাঁড়ায় ১৪০০ বর্গমাইল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সদর মহকুমাকে বিভক্ত[৫৮] করার সময়ে নোয়াখালী রাজস্ব জিলা দক্ষিণ সিলেট বা মৌলভীবাজারের সাথে সংযুক্ত হয়। এই নোয়াখালীর আয়তন বাদ দিলে হবিগঞ্জের আয়তনগত তৎকালীন ব্যবধান কমে আসে।

মহকুমা প্রতিষ্ঠার পর সাব-ডিভিশনাল অফিসার বা মহকুমা প্রশাসক পদবির একজন কর্মকর্তার অধীন দুইজন ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিয়ন্ত্রণে মহকুমার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মহকুমা প্রশাসক সাধারণত এসডিও হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এসডিও ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের পক্ষে মহকুমার সর্বময় কর্তা হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহায়তায় সাধারণ ও উন্নয়ন প্রশাসন পরিচালনা করতেন। রাজস্ব বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করতেন সাব-ডিভিশনাল ম্যানেজার ও সার্কেল অফিসার (রাজস্ব)গণ। উন্নয়ন ও প্রশাসনিক বিষয়ে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এসডিওকে সহায়তা করতেন।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মহকুমার লোক সংখ্যা ছিল ৫,০৪,৫৯২ জন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৫৫,০০১ জনে।[৫৯] ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুর থেকে আদালত হবিগঞ্জে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পরে হবিগঞ্জে বার লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের সময় হবিগঞ্জ শহরের লোক সংখ্যা ছিল ২,১০৫ জন।[৬০]

হবিগঞ্জ মহকুমা সদরে প্রথম সাব-জেল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত জেলটি বৃন্দাবন সরকারি কলেজের উত্তর-পূর্বদিকস্থ রাস্তার পূর্ব পাশে ছিল। তখন এর ধারণ ক্ষমতা ছিল সাজাপ্রাপ্ত ৮৮ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা এবং ১১ জন পুরুষ হাজতি।[৬১]

হবিগঞ্জ পৌরসভা

সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ভাষ্যমতে হবিগঞ্জ পৌরসভার যাত্রা শুরু হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।[৬২] তখন এসডিও'র সভাপতিত্বে ৫ সদস্যের একটি মনোনীত কমিটি দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালিত হতো। অর্থের উৎস ছিল পুকুর ও ফেরিঘাটের আয় এবং লোকাল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ১,০০০ টাকা অনুদান। জনপ্রতি ৪ আনা ৯ পাই ছিল পাবলিক টেক্স।[৬৩] একই গ্রন্থে পরবর্তীতে বলা হয়েছে, অর্ধ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে হবিগঞ্জ পৌরসভা গঠিত হয় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে।

কিন্তু বিভিন্ন তথ্য প্রমাণে জানা যায়, সে সময়ে মহকুমা কার্যালয় ছিল লস্করপুরে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে) সেখান থেকে মহকুমা কার্যালয় হবিগঞ্জে স্থানান্তর হয়। এ সময়ে লস্করপুরে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়, মহকুমা, থানাসহ সকল সরকারি কার্যালয় এমনকি স্কুল ও মন্দির[৬৪] পর্যন্ত লস্করপুর থেকে হবিগঞ্জে স্থানান্তর হয়। তাই মনে করা যায় যে, ইউনিয়ন গঠনের সংশ্লিষ্ট সময়কাল (১৮৮১ খ্রি.) লস্করপুরের বেলায় প্রযোজ্য ছিল। কারণ ইতঃপূর্বে দেখা গেছে যে, জেলা এবং মহকুমা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে লস্করপুরের নাম থাকলেও পরবর্তী কালে তা সিলেট কিংবা হবিগঞ্জে স্থানান্তর হওয়ায় নানা তথ্যে পূর্ববর্তী তারিখ ব্যবহার করে পরবর্তীকালীন নামটিরই প্রয়োগ হয়েছে।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে অর্ধ বর্গমাইল এলাকায় ১৫০টি খানা এবং ২,১০৫ জন লোকসংখ্যা নিয়ে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। তখন সেখানে মাত্র দুটি কাঁচা রাস্তা ছিল। কোনো বৈদ্যুতিক বাতি, বিশুদ্ধ পানির জন্য টিউবওয়েল এবং পাক্কা ড্রেন পর্যন্ত ছিলনা। ধীরে ধীরে শহরের বিভিন্ন

উন্নতি সাধিত হয়। তখন ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। একটি পার্ক ও একটি খেলার মাঠ, ২টি খোলা বাজার ও ১টি পাঠাগার ছিল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ২ বর্গমাইল এলাকায় শহরের বিস্তৃতি ঘটে। তখন লোক সংখ্যা ছিল ১২,১১৪ জন।[৬৫]

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তাগঞ্জ থেকে একটি রেলওয়ে লাইন চালু হলে মহকুমা শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। হবিগঞ্জ শহরে হবিগঞ্জ কোর্ট ও হবিগঞ্জ বাজার নামে দু'টি রেল স্টেশন ছিল। বর্তমান এম এ মোত্তালিব চত্বর-এর সন্নিকটে কোর্ট স্টেশনটির অবস্থান ছিল। উক্ত রেল লাইনটি বর্তমানে বিলুপ্ত এবং এর স্থলে শহর বাইপাস সড়কটি বিদ্যমান। যার ফলে পশ্চিম দিকে শহরের সম্প্রসারণ ঘটছে। অপর দিকে শহরের পূর্ব ও উত্তর পাশ খোয়াই নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর কালে খাল খননের মাধ্যমে খোয়াই নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা হলে কেবল উত্তর দিকে খোয়াই নদী বিদ্যমান। পূর্ব পাশের মরা নদী দখলের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভরাট হলেও খোয়াই নদীর এই গতি পরিবর্তনের ফলে পূর্ব দিকে শহরের সম্প্রসারণ ঘটছে। বর্তমানে সে মরা নদী শহরের অভ্যন্তর ভাগে বিদ্যমান। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পইল থেকে চৌধুরী বাজার খোয়াইমুখ পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ করায় শহর সুরক্ষার পথ সুগম হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ:

১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ১১১

২. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাঃ কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ৫৭

৩. এ.আর.এম.খালিকুজ্জামান, *জেলা প্রশাসন বাংলাদেশ*। পৃষ্ঠা ৬২

৪. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাঃ কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ৬২

৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস,* এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫

৬. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২৪৬

৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২৪৬

৮. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২৪৫

৯. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো ১৭৫৭-১৮৫৭*, বাংলা একাডেমী ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ১৭৪

১০. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস,* এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১০৫

১১. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো ১৭৫৭-১৮৫৭*, বাংলা একাডেমী ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ১৭৪

১২. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৭৬

১৩. কাজী আজহার আলী, *বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন*, সূচীপত্র ২০০৩। পৃষ্ঠা ১৫

১৪. ক. Assam District Gazetteers Voll. II.(Sylhet). Page 42. খ. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড,* উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৪

১৫. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *শিকড়ের সন্ধানে শিলালিপি ও সনদে আমাদের সমাজ চিত্র*, প্রকাশক: সৈয়দা তাহেরা বেগম ২০০১। পৃষ্ঠা ১১৩

১৬. মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, *শিলহটের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৬। পৃষ্ঠা ২৬২

১৭. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ২৬

১৮. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৭৬

১৯. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৭৩

২০. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৬৭

২১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৩৮

২২. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

২৩. সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় হাত তুলে সমর্থন জ্ঞাপন পদ্ধতিতে এ নির্বাচন হতো।

২৪. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ১৬২

২৫. ক. কে আলী, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ)*, আলী পাবলিকেশনস ১৯৮৯। পৃষ্ঠা ৫২১। খ. জে.এম. বেলাল হোসেন সরকার, *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের ইতিহাস*, হাসান বুক হাউস ১৯৯২। পৃষ্ঠা (তৃতীয় খণ্ড) ৬৪

২৬. বাংলাপিডিয়া অনলাইন ভার্সন (নিবন্ধ: বানিয়াচং উপজেলা), সংগ্রহ: ১৮-০৭-২০১৮।

২৭. প্রাগুক্ত। (নিবন্ধ: মাধবপুর উপজেলা), সংগ্রহ: ১৮-০৭-২০১৮।

২৮. ক. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ১৬৪। খ. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহজালাল র., ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ৪২২।

২৯. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, প্রবন্ধ: হবিগঞ্জের জমিন ও জীবনের ঔতিহাসিক রূপরেখা, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল। পৃষ্ঠা ৪৬

৩০. সৈয়দ মোসতাকীম আলী ও আব্দুল হাই আজাদ, প্রবন্ধ: নবীগঞ্জ থানা পরিচিতি, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল। পৃষ্ঠা ৩০২

৩১. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *হবিগঞ্জের মুসলিম মানস*, প্রকাশক : ডাঃ মোহাম্মদ আফজল ১৯৯১। পৃষ্ঠা ২৬

৩২. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *সিলেট বিভাগের ভৌগলিক ঐতিহাসিক রূপরেখা বিবিধ*, প্রকাশক: শেখ ফারুক আহমদ ২০১১। পৃষ্ঠা ৯৪

৩৩. সৈয়দ আহমদুল হক ও সৈয়দ গাজীউর রহমান, প্রবন্ধ: হবিগঞ্জ থানা পরিচিতি, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল। পৃষ্ঠা ৩১৮

৩৪. W.W. Hunter, Statistical Accounts of Assam Vol. II.(Sylhet).. Page 319

৩৫. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 1

৩৬. ডাঃ মোহাম্মদ আফজল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, হবিগঞ্জ ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ; তথ্য সংক্ষেপ : এক নজরে হবিগঞ্জ দ্রষ্টব্য।

৩৭. সৈয়দ হবিব উল্লাহ কর্তৃক খোয়াই নদীর তীরে বাজার প্রতিষ্ঠা এবং তা থেকে 'হবিগঞ্জ' নামকরণের ধারণাটি সর্বপ্রথম আসে 'শ্রীহট্ট দর্পণ' পুস্তক থেকে। মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ কর্তৃক রচিত পুস্তকটি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে, '১০০ বৎসরের অধিক হইল পং তরফ মৌজে সুলতানশীর জমিদার সৈয়দ আব্দুল্লাহ সাহেবের পূর্ব্ব পুরুষ মৃত সাহা সৈয়দ হবিবউল্লা সাহেব হবিগঞ্জে বাজার বসাইয়াছিলেন। এই বাজার তাহাদেরই আছে; হিন্দু জমিদারগণও অংশীদার হইয়াছেন।' উক্ত বক্তব্যানুযায়ী ধরে নেয়া যায়, সংশ্লিষ্ট বাজার প্রতিষ্ঠার কাল আনুমানিক (১৮৮৬ – ১০০) ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ বা এর কাছাকাছি কোনো সময়– ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে।

৩৮. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 379

৩৯. নামকরণের বিষয়টি পৃথকভাবে 'হবিগঞ্জ নামকরণ বিতর্ক' শিরোনামে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

৪০. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ১৬২

৪১. https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশ_পুলিশ# (সংগ্রহ : ২৯ জুলাই ২০১৮)।

৪২. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 383-409

৪৩. মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ, *শ্রীহট্ট দর্পণ*, প্রথম প্রকাশ: ১৮৮৬, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ২৮

৪৪. সৈয়দ আহমদুল হক ও সৈয়দ গাজীউর রহমান, প্রবন্ধ: হবিগঞ্জ থানা পরিচিতি, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল। পৃষ্ঠা ৩১৮

৪৫. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ- প্রথম ভাগ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৭। ফুটনোটে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট ঘ' দ্রষ্টব্য।

৪৬. সৈয়দ আহমদুল হক ও সৈয়দ গাজীউর রহমান, প্রবন্ধ: হবিগঞ্জ থানা পরিচিতি, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল। পৃষ্ঠা ৩১৮

৪৭. ক. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 352. খ. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৩৮

৪৮. W W Hunter, *A Statistical Account of Assam,* Spectrum Publication, Guwahati 1998, page 340

৪৯. জালাল আহমেদ, প্রবন্ধ: হবিগঞ্জের ইতিহাস : কয়েকটি প্রসঙ্গ, *আমার হবিগঞ্জ, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা* (দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১১)। পৃষ্ঠা ১১

৫০. ডাঃ মোহাম্মদ আফজল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, হবিগঞ্জ ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ (তথ্য সংক্ষেপ : এক নজরে হবিগঞ্জ দ্রষ্টব্য)। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (পৃষ্ঠা ৩৭৪) ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জে ইউনিয়ন গঠনের কথা বলা হয়েছে। সে হিসেবে সে সময়কালেই সাবডিভিশন কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে বলে কেউ কেউ দাবি করেন। কেউ কেউ দাবি করেন, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সেখানে শহরের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

৫১. The first subdivision was opened at Sunamganj in January 1877, and there was evidently, even at that time, considerable stringency, as the Subdivisional Officer designate, who was a European was informed that he could buil d himself a *kutchery* and a comfortable dwelling house for at most Rs.2,000. The sanctioned staff for subdivisional establishments both here and at Habiganj and Karimganj, which were opend in the following year, were one *sheristadar* on Rs.50 per mensem, one clerk on Rs.30 per mensem, four clerks on Rs.20 per mensem, a *potdar* and a *daftari* each on Rs.6 per mensem, and a *chaprasi* on Rs.5 per mensem. (S. N. H. Rizvi. *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970);* Page 353)

৫২. ক. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৯। খ. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৩৮। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (পৃষ্ঠা ৩৯০) ১৮৭৮ এর পরিবর্তে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ বলা হয়েছে। সম্ভবত এটি মুদ্রণ প্রমাদ।

৫৩. শেখ ফজলে এলাহী, *হবিগঞ্জের রাজনৈতিক ইতিহাস : ব্রিটিশ আমল*, উৎস প্রকাশন ২০১৮। পৃষ্ঠা ১৪। উক্ত গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখিত '১৮৮৮' এর পরিবর্তে '১৮৮০' উল্লেখ করে ভ্রম সংশোধনের পরিবর্তে পুনরায় একটি ভ্রমাত্মক বর্ণনা পেশ করা হলো।

৫৪. W W Hunter, *A Statistical Account of Assam,* Spectrum Publication, Guwahati 1998, page 340

৫৫. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 390

৫৬. W.W. Hunter, *Imperial Gazetteer of India 1905, Vol. 13*. page 2

৫৭. সৈয়দ মোস্তফা কামাল তাঁর প্রসঙ্গ বিচিত্রায় (পৃষ্ঠা ৮৬) নোয়াখালী রাজস্ব জিলার চুয়াল্লিশ, শায়েস্তা নগর, চৈতন্য নগর, পাচাউন, হাউলী সত্রসতী, সুজাবাদ, চৌতলী, বালিশিরা, সাতগাঁও, কিসমত সাতগাঁও প্রভৃতি ১২টি পরগণার উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে বালিশিরা, সাতগাঁও, কিসমত সাতগাঁও প্রভৃতি হবিগঞ্জ মহকুমার সীমান্তবর্তী পরগণা।

৫৮. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 353

৫৯. B. C. Allen, E. A. Gait, *Gazetteer of Bengal and North East India,* Mittal Publications 1993, page 432

৬০. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 379

৬১. *Ibid,* Page 360

৬২. *Ibid,* Page 374

৬৩. *Ibid,* Page 375

৬৪. লস্করপুরে কালী, মহাদেব ও বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে। সেখান থেকে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তা স্থানান্তর হয় হবিগঞ্জে। [অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। ১ম ভাগ ৯ম অধ্যায় পরিশিষ্ট ঞ, পৃষ্ঠা ২৭]

৬৫. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 379.

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

প্রাচীনকালে রাজস্ব বলতে ভূমির খাজনা বা করকেই বুঝাতো। তাই ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা একে অপরের পরিপূরক ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেকালের শাসনব্যবস্থা পরগণাকেন্দ্রিক ছিল। প্রত্যেক পরগণায় জমিদার, তালুকদার ও রায়ত এই তিন প্রধান শ্রেণির ভূমি স্বত্বাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তালুকদারগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথমোক্ত শ্রেণি সরাসরি সরকারি খাজাঞ্চিতে রাজস্ব দিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণি জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদান করতেন।[১]

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শীদকুলী খাঁন সিলেট জেলাকে ১৪৮টি মহাল বা পরগণায় বিভক্ত করেন। নানা রকম যোগাযোগ ও রাজস্ব বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে পরে এ সকল পরগণা থেকে আরও ২৫টি পরগণা খারিজ করা হয়। খারিজা পরগণাগুলোর কোনো কোনোটি নতুন নামে আবার কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে মূল পরগণার সাথে কসবা (উপশহর), কালা (বড়), কিসমত (অংশ), খালিসা (মূল বা রাজস্বযুক্ত), খুর্দ (ক্ষুদ্র), জোয়ার (নিকটস্থ), নাওরা (নৌ-বিভাগ), বাজু (অংশ), বাদে (অংশ), সিক (খণ্ড), হাউলী (আশ-পাশ) ইত্যাদি সংযোগ করে নামকরণ করা হতো।[২]

ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বকালে চার শ্রেণির জমিদারের বিবরণ দিয়েছেন। সে মতে, সম্রাট আকবরের সময়কালের পূর্ববর্তী জমিদারগণ প্রথম শ্রেণির। তারা হিন্দু-মুসলিম রাজাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। দ্বিতীয় শ্রেণির জমিদারগণ প্রথম শ্রেণির মতো কিছুটা শাসনক্ষমতা ভোগ করলেও সম্রাটের প্রতিনিধিকে ভূমি-রাজস্ব প্রদান করতেন। সামাজিক মর্যাদায় তারা অনেকটা সামন্তরাজা বা প্রধানের অনুরূপ ছিলেন। এক সময় তরফের সৈয়দ বংশের কেউ কেউ এ রকম ক্ষমতা ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ইটা, লংলা, ভানুগাছ, দিনারপুর, বেজোড়া, পঞ্চখণ্ড, পাথারিয়া, জগন্নাথপুর ও বানিয়াচঙ্গের জমিদারদের কথা উল্লেখ করা যায়। একাধিক পুরুষানুক্রমে রাজস্ব আদায়কারীগণ তৃতীয় শ্রেণির জমিদার রূপে পরিগণিত হতেন। কোম্পানি শাসন জারির পর কোম্পানির পক্ষে যারা রাজস্ব আদায় করতেন তারা ছিলেন চতুর্থ শ্রেণির জমিদারের পর্যায়ভুক্ত। এই শ্রেণির জমিদারের সংখ্যা ছিল বেশী।[৩]

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের এক তথ্যানুযায়ী জানা যায়, তখন সিলেটে ৭,৩২৭টি গ্রাম ও ২৯,২৪৩টি তালুক ছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে জেলার ৭৭,৮৭০টি মহাল থেকে ৪,৬১,৪৫৫ টাকা রাজস্ব আদায় হতো। তন্মধ্যে ৫২,১১৭টি চিরস্থায়ী মহালের ২৬টির রাজস্ব ছিল এক হাজার টাকার উর্ধ্বে; ৪৬৪টির খাজনা একশত টাকার উর্ধ্বে; এক টাকা থেকে কম রাজস্বের মহাল ছিল ২৫,০২৩টি; এক আনার কম রাজস্বের মহাল ছিল মাত্র ১,৫৬৬টি এবং নিষ্কর মহাল ছিল ১,২৩৪টি।[৪]

আইন-ই-আকবরী মতে হবিগঞ্জ অঞ্চলের বানিয়াচঙ্গ মহালের রাজস্ব ছিল ১,৬৭২,০৮০ দাম ও বেজোড়া মহালের রাজস্ব ছিল ৮০৪,০৮০ দাম।[৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ, লস্করপুর ও শঙ্করপাশা কালেক্টরী বিভাগভুক্ত পরগণাসমূহের মোট রাজস্ব ছিল ১,১৮,২৭৯ টাকা।

ভূমি ব্যবস্থাপনার মূল তত্ত্ব ছিল রাজস্ব আদায়ের কৌশলগত ব্যবস্থা। ইংরেজ শাসনকালে রাজস্বের প্রায় পুরোটাই আয় হতো ভূমি বন্দোবস্ত থেকে। তাই এই বন্দোবস্ত প্রক্রিয়াটিকে কি ভাবে নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে প্রণয়ন করা যায় সেটি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে জন্যে ওরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে।

লর্ড কর্নওয়ালিশ পর্যন্ত সিলেট অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থা মূলত জমিদারি প্রথার অন্তর্গত ছিল। প্রায়শ জমিদারি নিলাম হতো এবং রাজকর্মচারিরাই তা ক্রয় করতেন। এ ব্যাপারে জমিদারগণ কখনও প্রজাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবতেন না। ফলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে নানা ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতো। এতে রাজস্ব আদায়ে সরকারও নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতো। এসব কারণে বাংলায় লর্ড কর্নওয়ালিশ দশসনভিত্তিক একটি ভূমি বন্দোবস্ত বিধি জারি করেন। তখন সিলেটের রেসিডেন্ট ছিলেন জন উইলিস (১৭৮৯-১৭৯৩)। তিনি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে সে জরিপের কাজ সমাধা করেন।

এ কথা অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই যে, ব্রিটিশপূর্ব কালে ভূমিতে সর্বসাধারণের মালিকানা অধিকার ছিল স্বপ্নেরই মতো। জনসচেতনতা আর সরকারের সদিচ্ছায় দীর্ঘ দুইশ বছরের পথ পরিক্রমায় ধাপে ধাপে কৃষক-প্রজা তাদের দখলীয় ভূমিতে মালিকানার অধিকার অর্জন করে। এই সুবাদে ক্রমান্বয়ে ভূমির শ্রেণি বিন্যাসসহ প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয়েও অগ্রগতি সম্ভব হয়। মেজর জেম্‌স রেনেল ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে সর্ব প্রথম এদেশে জরিপ পরিচালনা করেন। এই জরিপে অবশ্য ব্যক্তিগত বা জমিদারির সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

তখন সমগ্র ভারতেই রায়তি, পাট্টাদারি ইত্যাদি ভূমি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলা, বিহার, বেনারস জেলা (বর্তমান যুক্ত প্রদেশ) ও মাদ্রাজ প্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। ব্রিটিশ ভারতের এক-পঞ্চমাংশ ছিল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। তৎকালীন পূর্ববাংলার ৪৪ হাজার বর্গমাইল ভূমির মধ্যে ৩৪ হাজার বর্গমাইল ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন।[৬]

সিলেট অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্ত জমিদারি এলাকার সীমা নির্ধারণের জন্য ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭টি জরিপ সম্পন্ন হয়েছিল বলে জানা যায়।[৭] দশসনা বন্দোবস্ত প্রদানের সময় মি. উইলিস কর্তৃক জমির পরিমাণ ও খাজনা নির্ধারণ করে যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তা-ই হস্তবোধ জরিপ (১৭৮৮-৮৯) হিসেবে অভিহিত হয়। এই জরিপকালে কোনো নকশা প্রস্তুত না করে কতকগুলো কিত্তা প্রস্তুত করে তাতে এস্টেটগুলোর সীমানা নির্ধারণ করা হয় এবং তদনুযায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়।

বস্তুত এই জরিপ ছিল অনেকটা ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারি ও স্থানীয় মধ্যস্বত্ব ভোগিদের তৎপরতায় ক্ষেত্র বিশেষে বিধি-বিধানে যথেষ্ট অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ সব

বিষয়ের পাশাপাশি উইলিসের ত্রুটিপূর্ণ ভূমি জরিপের কারণে সিলেটের ভূমি ব্যবস্থায় নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। এ সকল সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়েই মূলত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন জরিপ ও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সিলেটে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সাময়িক বন্দোবস্ত ও লাখেরাজ ভূমিস্বত্ব এ ৩ শ্রেণিতে ৩৫ প্রকারের ভূমিস্বত্ব লক্ষ্য করা যায়। যথা : ১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত এস্টেট: দশসনা বন্দোবস্ত এস্টেট, হালাবাদি মালাইম এস্টেট, বাজেয়াপ্তি মাদাইমি (দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, চেরাগি, মদদ-ই-মাস, শিরনি, বেলামবাড়ি, সিগা মুহম্মদ আলী খান বন্দোবস্তি, রোজিনা, দর-উস-সফা, তন খাওয়া, নানকার, কানুনগো, খানাবাড়ি, হুর ও ইজাদ এস্টেট), খাস মাদাইমি ও খাস মহাল; ২. সাময়িক বন্দোবস্তকৃত এস্টেট: ইলাম, নানকার পাটোয়ারিগিরি, খাস মুয়াদি, চর-ভরাট, সম্বার বরদাশত, সেগুন, উজর লাইন, জলকর, জঙ্গলবাড়ি ও তোপখানা; ৩. লাখেরাজ বা করমুক্ত ভূমিস্বত্ব: সিদ্দানিষ্কর, খানাবাড়ি জমিদারি, খাস হাল, কসবা সিলেট ও নানকার জমিদারি।[৮]

অন্যান্য অঞ্চলের যে সকল জমিদার মোগল আমলে চৌধুরীদের মতো নিজেরা রাজস্ব আদায় করতেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদেরকেই দেয়া হয়। দেশের অপরাপর অঞ্চলের মতো এখানেও ভূমি শ্রেণি বিভিন্ন তালুকে চিহ্নিত করা হয়। তবে সিলেট অঞ্চলে সে সময়ে যারা চৌধুরী ও তালুকদারদের মাধ্যমে খাজনা প্রদান করতেন তাদেরকে অর্থাৎ সরাসরি প্রজাদেরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়।[৯] অবশ্য তৎকালে সিলেট অঞ্চলে কেবল বানিয়াচঙ্গের জমিদার ব্যতীত প্রকৃত অর্থে কোনো জমিদার ছিলেন না।[১০] সিলেটে পাঁচ শত টাকার অধিক রাজস্ব প্রদানকারী ভূস্বামীগণ জমিদার বলে পরিচিত ছিলেন। তার নিম্নে রাজস্ব প্রদানকারীগণ তালুকদার বা তাপাদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[১১]

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এই দশসনা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে পরিণত হয়।[১২] অন্যান্য জেলার সাথে সিলেটের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভিন্নতা বিদ্যমান। যেমন প্রথমত সিলেট অঞ্চলে জরিপ করার পরই কেবল বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। এতে দশসনা বন্দোবস্তের আওতায় যে সব জমি ছিলনা কিংবা চিরস্থায়ী বা সাময়িক কালের জন্য যে সব জমি বন্দোবস্ত হয়নি এবং যে সব জমি লাখেরাজ জমি হিসেবে চিহ্নিত হয়নি এ সব ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়নি। এগুলো পরবর্তীতে ইলাম মহাল নামে অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত সিলেটের অধিকাংশ চৌধুরী দশসনা এবং পরবর্তীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করায় জমি প্রকৃত চাষিদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। সে কারণে সিলেটে বন্দোবস্তধারীর সংখ্যা অনেক বেশি।

প্রসঙ্গত তরফের জমিদারির কথা আসতে পারে। তরফ এককালে রাজ্য হিসেবে কথিত হতো। পরবর্তীতে এর আয়তন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। জমিদারদের অযোগ্যতা, ভোগ-বিলাস, কর্মচারিদের নানা রকম প্রতারণামূলক আচরণ ইত্যাদি কারণে একে একে বিভিন্ন তালুক/এস্টেট বিক্রি হতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালেই এই জমিদারি বর্তমান চুনারুঘাট, বাহুবল ও আংশিকভাবে হবিগঞ্জ উপজেলা এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বংশবৃদ্ধির কারণে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারায় এই তরফ পরগণা থেকে ফয়েজাবাদ, নুরুলহাসন নগর, গদাহাসন নগর, উসাইনগর,

দাউদ নগর, রিয়াজপুর, রঘুনন্দন, আনন্দপুর ও পুটিজুরি পরগণা খারিজ হওয়ায় অবশিষ্ট যে অংশ থাকে তাকে পরবর্তীতে আদি 'তরফ পরগণা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

হস্তবোধ জরিপকালে জিলা লস্করপুর এবং জৈন্তার কিছু পরগণা সিলেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তখন সিলেটের আয়তন ১৪,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার ছিল বলে উল্লেখ হলেও উক্ত জরিপের ফলাফল অনুযায়ী জেলার আয়তন ছিল ১১,৩৯৩.৯৮ বর্গ কিলোমিটার। এর কারণ সিলেট অঞ্চলের বহু জমি হস্তবোধ জরিপের আওতাভুক্ত হয়নি। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, মি. উইলিস জৈন্তা পরগণার ১,২৫৩.৫৬ বর্গ কি.মি., জিলা লস্করপুর ও মনতলা পরগণার ৮০৮.০৮ বর্গ কি.মি., সুরমা নদীর উত্তর পার্শ্বস্থ খাসিয়া ভূমি ৭৭৭ বর্গ কি.মি. সর্বমোট ২,৮৩৮.৬৪ বর্গ কি.মি. এলাকা জরিপ করেননি। তাই তার জরিপানুযায়ী জেলার আয়তন দাড়ায় ১১,৩৯৩.৯৮ বর্গ কি.মি.।[১৩]

দশসনা বন্দোবস্তের পূর্বে নাওরা মহাল উল্লেখে তরফ ঢাকার অন্তর্ভুক্ত 'চাকলে জাহাঙ্গির নগর, জিলা লস্করপুর' বলে লেখা হতো। মোহাম্মদ রেজা খাঁর চকবন্দি মতে এর সদরজমা ছিল ১৬,২১৭ টাকা। তখন পর্যন্ত তরফ একটি অখণ্ড জায়গির ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের তৌজিতে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয় না। তাই ধারণা করা যায়, এরপর বিভিন্ন তালুকের সৃষ্টি হয়। সিলেটের কালেক্টরিভুক্ত হওয়ার পর এর খারিজা ১০টি পরগণা ব্যতীত সদরজমা ছিল ৪৪,০০০ টাকা।[১৪]

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের রেভিনিউ রুল অনুযায়ী সিলেটে দশসনা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তাধীন ২৬,২৯৩টি এস্টেট বা মহাল ছিল। এগুলোর রেজিস্টার্ড মালিক ছিলেন ২৯,৩১৭ জন। দশসনা বন্দোবস্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে ২০-১২-১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের এক সরকারি আদেশে সিলেটকে পারকুল, তাজপুর, জয়ন্তিয়াপুর (উত্তর সিলেট); লাতু (করিমগঞ্জ); নোয়াখালী, রাজনগর, হিংগাজিয়া (দক্ষিণ সিলেট); নবীগঞ্জ, লস্করপুর, শঙ্করপাশা (হবিগঞ্জ); ও রসুলগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) এই ১১টি রাজস্ব জেলায় বিভক্ত করার সুপারিশ করা হয় এবং কালেক্টর উইলিসের আমলেই তা কার্যকর হয়।

উল্লেখ্য জনাব নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর 'জালালাবাদের কথা' গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট পত্রের তারিখ ২০-১২-১৭৯৩ এর পরিবর্তে ২০-১২-১৭৯০ উল্লেখ করেছিলেন (পৃষ্ঠা ১৬১)। যেহেতু সূত্রোক্ত গ্রন্থটি একই লেখকের এবং দুই দশক কালেরও অধিক পরবর্তী কালের সেহেতু মুদ্রণ প্রমাদ বিবেচনায় পরবর্তী গ্রন্থোক্ত ২০-১২-১৭৯৩ তারিখটিই সঠিক মনে করা যেতে পারে।

হবিগঞ্জ পরিক্রমায় মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান একই পত্রের তারিখ হিসেবে ২-১২-১৭৯০ উল্লেখ করেছেন।[১৫] তিনি তার তথ্যে নবীগঞ্জ রাজস্ব জেলার পরগণা হিসেবে আগনা পরগণার উল্লেখ করেননি। তবে অথানগিরি, পাচাউন, হাবেলী সতরসতী এ ৩টি পরগণার অতিরিক্ত উল্লেখ করেছে। লস্করপুর রাজস্ব জেলার ফয়েজাবাদ, নুরুলহাসন নগর, গদাহাসন নগর ও দাউদ নগর এই ৪টি পরগণার তিনি উল্লেখ করেননি।[১৬]

জন উইলিস কর্তৃক ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে যে জরিপ সমাপ্ত হয় তার ভিত্তিতে দশসনা বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়।[১৭] দশসনা বন্দোবস্তই পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে অনুমোদন পায়। এই জরিপকালে সিলেট জেলায় যে ১১টি কেন্দ্র স্থাপিত হয় তা-ই 'জিলা' নামে খ্যাত হয়। তখনও সিলেটে নবাবি

আমলের ১৬৪টি পরগণা কার্যকর ছিল।[১৮] সিলেটের সংশ্লিষ্ট ১১টি রাজস্ব জিলার মধ্যে নবীগঞ্জ, লস্করপুর ও শঙ্করপাশা এই তিনটি রাজস্ব জিলা হবিগঞ্জ অঞ্চলভুক্ত ছিল। সে অনুযায়ী[১৯]:

নবীগঞ্জ রাজস্ব জেলা : দিনারপুর, মান্দারকান্দি, চৌকি, মুড়াকৈর, বানিয়াচঙ্গ (কসবা), জোয়ার বানিয়াচঙ্গ২, আগনা, বিথঙ্গল, জোয়ানশাহী, কুরশা, বাজু সতরসতী, কিসমত সতরসতী, বাজু সুনাইত্যা, জন্তরী ও জলসুখা পরগণা;

শঙ্করপাশা রাজস্ব জেলা : বেজোড়া, উচাইল, লাখাই, রিচি, মুগীশপুর, গিয়াসনগর, কাশিমনগর[২০] ও মন্তলা[২১] পরগণা;

লস্করপুর রাজস্ব জিলা : ফয়েজাবাদ, নুরুলহাসন নগর, গদাহাসন নগর, উসাইনগর[২২], দাউদ নগর, রিয়াজপুর, রঘুনন্দন, আনন্দপুর, পুটিজুরি, তরফ[২৩] ও বামৈ পরগণা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জটিলতা ও ভূমি অধিকারের পরিবর্তনের ফলে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমিদারি বিক্রয়ের সংবাদ ছিল নিত্যকার ঘটনা। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মি. ড্রুম্‌ড কর্তৃক প্রণীত এক বিবরণীতে ১৮৩৫ ও ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের সংশ্লিষ্ট ১০টি রাজস্ব জিলায় বিদ্যমান এস্টেটের সংখ্যা ও সদর জমার পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য জানা যায়। সে মোতাবেক:

এলাম : দশসনা মহালের অতিরিক্ত সিলেট অঞ্চলের অনেক ভূমি জনগণ বিনা রাজস্বে ভোগ করতে দেখা যাওয়ায় বোর্ড অব রেভিনিউ ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে তার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য পাটওয়ারিদের প্রতি নির্দেশ দেয়। পাটওয়ারিগণ উক্ত ভূমির আনুমানিক হিসাব দশসনা মহালের অন্তর্গত মৌজাওয়ারি দাখিল করলে সিলেটের কালেক্টর এ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি আছে কি-না তা জানার জন্য এলাম বা এত্তেলা (নোটিশ) জারি করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার আর কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় এই সমস্ত ভূমি এলাম ভূমি হিসেবে অভিহিত হয়। হবিগঞ্জ অঞ্চলে এই এলাম বন্দোবস্তীয় তালুকগুলো হল: বেজোড়া, লাখাই ও দিনারপুর।[২৪]

সায়রাত মহাল[২৫]: সিলেটের মোট ২,৪৬৯টি সায়রাত মহালের মধ্যে হবিগঞ্জে মোট ৬২১টি মহাল ছিল। তন্মধ্যে ২০ একরের নিচে ৪৪৭টি, ২০ একরের ঊর্ধ্বে ১৬৫টি ও বালু মহাল ৯টি ছিল। ১৯০০ খ্রি. থেকে ১৯০৪ খ্রি. পর্যন্ত সায়রাত মহাল থেকে আয়ের একটি হিসাব পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় : ১৯০০-১৯০১ খ্রি. ১২,৩৭৪/-; ১৯০১-১৯০২ খ্রি. ১৪,৪১৪/-; ১৯০২-১৯০৩ খ্রি. ১২,৫৭৩/-; ১৯০৩-১৯০৪ খ্রি. ১৪,৮৫৯/- টাকা সরকারের আয় হয়।[২৬]

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে এর কিয়দংশ ভূমি 'হালাবাদি' নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। পাটোয়ারিদের এলাম জরিপের পরও সিলেটে অন্তত দশ লক্ষ একরেরও অধিক ভূমি জরিপের আওতাভুক্ত হয়নি। তন্মধ্যে হবিগঞ্জ অঞ্চলে রঘূনন্দন পাহাড়ের ১৫৭.৯৯ বর্গ কিলোমিটার ভূমি উল্লেখযোগ্য।[২৭]

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় থাকবস্ত জরিপ শুরু হয়। সিলেটে এ জরিপ ১৮৫৯-৬৫ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত হয়।[২৮] এ সময়ে সিলেটে ৭৭,০০০টি মহাল ছিল। এ জরিপ কালে রঘুনন্দন,

দিনারপুর, সাতগাও, বালিসিরা, ভানুগাছ, হারারগাছ বা লংলা, পাথারিয়া ও সরিপুর বা সিদ্ধেশ্বর এই ৮টি জঙ্গলাকীর্ণ মহালের সন্ধান মিলে।[২৯]

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের এক তথ্য মতে, তখন ভূমির শ্রেণি ও মান অনুযায়ী কেদার প্রতি খাজনার হার ছিল[৩০]:

ক্রমিক নং	ভূমির শ্রেণি	ভূমির মান		
		উৎকৃষ্ট	মধ্যম	নিকৃষ্ট
১	বসতভিটা	২ টাকা	দেড় টাকা	১০ আনা
২	দো-ফসলা	দেড় টাকা	১ টাকা	১০ আনা
৩	এক ফসলা	৫ শিকা	১ টাকা	৩ আনা
৪	আমন	১০ আনা	৮ আনা	২ আনা
৫	রবিশস্য বা চারা	১ টাকা	১২ আনা	২ আনা
৬	ছন	১ টাকা	৮ আনা	২ আনা
৭	ছাড়াভিটা	১ টাকা	৮ আনা	৪ আনা
৮	পতিত	৪ আনা	৩ আনা	১ আনা
৯	জঙ্গল	৪ আনা	২ আনা	১ আনা

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের বন্দোবস্ত অনুযায়ী হবিগঞ্জ এলাকায় আবাদি ভূমির পরিমাণ ছিল ৬,৭৪৮ বিঘা; ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের বন্দোবস্ত অনুযায়ী এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৪৯৮ বিঘায় উন্নীত হয়।[৩১]

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সিলেটে প্রায় ৯৮,৮৪২টি এস্টেট রয়েছে। সে অনুযায়ী ১০০ হতে ৩,৪০০ টাকা পর্যন্ত রাজস্ব প্রদেয় জমিদারি এস্টেট ৪৭২টি; অনূর্ধ্ব ১০০ টাকা প্রদেয় জমিদারি এস্টেট ৪৯,৬০০টি; কৃষক-মালিকানাধীন এস্টেট ৪৬,০০০টি; রাজস্বমুক্ত এস্টেট ২,৬০০টি ও অনাবাদি ভূমি দান ১৭০টি এস্টেট।[৩২] তখন আবাদি ভূমির পরিমাণ ছিল খুবই সীমিত।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে 'জিলা' নামে এ সময়ে সিলেট জেলায় ১০টি কালেক্টরি বিভাগ স্থাপিত হয়। জিলার কর্মচারি পদটি 'জিলাদার' নামে খ্যাত ছিল। জিলাদারগণ তহশিলদারের অধীন কর্মচারি ছিলেন।[৩৩] তখনও সিলেটে নবাবি আমলের ১৬৪টি পরগণা কার্যকর ছিল। প্রতিটি পরগণা বহু সংখ্যক তালুক ও মৌজা বা গ্রামে বিভক্ত ছিল। হবিগঞ্জ অঞ্চলে ছিল মোট ৩৫টি পরগণা, ১১,৩৩৯টি তালুক, ২,৫৮০টি মৌজা বা গ্রাম যার মোট ১,১৮,২৭৯ টাকা রাজস্বের তথ্য জানা যায়। তখন মোট ভূমির পরিমাণ ছিল ৫,০১,১৭৭ একর।

১৯০৩-১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে জৈন্তা ব্যতীত সিলেটের অস্থায়ী বন্দোবস্তকৃত ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। কিন্তু এর পূর্বে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের বন্যাজনিত ফসলহানির জেরে সিলেটের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন ছিল বিধায় এই বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া সফল হতে পারেনি। সে সময়ের হিসাব অনুযায়ী হবিগঞ্জে বন্দোবস্তকৃত ভূমি ছিল ৯২৯ বর্গমাইল এবং অবন্দোবস্তকৃত ভূমি ছিল ২৩ বর্গমাইল।[৩৪]

অতীতে গ্রাম এবং মৌজা সমার্থক বুঝাতো। রাজস্বের সুবিধার্থে ভূমি তৌজি, তালুক ইত্যাদিতে বিভাজন হতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আবাদকরণের শর্তে বন্দোবস্তকৃত অনাবাদী জমিকে 'তালুক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তালুকের স্বত্বাধিকারীগণ তালুকদার পদবিতে অভিহিত হতেন।

সমগ্র দেশে পূর্ণাঙ্গ বা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ হলেও সিলেট জেলায় তা হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৭ ধারার বলে প্রজ্ঞাপন নং ৩৬১৫ এল.আর তারিখ ৭ জুন, ১৯৫০ খ্রি. মোতাবেক ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ জরিপ শুরু হয়। এই জরিপে এক বা একাধিক সীটে মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন করে প্রতিটি ভূমি-খণ্ডকে একটি দাগ নম্বরে চিহ্নিত করা হয়। এই দাগ নংগুলো আবার মালিকানার ভিত্তিতে খতিয়ানভুক্ত করে তাতে ঊর্ধ্বতন মালিকের (জমিদার) নাম, দখলকারী রায়তের নাম, রায়তি স্বত্বের শ্রেণি, জমির পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে[৩৫] ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জমিদারি উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় মধ্যস্বত্ব ভোগীদের স্বত্ব ও স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হয়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ক. খাজনাভোগি সকল জমিদারি স্বত্বের অবসান এবং এ রকম ভূমি অধিগ্রহণ খ. প্রজাকে জমির দখল প্রদান গ. পত্তনি প্রথা রদ করা ঘ. জোতদারের সর্বোচ্চ সীমা ৩৩ একরে (১০০ বিঘা) নির্ধারণ এবং অবশিষ্ট ভূমি ভূমিহীন ও গরীব রায়তের মধ্যে বিলি-বণ্টন করা।[৩৬] আইয়ুব আমলে ভূমি মালিকানার সীমা ১২৫ একর বা ৩৭৫ বিঘা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ভূমি মালিকানার সীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ করা হয়।[৩৭]

রেকর্ডকৃত খতিয়ান সমূহ হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন ভলিওমে তিন কপি করা হয়। এর এক কপি জেলা রেকর্ডরুমে, এক কপি সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) এবং এক কপি তহশিলদারের দপ্তরে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু এসএ খতিয়ানের হস্তলিখিত কপিতে জাল-জালিয়াতির সমস্যা দেখা দেয়ায় পরবর্তীতে তা মুদ্রণ করা হয়।

আসাম অঞ্চলে মৌজাদারি ব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো। মৌজাদারগণ চুক্তিভিত্তিক কমিশনের বিনিময়ে এক বা একাধিক মৌজায় নিয়োজিত হতেন। ব্রিটিশ উপনিবেশ কালে জিলাওয়ারি ১০/১২টি মৌজার সমন্বয়ে একটি করে তহশিল কার্যালয় স্থাপন পূর্বক প্রত্যেক তহশিলে বেতনধারী একজন করে তহশিলদার নিয়োগ করা হয়।[৩৮]

তহশিলদার কর্তৃক খাজনা আদায়ের জন্য পরগণাভিত্তিক শীত ও গ্রীষ্মকালীন সময়ের জন্য তারিখ নির্ধারিত ছিল। রাজস্ব জেলাওয়ারি পরগণাগুলোর খাজনা আদায়ের শেষ তারিখ নিম্নরূপ[৩৯]:

১। জিলা – নবীগঞ্জ

গ্রুপ ১ : শীতকালীন কিস্তি ৩০ সেপ্টেম্বর, গ্রীষ্মকালীন কিস্তি ৭ এপ্রিল। পরগণা : দিনারপুর, মান্দারকান্দি, চৌকি ও মুড়াকৈর।
গ্রুপ ২ : শীতকালীন কিস্তি ৩০ সেপ্টেম্বর, গ্রীষ্মকালীন কিস্তি ১৪ এপ্রিল। পরগণা : বানিয়াচঙ্গ।

গ্রুপ ৩ : শীতকালীন কিস্তি ৩০ সেপ্টেম্বর, গ্রীষ্মকালীন কিস্তি ২১ এপ্রিল। পরগণা : জোয়ার বানিয়াচঙ্গ, আগনা, বিথঙ্গল, জোয়ানশাহী, কুরশা, বাজু সতরসতী, কিছমত সতরসতী, বাজু সুনাইতা, জন্তরী ও জলসুখা।

২। জিলা – শঙ্করপাশা

গ্রুপ ১ : শীতকালীন কিস্তি ৩০ সেপ্টেম্বর, গ্রীষ্মকালীন কিস্তি ২৮ এপ্রিল। পরগণা : বেজোড়া।
গ্রুপ ২ : শীতকালীন কিস্তি ৩০ সেপ্টেম্বর, গ্রীষ্মকালীন কিস্তি ৫ মে। পরগণা : উচাইল, লাখাই, রিচি, মুগীশপুর, গিয়াসনগর, কাশিমনগর ও মনতলা।

৩। জিলা – লস্করপুর

গ্রুপ ১ : শীতকালীন কিস্তি ৩০ সেপ্টেম্বর, গ্রীষ্মকালীন কিস্তি ১২ মে। পরগণা : তরফ।
গ্রুপ ২ : শীতকালীন কিস্তি ৩০ সেপ্টেম্বর, গ্রীষ্মকালীন কিস্তি ২২ মে। পরগণা : ফয়েজাবাদ, নুরুলহাসন নগর, গদাহাসন নগর, উসাইনগর, দাউদ নগর, রিয়াজপুর, রঘুনন্দন, আনন্দপুর, পুটিজুরি ও বাঁমৈ।

কোনো কোনো তথ্যে আথানগিরি, পাচাউন, হাউলি সতরসতী এবং সুজাবাদ পরগণাকে হবিগঞ্জ মহকুমার সাথে একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এসব পরগণা দক্ষিণ শ্রীহট্ট বা মৌলভীবাজার মহকুমার তালিকায়[৪০] ১. আথানগিরি ১৩. পাচাউন ২২. হাউলি সতরসতী ও ২৬. সুজাবাদ ক্রমিকে উল্লেখিত আছে। মনতলা পরগণা ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত ত্রিপুরা জেলার সার্ভে রিপোর্ট মোতাবেক চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালে এর ভূমির পরিমাণ ছিল ৬৭১১ একর।[৪১] পরবর্তীতে এটি শঙ্করপাশা রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

তরফের বিশাল জমিদারি সংকোচনের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে ত্রিপুরার সাথে যুদ্ধবিগ্রহ। জিকুয়ার যুদ্ধে ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য কর্তৃক সৈয়দ মুসা পরাজিত ও সপুত্রক বন্দি হলে তরফের অধিকার চলে যায় ঈশা খাঁ'র হাতে। ঈশা খাঁর পক্ষে তাঁর সেনাপতি ও অন্যতম ভূঁইয়া পাহলোয়ান মাতাঙ্গ নামে এ এলাকা কিছুদিন শাসন করেন।[৪২] এরপর মোগল দরবারে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করে তরফের সৈয়দগণ যে অংশ প্রাপ্ত হন তা মোটামুটি বর্তমান চুনারুঘাট, বাহুবল ও হবিগঞ্জ থানা এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

এই সীমিত ভূখণ্ডও অল্প নয়। যাহোক এই জমিদারি নিয়েই সৈয়দগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করছিলেন। বংশবৃদ্ধির ফলে ভাগ-বাটোয়ারার কারণে এই জমিদারি ক্রমান্বয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়। কেউ কেউ নিজেদের ভূসম্পত্তি ঠিক রাখলেও কোনো কোনো জমিদার এতই অলস ও অকর্মন্য ছিলেন যে, আয়-ব্যয়ের হিসাব তদারকি করাকে অসম্মানের মনে করতেন।

যে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাকিতে পারিবারিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্র ক্রয় করা হতো বছরান্তে তারা পাওনা টাকার সাথে উচ্চ হারে সুদ ধরে তার বিনিময়ে জমি গ্রহণ করতো। শিয়ালের শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র বিতরণের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করেও অনেক টাকা কর্মচারিরা হাতিয়ে ছিলো। কর্মচারিদের প্ররোচনা ও নিজেদের নির্বুদ্ধিতার দরুন সমগ্র ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওরটাই সাতআনি

জমিদারদের হস্তচ্যুত হয়েছিল। তাদের এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু ম্যানেজাররা বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ ও বেনামে বিভিন্ন তালুক ক্রয় করে নিজেরাই জমিদার শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

ইতঃপূর্বে বাংলার জমিদারগণ জমির একচ্ছত্র মালিক হিসেবে রায়ত বা প্রজা সাধারণের উপর ইচ্ছামত অমানবিক আচরণ করতে দ্বিধা করতেন না। প্রজাকুল জমিদারের খেয়াল খুশির শিকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতো। এ অবস্থায় জনমনে সৃষ্টি হয় ব্যাপক অসন্তোষ– শুরু হয় অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হয় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। এতে দখলীয় জমিতে প্রজাদের মালিকানার অধিকার নিশ্চিত হয় এবং জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। তখন আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে সিলেটবাসী বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সুবিধা ভোগ করতে পারেনি।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ম আইন পাস হওয়ার পর থেকে সিলেট সে আইনের অধীনেই ছিল। এ আইনের বলে খাজনার হার বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের দিকে তা স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে। এ আইনের প্রভাবে সিলেটে কৃষক সম্প্রদায় ভূস্বামীদের অন্যায় আদায়ের বিরুদ্ধে কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হয়। এরকম অন্যায় আদায়ের বিরুদ্ধে এবং তৎকালের সামাজিক ব্যবস্থায় কৃষক সমাজের অধিষ্ঠান বিষয়ে হবিগঞ্জ অঞ্চলের কৃষক সমাজও যে সোচ্চার ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পুটিজুরি প্রকাশ' নামক কবিতা গ্রন্থে। এতে পুটিজুরি এলাকার ভূস্বামীদের সিদ্ধান্ত ও তার বিপরীতে রাইয়ত-প্রজাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

পুটিজুরিবাসী যত, জমীদার মনমত,
অভিমত করিলা সকলে।
পুরকায়স্ত চৌধুরী, দৃঢ় রূপ পণ করি,
ডবল করিবে কর বলে ॥
বুঝা যাবে কিছু পাছে, সেদিন কি এখন আছে,
মিছে মিছে হবে সব সলা।
রাইয়ত জিরতে যত, করি দৃঢ় পঞ্চায়ত,
ডবলেতে দেখাইল কলা ॥

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট আসামের অন্তর্ভুক্ত হলে একজন চিফ কমিশনার দ্বারা পরিচালিত সিলেটের ভূমি ব্যবস্থা তখন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের আসাম ভূমি ও রাজস্ব রেগুলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের আট আইনের অধীন ছিল সিলেট। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের পর সিলেট সে আইনের অধীন নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এ আইন সংশোধন করা হয়।[৪৩]

সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনে তালুকদার, মিরাশদারগণের জমি ভোগকারি প্রজা ভূমির মালিকানা প্রাপ্ত হয়। জমিদারি বন্দোবস্তের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সাধারণভাবে কৃষকের মালিকানা স্বত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উক্ত আইনে প্রজাদেরকে নিম্নোক্ত অধিকার প্রদান করা হয়:

১. ভূমির উপর প্রজার অধিকার ও দখলের আইনগত স্বীকৃতি;
২. যুক্তিসঙ্গত খাজনা নির্ধারণ;
৩. জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ;
৪. প্রজার নিজ প্রয়োজনে যে কোনো কাজে তার ইচ্ছামতো জমি ব্যবহারের অধিকার;
৫. আদালতের নির্দেশ ব্যতীত প্রজাদের উচ্ছেদ রোধ;
৬. উত্তরাধিকারী সূত্রে দখলীয় স্বত্ব ভোগের অধিকার;
৭. জমি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার;
৮. প্রতি খণ্ড জমি জরিপ করে রায়তের অধিকার সম্বলিত স্বত্বলিপি ও নকশা প্রণয়নের ব্যবস্থা।

সিলেট প্রজা স্বত্ব আইনে ক. মধ্য স্বত্বাধিকারী বা অধীনস্থ স্বত্বাধিকারী প্রজা খ. রায়তি প্রজা গ. অধীনস্থ রায়তি প্রজা এই তিন ধরনের প্রজার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

জমিতে অধিকার প্রাপ্তি এবং জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সকল প্রজাদেরকে একই শ্রেণিভুক্ত করে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে চেয়ারম্যান করে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশন জমিদারি প্রথা বাতিলের পক্ষে অভিমত দেয়। এরপর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এ বিষয়ে সুপারিশের জন্য সরকার আর একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটিও দেশের সকল কৃষক-প্রজাকে এক শ্রেণিভুক্ত করে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার পক্ষে অভিমত দেয়।

এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের একটি খসড়া বিল উত্থাপিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে এ বিলের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিলটি কিছু রদবদল পূর্বক ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় গৃহীত হয় এবং ১৬ মে পাকিস্তানের তৎকালিন গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

হবিগঞ্জ তথা সিলেট অঞ্চলে ভূমি হাল[৪৪], কেদার (কের) ইত্যাদি হিসেবে পরিমাপ করা হতো। ভূমি পরিমাপের এককসমূহ ছিল[৪৫]:

৩ ক্রান্তি	=	১ কড়া
৪ কড়া	=	১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা	=	১ পণ
৪ পণ	=	১ রেখ (৪৯ বর্গহাত)
৪ রেখ	=	১ যষ্টি
৭ যষ্টি	=	১ পোয়া
৪ পোয়া	=	১ কেয়ার (কেদার)
১২ কেয়ারে	=	১ হাল (৮৫৮৫ বর্গহাত)

তথ্যনির্দেশ:

১. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ২৫৯

২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ২৪৫

৩. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ২৫৯

৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২৬০

৫. Abul Fazal Allami, *THE AIN-I-AKBARI (VOL. II),* Translated by H. Blochman. Page 152

৬. F. C. Hirst, *Note on the Old Revenue Surveys of Bengal, Bihar, Orissa and Assam,* Thacker, Spink & Co. Calcutta. Page 1

৭. T. Shaw and A. B. Smith, *A Brief History of the Surveys of the Sylhet District,* Shillong, Assam Secretariat Press 1971.

৮. ক. A. L. Clay (ed.), *Report of the History and Statistics of the District of Sylhet,* Central Press Company 1868. Page 204-240. খ. B. C Allen, *Assam District Gazetteers, Vol. 11 Sylhet,* Caledonian Steam Printing Warks 1905. Page 315-318

৯. B. C Allen, *Assam District Gazetteers Voll. II. Chap. V11*. Page 214

১০. The only Zeminder known by that name, being the owner of Baniachang. At the time of the Permanent settlement, the actual occupiers of the land and not the Choudhuris were selected as the persons with whom the settlement was made. (Hunter's *Statistical Accounts of Assam VOL 11 (Sylhet),* page 117.).

১১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৭১

১২. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ২২

১৩. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ১১৩

১৪. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৭৮

১৫. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, প্রবন্ধঃ হবিগঞ্জের জমিন ও জীবনের ঐতিহাসিক রূপরেখা, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*। পৃষ্ঠা ৪৫

১৬. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৪৬

১৭. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ২১

১৮. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২২

১৯. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *সিলেট বিভাগের ইতিহাস*, প্রকাশকঃ সৈয়দা তাহেরা বেগম ২০০৬। পৃষ্ঠা ১২০। পরবর্তীতে উল্লেখিত 'হবিগঞ্জ অঞ্চলের পরগণাসমূহের তথ্য' শিরোনামের তালিকার সাথে অচ্যুৎচরণ চৌধুরী প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' ও সৈয়দ মুর্তাজা আলী প্রণীত 'হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস' গ্রন্থের পরগণা তালিকার মোটামুটি সামঞ্জস্য থাকায় এই তথ্যটিই গ্রহণ করা হলো।

২০. রাজমালা গ্রন্থে চাকলে রোশনাবাদের অধীন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের যে পরগণা তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে কাশিমনগর পরগণার নাম না থাকায় বুঝা যায় এর পূর্বেই তা সিলেটের সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

২১. মনতলা পরগণা ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত ত্রিপুরা জেলার সার্ভে রিপোর্ট মোতাবেক চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালে এর ভূমির পরিমাণ ছিল ৬৭১১ একর। পরবর্তীতে এটি শঙ্করপাশা রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। সূত্রঃ শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, অক্ষর সংস্করণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১

২২. লস্করপুর রাজস্ব জেলার উসাইনগরকে কোথাও কোথাও উজানী নগর লিখা হয়েছে। সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ।

২৩. কোথাও কোথাও লস্করপুর রাজস্ব জেলার পরগণা তালিকায় তরফেরনাম অনুল্লেখিত আছে।

২৪. Latter from the Collector of Sylhet to the Commissioner of Revenue, 15 May 1843. Sylhet District Records, Letter Sent, Vol. 388; page 290-91

২৫. সরকার যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি থেকে ভূমি রাজস্ব কর না নিয়ে অন্যান্য বিধি কর গ্রহণ করে সেই সব মহালকে সায়রাত মহাল বলা হয়। যেমন : জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, বাঁশমহাল ইত্যাদি।

২৬. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ১৯২

২৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১১৩

২৮. ভূমির সীমানা 'থাক' বা চিহ্নিতকরণের জন্য এ জরিপ পরিচালিত হয়। এ জরিপের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রাম ও পরগণাসমূহের সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়।

২৯. দেলওয়ার হাসান, প্রবন্ধঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী সিলেটের ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায় ১৭৯৩-১৯৫০, *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি। পৃষ্ঠা ২৫১

৩০. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ২৬১

৩১. Giris Chandra Das, *Report on the Re-assessment of Ilam. Pratabgarh Taiyatwari and other Temporarily-Setted Estate in the District of Sylhet,* page 4

৩২. রতনলাল চক্রবর্তী, প্রবন্ধ : ঔপনিবেশিক আমলে সিলেটের ভূমি-ব্যবস্থা, *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড*, সম্পাঃ মো. আব্দুল আজিজ ও অন্যান্য, বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ ১৯৯৭। পৃষ্ঠা ২২৮

৩৩. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ২২ (ফুটনোট ৭)।

৩৪. দেলওয়ার হাসান, প্রবন্ধঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী সিলেটের ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায় ১৭৯৩-১৯৫০, *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি। পৃষ্ঠা ২৫৪

৩৫. প্রজ্ঞাপন নং ৪৫১১ এল.আর. তারিখ ২৮ মার্চ ১৯৫৬।

৩৬. দেলওয়ার হাসান, প্রবন্ধঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী সিলেটের ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায় ১৭৯৩-১৯৫০, *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি। পৃষ্ঠা ২৫৫

৩৭. লেনিন আজাদ, প্রবন্ধঃ সিলেটের কৃষিকাঠামো : চার দশকের পরিবর্তন, *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি। পৃষ্ঠা ২৬০-৬১

৩৮. Physical and Political Geography of the Province of Assam 1896. Page 105

৩৯. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫। কোনো কোনো পরগণার নামে পরিলক্ষিত ভুল বানান সংশোধন করা হয়েছে।

৪০. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ-প্রথম ভাগ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮

৪১. শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, অক্ষর সংস্করণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১

৪২. বিস্তারিত জানার জন্য হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড-সপ্তম অধ্যায় দেখুন।

৪৩. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ২৪৭

৪৪. এক জোড়া বলদের সাহায্যে যে পরিমাণ জমি চাষ করা যেতো তা-ই এক 'হাল' হিসেবে গণ্য। সাধারণত এক হালে প্রায় বারো কেদার বা কেয়ার জমি চাষ করা যায়। এই ১২ কের বর্তমান সাড়ে তিন একরের সমতুল্য।

৪৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৭১

চতুর্থ অধ্যায়

পরগণা পরিচিতি

১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১২টি প্রদেশ বা সুবায় ভাগ করেন। সুবার শাসন পরিচালনা করতেন সুবাদার। রাজস্ব আদায়কারীদের প্রধান ছিলেন দেওয়ান। সম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডরমল রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে 'জমা-এ-তুমারী' নামে এক হিসাবের প্রবর্তন করেন।[১] আইন-ই-আকবরিতে সংশ্লিষ্ট মহালের বিবরণ উল্লেখ আছে। তাতে উল্লেখিত বানিয়াচঙ্গ ও বেজোড়া বাজু (Bajwa Biyaju) এ দু'টি পরগণা হবিগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত। এতে বানিয়াচঙ্গের রাজস্ব ১,৬৭২,০৮০ দাম ও বেজোড়ার রাজস্ব ৮০৪,০৮০ দাম উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ 'জমা কামালে তোমারি' নামে যে রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন তাতে সিলেটকে ১৪৮টি মহালে বিভক্ত দেখানো হয়েছে। উক্ত মহালগুলোই পরবর্তীতে ভিন্ন ভিন্ন পরগণায় আখ্যায়িত হয়েছে। এর মধ্যে বড় বড় পরগণা থেকে খারিজ হয়ে আরো নতুন নতুন পরগণার সৃষ্টি হলে পরগণার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৪টিতে। তন্মধ্যে তরফ থেকে খারিজা পরগণাগুলো হচ্ছেঃ ফয়েজাবাদ, আনন্দপুর, রিয়াজপুর, গদাহাসন নগর, উসাইনগর, রঘুনন্দন, নুরুলহাসন নগর, দাউদনগর, পুটিজুরী ও বামৈ (Bama)।[৩]

মোগল সম্রাটগণ বিভিন্ন পরগণা থেকে যেসব নতুন নতুন পরগণার সৃষ্টি করেছেন ঐসব পরগণা বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা অন্য পরগণা থেকে খারিজকৃত। যিনি ব্যক্তিগত ভাবে সম্রাট কিংবা আমীর-উমরাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি তাঁর সুবিধামত পরগণার মালিক হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে পরগণার মালিকগণ সংশ্লিষ্ট পরগণার প্রশাসক হিসেবে রাজস্ব আদায়, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার ও সামাজিক বিষয়ে কর্তৃত্ব করার অধিকার পেতেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে এ বিধানই কার্যকর ছিল।

জন উইলিস কর্তৃক ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে যে জরিপ সমাপ্ত হয় তার ভিত্তিতে দশসনা বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। দশসনা বন্দোবস্তই পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে অনুমোদন পায়। এ জরিপ কালে সিলেট জেলায় যে ১১টি কেন্দ্র স্থাপিত হয় তা-ই 'জিলা' নামে খ্যাত হয়। তখনও সিলেটে নবাবি আমলের ১৬৪টি পরগণা কার্যকর ছিল।[৪] সিলেটের সংশ্লিষ্ট ১১টি রাজস্ব জিলার মধ্যে নবীগঞ্জ, লস্করপুর ও শঙ্করপাশা এই তিনটি রাজস্ব জিলা হবিগঞ্জ অঞ্চলভুক্ত ছিল।

রাজস্ব জিলা পরবর্তীতে মহকুমা কালেক্টরিভুক্ত হয় এবং থানা স্থাপনের মাধ্যমে পরগণা থেকে পর্যায়ক্রমে প্রশাসনিক ও পুলিশি কার্যক্রম প্রত্যাহার করা হয়। নতুন নতুন থানা সৃষ্টি হলেও পরগণা সদরে এসব থানা প্রতিষ্ঠার বালাই ছিল না। ফলে ক্রমান্বয়ে পরগণা ও রাজস্ব জিলা গুরুত্ব হারাতে থাকে। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে পরগণা সদরকে অতিক্রম করে থানার গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

যেসব সুযোগ-সুবিধা পরগণায় পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল সে সবের জন্য থানা বা মহকুমা সদরে ধর্ণা দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এমনি ভাবে ক্রমান্বয়ে পরগণা সদর এমনকি পরগণার নাম পর্যন্ত এক সময় কালের আবর্তে হারিয়ে যায়। উল্লেখ্য, হবিগঞ্জে কেবলমাত্র বানিয়াচঙ্গ ও লাখাই ছাড়া আর কোনো পরগণা সদর বা নামে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

হালাবাদি জরিপে (১৮২০-১৮২৯) পরগণাসমূহের অধীন গ্রাম বা মৌজার সংখ্যা, ভূমির পরিমাণ, রাজস্ব ও তালুকের হিসাব চিহ্নিত হয়েছে। সে অনুযায়ী হবিগঞ্জে মোট ৩৪টি পরগণা ছিল। তন্মধ্যে :

নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলায় : দিনারপুর, মান্দারকান্দি, চৌকি, মুড়াকড়ি, বানিয়াচঙ্গ কসবা, জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-২, আগনা, বিথঙ্গল, জোয়ানশাহী, কুর্শা, বাজু সতরসতী, কিসমত সতরসতী, বাজু সুনাইতা, জনতরী ও জলসুখা এই ১৫টি।[৫]

শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলা : বেজোড়া, উচাইল, লাখাই, রিচি, মুগীশপুর, গিয়াসনগর, কাশিমনগর ও মনতলা এই ৮টি।[৬]

লস্করপুর রাজস্ব জিলা : ফয়েজাবাদ, নুরুলহাসন নগর, গদাহাসন নগর, উসাইনগর[৭], দাউদ নগর, রিয়াজপুর, রঘুনন্দন, আনন্দপুর, পুটিজুরি, তরফ[৮] ও বামৈ এই ১১টি পরগণা রয়েছে।[৯]

প্রাচীন সেই পরগণা প্রথার সাথে বাংলার প্রশাসনিক ঐতিহ্য জড়িত থাকায় অতীতকে মনে করতে মানুষ এখনও পরগণার তথ্য জানতে চায়। এ ব্যাপারে প্রতিটি পরগণার সীমানা ও অবস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তথ্যের অপ্রতুলতার দরুন থমকে দাঁড়াতে হয়। পরগণা প্রশাসনের ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়ে থানা প্রশাসন ও পরবর্তীতে মহকুমা প্রশাসন এবং সর্বশেষে ইউনিয়ন প্রশাসন গড়ে তোলা হলে পরগণার বিষয়টি কেবল স্মৃতিপট থেকেই লোপ পায়নি ইতিহাসের পাতায়ও এর অবয়ব-আকৃতি গুরুত্ব হারায়।

কোন পরগণা কখন কি ভাবে গড়ে উঠেছিল; কোন পরগণার বিস্তৃতি কত ছিল; কোন পরগণা বা পরগণাসমূহ নিয়ে কোন থানা বা ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল এসমস্ত কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। তাই গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে প্রবন্ধটিকে পরিণতির দিকে নিতে হলো। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হবিগঞ্জের পরগণাসমূহের উপজেলাভিত্তিক নিম্নোক্ত বিবরণী উপস্থাপন করা হল।[১০]

নবীগঞ্জ উপজেলা

নবীগঞ্জ নামকরণ সম্পর্কে অনেকের অভিমত, সিলেটে মুসলিম বিজয়ের পরে কোনো এক সময়ে নবী করিম (সঃ) এর নামানুসারে নামকরণকৃত একটি বাজার থেকে নবীগঞ্জ একটি এলাকা হিসেবে পরিগণিত হয়। আবার কারো কারো মতে, একদা হযরত শাহ নবী বা নবী বক্স নামে এক কামিল ব্যক্তি এ অঞ্চলে আস্তানা করে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ আস্তানাকে কেন্দ্র করে সেখানে জনবসতির সম্প্রসারণ ঘটে। উক্ত জনবসতিতে হযরত নবী'র নামানুসারে যে বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় তা-ই নবীগঞ্জ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১১]

নবাবি আমলে এখানে একটি বিচারালয় ছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে অবগত হওয়া যায়। পরবর্তী কালে (সম্ভবত ১৭৯০ খ্রি.) নবীগঞ্জ একটি রাজস্ব জিলা সদর হিসেবে গণ্য হয়। উক্ত রাজস্ব জিলার অধীন ১৫টি পরগণার মধ্যে দিনারপুর, মান্দারকান্দি, চৌকি, আগনা, কুর্শা, বাজু সতরসতী, কিসমত বাজু সতরসতী, জনতরী ও বাজু সুনাইতা এই ৯টি পরগণা এলাকা নিয়ে পরে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে উত্তরে দিরাই ও জগন্নাথপুর উপজেলা; দক্ষিণে হবিগঞ্জ সদর ও বাহুবল উপজেলা; পূর্বে শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার সদর ও বালাগঞ্জ উপজেলা; পশ্চিমে বানিয়াচঙ্গ উপজেলায় সীমাবদ্ধ নবীগঞ্জ উপজেলা এলাকায় ১. বড়ভাকৈর পশ্চিম ২. বড়ভাকৈর পূর্ব ৩. ইনাতগঞ্জ ৪. দীঘলবাক ৫. আউশকান্দি ৬. কুর্শী ৭. করগাঁও ৮. নবীগঞ্জ ৯. বাউষা ১০. দেবপাড়া ১১. গজনাইপুর ১২. কালিয়ারভাঙ্গা ১৩. পানিউমদাহ্ ইউনিয়ন রয়েছে। একটি পৌরসভাসহ এই ১৩টি ইউনিয়ন এলাকায় অতীতে যেসব পরগণা ছিল তার পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। **দিনারপুর** : আরবি মুদ্রার নাম 'দিনার' আর 'পুর' মানে শহর। কেউ কেউ মনে করেন এই দিনার সম্বন্ধীয় কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে 'দিনারপুর' নামের উদ্ভব। 'দিনারপুর'কে 'জিনারপুর'ও বলা হয়। কেউ মনে করেন দিনারপুর থেকে জিনারপুর আবার কেউ মনে করেন জিনারপুর থেকে দিনারপুর শব্দের রূপান্তর ঘটেছে। তাদের অভিমত, এককালে এখানে পৈতাধারি ব্রাহ্মণদের বসবাস ছিল। ফারসি ভায়ায় 'জিনার' শব্দের অর্থ 'পৈতা'। সেমতে ব্রাহ্মণদের আবাসস্থল হিসেবে 'জিনার' থেকে 'জিনারপুর' নামের উদ্ভব।[১২]

কিন্তু অর্থ বিচারে কি সব সময় সব সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়? যেমন আরবি 'জিনা' শব্দের অর্থ[১৩] নারী-পুরুষের অবৈধ মিলন অর্থাৎ ব্যভিচার। তাহলেতো মনে করা যেতে পারে সুদূর অতীতে বা অত্রাঞ্চলে প্রাক-ইসলাম যুগে যে নগর বা পুর-এ মাত্রাতিরিক্ত জিনা বা ব্যভিচার হতো তার নাম 'জিনারপুর' হয়েছে। আবার 'জিনা' শব্দের আর এক অর্থ জয় লাভ করা। সে অর্থে বিজিত অঞ্চল বা পুর থেকেও 'জিনারপুর' হতে পারে। দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী দাবি করেন, হযরত শাহ তাজউদ্দীন কুরায়শী র. ৭০৮ হিজরীতে দিনারপুর অঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে আগমন করেন। লাউড় রাজ্যের বিজিত এই এলাকাটি তাঁর আগমনের সময়ে 'দিনারপুর' এই মুসলিম নামে প্রথম অভিহিত হয়।[১৪]

এর কোনটি সঠিক তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। তবে জনাব হোসেন চৌধুরীর এ অভিমতের ভিত্তিতে বলা যেতেই পারে যে, বিজিত অর্থে ব্যবহৃত 'জিনা' শব্দ থেকে 'জিনারপুর' শব্দের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এখনও বলার সময় এই 'জিনারপুর' শব্দটিই সবাই প্রয়োগ করে থাকেন। তাই একথাও বলা অত্যুক্তি হবে না যে, পরবর্তীতে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রে লিখতে গিয়ে 'জিনারপুর' এর পরিবর্তে 'দিনারপুর' শব্দের প্রয়োগ করায় সেই থেকে বিভিন্ন দলিলপত্রে এ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়।

দিনারপুরকে একটি প্রাচীন প্রশাসনিক অঞ্চল বলে মনে করা হয়। অনেকে মনে করেন, হযরত শাহজালাল র.-এর অন্যতম সাথী হযরত শাহ তাজউদ্দিন কোরেশী সিলেট বিজয়ের পর

দিনারপুরের প্রশাসক নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং সে সময়েই 'জিনারপুর' নামকরণ হয়। পূর্বে দিনারপুরের আয়তন অনেক বেশি ছিল। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত দৌলম্বাপুরের যুদ্ধের পর এ থেকে খারিজ করে আথানগিরি ও চৌকি পরগণার সৃষ্টি করা হয়।

দিনারপুরের সদরঘাট নামক স্থানে অতীতে একটি নদী বন্দর ছিল বলে জানা যায়। জনশ্রুতি আছে, সদরঘাটে কোনো এককালে কামরূপের রাজা ভগদত্তের একটি উপ-রাজধানী ছিল। দিনারপুর পাহাড়কেন্দ্রিক এ পরগণার আয়তন ছিল ৭৫ বর্গমাইল।[১৫] প্রাচীন রেকর্ডপত্র বিশ্লেষণে জানা যায়, মৌলভীবাজার সদর ও শ্রীমঙ্গল উপজেলার কিয়দংশ দিনারপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল।[১৬]

নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন দিনারপুর পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী মৌজা বা গ্রাম[১৭] সংখ্যা ছিল ৭৩টি; আবাদি জমি ৪,৭২৫ হাল; মোট ভূমি ২৭,৩৬২ একর; তালুক সংখ্যা ৬৮৩টি এবং রাজস্ব ছিল ৩,৯৯৪ টাকা।

বর্তমানে নবীগঞ্জে দিনারপুর নামে কোনো ইউনিয়ন, মৌজা বা গ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তবে একটি বৃহৎ অঞ্চল হিসেবে এখনও দিনারপুর শব্দের ব্যবহার আছে।

২। মান্দারকান্দি : উপজেলার কালিয়ারভাঙ্গা এলাকায় মান্দারকান্দি পরগণার অবস্থিতি ছিল বলে জানা যায়। নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন এ পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ২৩টি; আবাদি জমি ১,২২৭ হাল; মোট ভূমি ৮,০৫৮একর; তালুক সংখ্যা ১,৩১৩টি এবং রাজস্ব ছিল ১,৫১৯ টাকা। বর্তমানে কালিয়ারভাঙ্গা ইউনিয়নে মান্দারকান্দি নামে একটি মৌজা ও গ্রাম রয়েছে।

৩। চৌকি : মোগল আমলে এ পরগণা এলাকাটি দিনারপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল। দিনারপুর পরগণা তখন বর্তমান মৌলভীবাজার সদর ও শ্রীমঙ্গল উপজেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের পতনের সর্বশেষ যুদ্ধ হয় মৌলভীবাজারের দৌলম্বাপুরে। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ মোগল বাহিনীর সাথে খাজা ওসমানের ঘোরতর সংঘর্ষে ওসমানের নেতৃত্বাধীন আফগান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।[১৮] উক্ত দৌলম্বাপুরের যুদ্ধের পর দিনারপুর থেকে খারিজ করে আথানগিরি ও চৌকি পরগণার সৃষ্টি করা হয়।[১৯] সাবডিভিশন গঠনকালে আথানগিরি মৌলভীবাজারের অন্তর্গত হয়।

জীবনের শেষ দিকে হযরত শাহ্ তাজউদ্দীন কুরায়শী র. তাঁর শাসিত অঞ্চলের যে স্থানে অবস্থান করেন সে স্থানের নাম ছিল চৌকি। ইন্তেকালের পর তিনি সেখানকার ধুলচাতল গ্রামে সমাহিত হন।

হালাবাদি জরিপের সময় এ পরগণার গ্রাম সংখ্যা ছিল ২৭টি; আবাদি জমি ১,০৬৩ হাল; মোট ভূমি ৪,৭৪৪ একর; তালুক সংখ্যা ৬১টি এবং রাজস্ব ছিল ১,০৭৬ টাকা। বর্তমানে বাউষা ও বড়বাখৈর পশ্চিম ইউনিয়নে চৌকি নামে মৌজা ও গ্রাম রয়েছে।

৪। আগনা : কথিত আছে, কোনো এক উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারি কোনো রাজকীয় কাজে অত্রাঞ্চলে আসার পর যে কোনো কারণে সহযাত্রীদের থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় মধ্যসমত নামক গ্রামের গোপীনাথ নামক জনৈক ব্যক্তি তাকে আশ্রয়সহ নানাভাবে সাহায্য করেন।

এই উপকারের বিনিময়ে বাংলার সুবাদার মানসিংহের সময়ে গোপীনাথের নামে আগনা পরগণা বন্দোবস্তসহ চৌধুরাই সনদ প্রদত্ত হয়।

নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন আগনা পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৮৩টি; আবাদি জমি ২,৮১৬ হাল; মোট ভূমি ৩১,০৮৮ একর; তালুক সংখ্যা ১৩৭টি এবং রাজস্ব ছিল ১,৩১২ টাকা। বর্তমানে ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নে আগনা নামে একটি মৌজা এবং গ্রাম রয়েছে।

৫। কুর্শা : কুর্শা পরগণাটি নবীগঞ্জের বর্তমান পানি উমদাহ ও গজনাইপুর ইউনিয়ন এলাকায় বিস্তৃত ছিল বলে অনুমিত হয়। পানি উমদাহ ইউনিয়নে কুর্শা নামে একটি মৌজা ও গ্রাম রয়েছে। গজনাইপুর ইউনিয়নেও কুর্শা নামে একটি মৌজা রয়েছে। আবার কুর্শী নামে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় একটি ইউনিয়ন, মৌজা ও গ্রাম রয়েছে। কুর্শী এবং কুর্শা উভয়ই এই পরগণা সংশ্লিষ্ট কিনা বলা যাচ্ছে না।

নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন কুর্শা পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম ৪৮টি, আবাদি জমি ৩,১৫৭ হাল, মোট ভূমি ১৫,৭৮৯ একর, তালুক ১৯৫টি এবং রাজস্ব ছিল ১,৯৫০ টাকা।

৬। বাজু সতরসতী : কুশিয়ারা নদীতে বাহাদুর পুরের নিকটস্থ দীর্ঘ খেয়ার জন্য স্থানীয় লোকেরা ১৭ শত কৌড়ি মুদ্রা দিয়ে দওখাঁর নিকট থেকে যে পরগণা কিনে ছিল সেটাই সতরসতী পরগণা হিসেবে খ্যাত হয়। অতীতে এটি একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। পরবর্তীতে সতরসতী পরগণার কেন্দ্রস্থল নিয়ে 'হাউলি সতরসতী' এবং এর পার্শ্ববর্তী অংশ নিয়ে 'বাজু সতরসতী' ও 'কিসমত বাজু সতরসতী' নামে ৩টি পরগণায় বিভক্ত হয়। মহকুমা সৃষ্টির সময়ে 'হাউলি সতরসতী' মৌলভীবাজারের সীমাভুক্ত হয়।

নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন বাজু সতরসতী পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৩৩টি; আবাদি জমি ৪৭৪ হাল; মোট ভূমি ২৭৫৮ একর; তালুক সংখ্যা ৫৬টি এবং রাজস্ব ছিল ৩২২ টাকা।

৭। কিসমত বাজু সতরসতী : এ পরগণা সতরসতী পরগণার একটি খণ্ডিত অংশ। নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন কিসমত বাজু সতরসতী পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৩২টি, আবাদি জমি ২৫৪ হাল, মোট ভূমি ১,১৩৮ একর, তালুক ১০টি এবং রাজস্ব ২০৬ টাকা ছিল।

৮। জনতরী : জনশ্রুতি মতে, কান্যকুব্জ হতে কামরূপে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে আগত মঘবন মিশ্র নামক জনৈক ব্যক্তি একদা বর্তমান নবীগঞ্জ এলাকার গুমগুমিয়া গ্রামের সত্যব্রত নামক ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। গ্রামটি নিচু এলাকায় অবস্থিত এবং বর্ষাজনিত কারণে চতুষ্পার্শ্ব জলমগ্ন হয়ে পড়লে দেখতে দ্বীপাঞ্চলের রূপ ধারণ করে। এমতবস্থায় মঘবনের কামরূপ যাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। গত্যন্তর না থাকায় তিনি সেখানে বসেই যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে কামাখ্যা দেবীর অর্চনা করতে লাগলেন। কথিত আছে, এই যন্ত্র সাধনার মাঝেই নাকি কামাখ্যা দেবী তাকে দর্শন দেয়। এ থেকেই নাকি স্থানটি যন্ত্রী নামে খ্যাত হয়। যন্ত্রী থেকে জনতরী শব্দের উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন।[২০]

পরবর্তী কালে এ নামে এখানে একটি পরগণার সৃষ্টি হয়। নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন জনতরী পরগণায় গ্রাম সংখ্যা ছিল ৩৬টি; আবাদি জমি ১,৭৪৩ হাল; মোট ভূমি ৮,৭০৯ একর; তালুক সংখ্যা ৮৫টি এবং রাজস্ব ছিল ৮৪৩ টাকা। বর্তমানে করগাঁও ইউনিয়নে জনতরী নামে একটি গ্রাম রয়েছে।

৯। বাজু সুনাইতা : অর্থগত দিক থেকে হাউলি সুনাইতা, সিকসুনাইতা ও বাজুসুনাইতা পাশাপাশি থাকার কথা। অচ্যুতচরণ চৌধুরীর শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে সুনামগঞ্জ মহকুমার তালিকায় ২৭নং ক্রমিকে সিকসুনাইতা ও ৩১নং ক্রমিকে হাউলি সুনাইতা দেখানো হয়েছে। বাজুসুনাইতা দেখানো হয়েছে হবিগঞ্জ মহকুমা তালিকার ২২নং ক্রমিকে। তৎকৃত শ্রীহট্টের মানচিত্রে নবীগঞ্জ এলাকায় তার স্থান নির্দেশিত হয়েছে। এক সূত্রে জানা যায়, কসবা গ্রামটি সুনাইতা পরগণার অন্তর্গত ছিল।[২১] অনুমিত হয় যে, দীঘলবাক ইউনিয়ন বাজু সুনাইতার অন্তর্গত ছিল।

নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন বাজু সুনাইতা পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী মোট ভূমি ৯৬৮৩ একর; তালুক সংখ্যা ১৭৭টি এবং রাজস্ব ছিল ৭১৭ টাকা ছিল।

বানিয়াচঙ্গ উপজেলা

মোগল আমলে বানিয়াচঙ্গের জমিদার ছিলেন আনোয়ার খান। সম্রাট আকবরের সময়ে বানিয়াচঙ্গ মোগল রাজস্ব হিসাবে একটি মহাল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে মহালগুলো পরগণা হিসেবে খ্যাত হয়। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম একজন সাহসী সেনা নায়ক ছিলেন জমিদার আনোয়ার খান। তখন মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে বানিয়াচঙ্গসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে তিনি বীরদর্পে অনেক যুদ্ধ করেন।

প্রাচীন কালে বানিয়াচঙ্গ যে একটি রাজ্য হিসেবে খ্যাত ছিল, এর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্থান নামই এর প্রমাণ। এক সময়ে সিলেটের উত্তর সীমা হতে দক্ষিণে ভেড়ামোহনা নদী পর্যন্ত স্থানব্যাপী এ রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। পরবর্তীতে এ থেকে বহু পরগণা খারিজ হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।[২২] এতে অনুমিত হয় যে, বর্তমান সিলেট বিভাগের সমগ্র পশ্চিম ভাগ ছিল বানিয়াচঙ্গের অন্তর্গত।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ সাবডিভিশনাল অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত এক পত্রের উত্তরে বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান আজমান রজা তাদের অধীন ২৮টি পরগণার বিবরণ প্রদান করেছিলেন। সে মতে বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে (১৭২২ খ্রি.) প্রস্তুতকৃত রাজস্ব হিসাব মতে বানিয়াচঙ্গের অধিপতির অধীন লাউড় ছাড়াও নিম্নোক্ত ২৮টি পরগণা ছিল। উক্ত পরগণাগুলো হল: বংশীকুণ্ডা, রণদিঘা, সেলবরষ, সুখাইড়, বেতাল, পলাশ, লক্ষণছিরি, চামতলা, পাগলা, দুহালিয়া, বাজুজাতুয়া, সিংহচাপড়, সফাহার, সিকসুনইতা, আতুয়াজান, আটগাও, কুবাজপুর, জোয়ার বানিয়াচঙ্গ, কসবা বানিয়াচঙ্গ, জলসুখা, বিথঙ্গল, জোয়ানশাহী, মুড়াকইড়, কুর্শা, জনতরী, হাউলি সুনাইতা, সতরসতী ও পাইকুড়া।[২৩]

উক্ত ২৮ পরগণার মধ্যে মাত্র জোয়ার বানিয়াচঙ্গের অর্ধেক[২৪], কসবা বানিয়াচঙ্গ, জলসুখা, বিথঙ্গল, জোয়ানশাহী, মুড়াকইড়, কুর্শা, জনতরী, বাজুসুনাইতা[২৫] সতরসতীর অধিকাংশ[২৬] হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন এবং বাদবাকি সকল পরগণাই সুনামগঞ্জের অধীন ছিল। অর্থাৎ সমগ্র সুনামগঞ্জসহ হবিগঞ্জের মুড়াকড়ি তথা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার সীমা পর্যন্ত বৃহত্তর সিলেটের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল যে অতীতে বানিয়াচঙ্গের অধীন ছিল তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

থানা প্রতিষ্ঠার সময়ে আবার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত বানিয়াচঙ্গের পরগণাসমূহ বিভিন্ন থানার অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন জলসুখা ও জোয়ানশাহী পরগণা আজমিরীগঞ্জ; কুরশা, জনতরী, বাজু সতরসতী ও কিসমত বাজু সতরসতী নবীগঞ্জ এবং মুড়াকড়ি লাখাই থানার অন্তর্গত হয়। শেষ পর্যন্ত বানিয়াচঙ্গ কসবা, জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-২, ও বিথঙ্গল এই ৩টি পরগণা মাত্র বানিয়াচঙ্গ থানার অধীন থাকে।

বর্তমানে উত্তরে আজমিরীগঞ্জসহ সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই ও শাল্লা উপজেলা; দক্ষিণে সদর ও লাখাই উপজেলা; পূর্বে সদর, বাহুবল ও নবীগঞ্জ উপজেলা; পশ্চিমে আজমিরীগঞ্জসহ কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় সীমাবদ্ধ বানিয়াচঙ্গ উপজেলা এলাকায় ১. বানিয়াচঙ্গ উত্তর-পূর্ব ২. বানিয়াচঙ্গ উত্তর-পশ্চিম ৩. বানিয়াচঙ্গ দক্ষিণ-পূর্ব ৪. বানিয়াচঙ্গ দক্ষিণ-পশ্চিম ৫. দৌলতপুর ৬. কাগাপাশা ৭. বড়ইউড়ি ৮. খাগাউড়া ৯. পুকুড়া ১০. সুবিদপুর ১১. মক্রমপুর ১২. সুজাতপুর ১৩. মন্দরী ১৪. মুরাদপুর ১৫. পৈলারকান্দি ইউনিয়ন রয়েছে। এই ১৫টি ইউনিয়ন এলাকায় অতীতে যেসব পরগণা ছিল তার পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। বানিয়াচঙ্গ কসবা : বানিয়াচঙ্গ রাজ্যের রাজধানী শহরই পরবর্তীতে 'বানিয়াচঙ্গ কসবা' নামে পরগণা পরিচিতি লাভ করে। নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন বানিয়াচঙ্গ কসবা পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৩২২টি; আবাদি জমি ৩২,০২৪ হাল; মোট ভূমি ১,০৬,৮৭৬ একর; তালুক সংখ্যা ৩৫৮৫টি এবং রাজস্ব ছিল ১০,৮৬৫ টাকা।

২। জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-২ : নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-২ পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ১৫৯টি; আবাদি জমি ১,৩৯৩ হাল; মোট ভূমি ৬৩,৫৮৬ একর; তালুক সংখ্যা ৩৩৮টি এবং রাজস্ব ছিল ৭,০৭৮ টাকা।

৩। বিথঙ্গল : এখানে জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ আখড়া রয়েছে। প্রতি বছর বর্ষাকালে এখানে দেশ-বিদেশের বহু তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের সমাগম হয়। নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন বিথঙ্গল পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ১৯টি; আবাদি জমি ১,৬৯৪ হাল; মোট ভূমি ৭,৮৪৫ একর; তালুক সংখ্যা ১৭টি এবং রাজস্ব ছিল ২,২০১ টাকা।

আজমিরীগঞ্জ উপজেলা

আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জের সম্পূর্ণ ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত হলেও এর প্রাচীন ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বিভিন্ন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বাংলায় মুসলিম বিজয়ের প্রাথমিক পর্বে (আনুমানিক ১২৫৫-৫৭

খ্রিঃ) সুলতান মুগীশ উদ্দিন ইয়াজবেগ কামরূপ অভিযানকালে শ্রীহট্ট অঞ্চলের কোনো কোনো ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে অনেক সম্পদ লাভ করেছিলেন। উক্ত রাজ্যের মধ্যে আজমর্দন নামটি অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। মিঃ স্টুয়ার্ট লিখিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে উক্ত আজমর্দনকে 'শ্রীহট্টের আজমিরিগঞ্জ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অচ্যুতচরণ চৌধুরীও লিখেছেন:

ইয়াজউদ্দীন এই উদ্যমে শ্রীহট্টের আজমরদন নামক স্থানের অধিপতিকে পরাজিত করেন এবং তিনি তথায় কিছুদিন বাস করিয়া সেই নগরী বিলুণ্ঠনে বহুতর মূল্যবান সম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। যখন সেই দেশের অধিবাসী মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, তখন তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদিগকে লইয়া লক্ষণাবতী গমন করিয়াছিলেন। স্টুয়ার্ট সাহেব শ্রীহট্টাধীন এই আজ্‌মরদন নগরীকে তত্রত্য 'আজমরগঞ্জ' (বর্ত্তমান আজমীরগঞ্জ) বলিয়া অনুমান করেন। বস্তুতঃ আজমরদন নাম রূপান্তরিতাবস্থায় আজমীরগঞ্জ নামের সহিত যত সাদৃশ্যাত্মক, শ্রীহট্ট জিলার কোন নামের সহিত সেইরূপ সাদৃশ্য নাই।[২৭]

এই আজমর্দনকে কেউ 'উর্মর্দন' কেউবা 'উর্জমর্দন' 'অজমর্দন' 'অর্মর্দন' 'উমরদন' 'আরমুদন' ইত্যাদি নানা ভাবে লিখেছেন। বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে মনে করা যায় বর্তমান আজমিরীগঞ্জ এবং প্রাচীন আজমর্দন অভিন্ন ছিল।

ব্রিটিশ আমলে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কালনি-বিবিয়ানা ও কুশিয়ারা-বরাক নদী পথে শিলচর পর্যন্ত একটি নৌপথ ছিল। তখন এ পথে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশাল বিশাল নৌযান চলাচল করতো। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ বন্দর থেকে 'ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি'র স্টিমারসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সব নৌযান চলাচল করতো তার একটি বড় বন্দর ছিল আজমিরীগঞ্জ। এ বন্দরের কারণে তৎকালে হবিগঞ্জের বৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে আজমিরীগঞ্জ খ্যাতি লাভ করে।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের এক তথ্য অনুযায়ী তখন হবিগঞ্জ মহকুমার ৪টি থানার মধ্যে আবিদাবাদ বানিয়াচঙ্গ থানার অধীন একটি আউট পোস্ট ছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আসাম সরকারের এক নোটিফিকেশনে আজমিরীগঞ্জ পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে উত্তরে বানিয়াচঙ্গ ও সুনামগঞ্জের সাল্লা উপজেলা; দক্ষিণে বানিয়াচঙ্গ ও কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলা; পূর্বে বানিয়াচঙ্গ উপজেলা; পশ্চিমে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় সীমাবদ্ধ আজমিরীগঞ্জ উপজেলা এলাকায় ১. আজমিরীগঞ্জ ২. বাদলপুর ৩. জলসুখা ৪. কাকাইলছেউ ৫. শিবপাশা ইউনিয়ন রয়েছে। একটি পৌরসভাসহ এই ৫টি ইউনিয়ন এলাকায় অতীতে যেসব পরগণা ছিল তার পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। জলসুখা : ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব তীরবর্তী একটি এলাকায় ঝাল জাতীয় জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। তারা মৎস্য আহরণ শেষে চতুষ্পার্শ্বে জলমগ্ন একটি স্থল ভূমিতে তাদের জাল শুকাতো। এ থেকে সে স্থানের নাম হয় জালশুকা। ক্রমান্বয়ে সেখানে জনবসতির সৃষ্টি হয় এবং জালশুকা থেকে জলসুখা নামে রূপান্তরিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, এই এলাকাটি অতীতে বৃহৎ জলকর ছিল। উক্ত জলকর শিক্কা মুদ্রায় বন্দোবস্ত হয়েছিল বিধায় 'জল' ও 'শিক্কা' শব্দের সমাহারে 'জলশিক্কা' নামে পরিচিতি লাভ করে। জলশিক্কা ক্রমে 'জলসুখা' শব্দে রূপান্তরিত হয়। কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, ঝাল জাতীয় লোকেরা জলেই তাদের সুখ মনে করতো বিধায় স্থানটি জলসুখা নামে খ্যাত হয়।[২৮]

এসব মতের কোনটি সঠিক তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেক অভিমতের সাথে যেহেতু জল-এর সম্পর্ক রয়েছে সেহেতু জল জাতীয় কোনো বিষয়ই এ নামকরণের মূলে ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পরবর্তীতে সেখানে বৃহৎ জনপদের সৃষ্টি ও সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে সেখানে একটি পরগণার সৃষ্টি হয়।

নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন জলসুখা পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৭৫টি; আবাদি জমি ২,৫৮৫ হাল; মোট ভূমি ১২,১৩২ একর; তালুক সংখ্যা ৬৮টি এবং রাজস্ব ছিল ২,৮৩১ টাকা। বর্তমানে আজমিরীগঞ্জে জলসুখা নামে একটি ইউনিয়ন, একটি মৌজা ও গ্রাম রয়েছে।

২। জোয়ান শাহী : নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন জোয়ান শাহী পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৪০টি; আবাদি জমি ১,০৭৯ হাল; মোট ভূমি ৫,০৪২ একর; তালুক সংখ্যা ১২টি এবং রাজস্ব ছিল ১,১৬৪ টাকা।

লাখাই উপজেলা

নবাবি আমলে লাখাই একটি পরগণা ছিল। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের এক তথ্য অনুযায়ী তখন হবিগঞ্জ মহকুমার ৪টি থানার মধ্যে লাখাই মাধবপুর থানার অধীন একটি আউট পোস্ট ছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আসাম সরকারের এক নোটিফিকেশনে লাখাই পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে নামে সেখানে ইউনিয়ন কার্যালয়ও স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ কালে থানাকে উপজেলায় উন্নীত করার সময় উপজেলা কার্যালয় বামৈ ইউনিয়নের কালাউক নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয়।

লাখাই নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কল্পিত ক'টি বর্ণনা রয়েছে। অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে, খাসিয়া ভাষায় 'লা' শব্দের অর্থ হলো সীমা এবং খাসিয়া অর্থে 'খা' বর্ণ প্রয়োগে 'লাখাই' শব্দের উৎপত্তি। সে মতে খাসিয়া বা জয়ন্তিয়া রাজ্যের শেষ সীমা বুঝাতে লাখাই নামের প্রয়োগ হয়।[২৯] সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মতে, 'খাসিয়া ভাষায় লা অর্থ পশ্চিম ও খাই অর্থ সীমা। লাখাই গ্রাম খাসিয়াদের অধিকারের পশ্চিম সীমা নির্দেশ করে।'[৩০] তবে উভয় বর্ণনা মতেই লাখাই এক কালে খাসিয়া রাজত্বের শেষ সীমা নির্দেশ করে।

এ দাবি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না এ কারণে যে, ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে খাসিয়ারা তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পাবার জন্য খাসিয়া পর্বত হতে পঙ্গপালের মতো এসে এ অঞ্চলে একটি শক্তিশালী আক্রমণ রচনা করেছিল। উক্ত আক্রমণে লাউড় রাজ্য ধ্বংস হয়। সে আক্রমণে রাজসৈন্যসহ অধিকাংশ সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত নিহত হয়। সামান্য কিছু লোক প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল।[৩১]

কারো কারো মতে, অতীতে এ অঞ্চলে ‘লাখাই’ নামে দীর্ঘ ‘দা’ বা ‘দাও’ জাতীয় এক প্রকার দেশীয় অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। এই ‘দা’ বা ‘দাও’ অর্থে কিংবা এর প্রয়োগ জনিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাখাই নামের উৎপত্তি হতে পারে। অপর এক মতে, ‘লাখ’ পরিমাণ মুদ্রা যে স্থান বা পরগণার আয় তার নাম হয় ‘লাখাই’।[৩২] কিন্তু এ অভিমত যে সঠিক নয় তার প্রমাণ হালাবাদি জরিপ। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত উক্ত জরিপের রিপোর্টে দেখা যায় তখন এর রাজস্ব ছিল ৩ হাজার ৭ শত ১০ টাকা।[৩৩] পরগণা প্রতিষ্ঠা কালে রাজস্বের পরিমাণ আরো কম ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বর্তমানে উত্তরে বানিয়াচঙ্গ উপজেলা; দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলা; পূর্বে সদর, মাধবপুর ও নাসিরনগর উপজেলা; পশ্চিমে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায় সীমাবদ্ধ লাখাই উপজেলা এলাকায় ১. বামৈ ২. বুল্লা ৩. করাব ৪. লাখাই ৫. মুড়াকড়ি ও ৬. মুড়িয়াউক ইউনিয়ন রয়েছে। এ ৬টি ইউনিয়ন এলাকায় অতীতে যেসব পরগণা ছিল তার পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। লাখাই : ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর ‘জমা কামালে তোমার’ নামে রাজস্ব হিসেবে লাখাই নামে পরগণা দৃষ্ট হয়। এ থেকে ধারণা জন্মে যে, মোগলদের শেষ সময়ে পরগণাটির সৃষ্টি হতে পারে।

শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলাধীন লাখাই পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৩৫টি; আবাদি জমি ৫,৭৪৩ হাল; মোট ভূমি ২৭,২২৩ একর; তালুক সংখ্যা ১৬০টি এবং রাজস্ব ছিল ৩,৭১০ টাকা। বর্তমানে সেখানে লাখাই নামে একটি ইউনিয়ন কার্যালয় বিদ্যমান।

২। বামৈ : কিংবদন্তী মতে, নবাব ইসলাম খাঁ মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের দমনার্থে চট্টগ্রাম অভিযান কালে রাঢ়দেশীয় একব্যক্তি সেখানে সরকারি দায়িত্বে ছিলেন। কিছুকাল চট্টগ্রামে অবস্থানের পর তিনি শ্রীহট্টের তোপখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তার বাণীরাও নামক এক উত্তরসূরি বামৈ নামক স্থানে জায়গির প্রাপ্ত হয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন।[৩৪] পরবর্তীতে উক্ত জায়গিরই পরগণা হিসেবে সনদ প্রাপ্ত হয়। এ বংশের অভিরাম ও হরিরাম নামের দু’জন পরবর্তীতে শ্রীহট্টের তোপখানার কর্মচারি নিযুক্ত হয়ে প্রথম মিরাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বামৈ পরগণাটি অজ্ঞাত কারণে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে লস্করপুর রাজস্ব জিলার আওতাভুক্ত করা হয়েছিল বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে অবগত হওয়া যায়।

লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন বামৈ পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ১৩৭টি; মোট ভূমি ৮,৮৫১ একর; তালুক সংখ্যা ৩৩৩টি এবং রাজস্ব ছিল ৩,৭৭৫ টাকা। বর্তমানে এ নামে একটি ইউনিয়ন, মৌজা ও গ্রাম রয়েছে। রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে উপজেলা প্রতিষ্ঠাকালে বামৈ-এর কালাউক নামক স্থানে লাখাই উপজেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়। একই সময়ে থানা কার্যালয়ও লাখাই থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বামৈ এলাকায় স্থাপিত হয়েছে।

৩। মুড়াকড়ি : এ পরগণাটি লাখাই পরগণা থেকে খারিজ করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এটি বিভিন্ন সূত্রে মুড়াকৈড় নামে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভেড়ামোহনা নদীর উভয় তীরে এর বিস্তৃতি ছিল বলে কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়। এটি বাজুকার অংশ হিসেবে দীর্ঘ সময় ময়মনসিংহের সাথে যুক্ত ছিল। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাজুকার চৌধুরী বংশ মুড়াকড়ি পরগণার জমিদার

ছিলেন।[৩৫] এ পরগণাও অজ্ঞাত কারণে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলার সাথে সংযুক্ত ছিল বলে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়।

জগদীশপুরের দত্ত বংশের শ্যামরায় নামের এক ব্যক্তির উদন রায় ও মদন রায় নামে দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ উদন রায় 'মর্কর রায়' নামে খ্যাত ছিলেন। এই দুই ভাই থেকেই মুড়াকড়ি পরগণার উৎপত্তি। এরা হিংস্র জন্তু-জানোয়ার পূর্ণ জঙ্গলাবৃত এ স্থানটি আবাদ করে সেখানে বাড়ি নির্মাণ ও বসবাস শুরু করেন। তাদের দেখাদেখি ক্রমান্বয়ে আরো অনেক লোক সেখানে এসে বসবাস শুরু করলে এক সময় একটি গ্রামের সৃষ্টি হয়। সেই থেকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'মর্কর রায়ের' নামানুসারে গ্রামটি 'মরকর' এবং তা থেকে 'মুড়াকৈড়' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আজও মানুষ গ্রামটিকে মুড়াকৈড় নামে ডাকলেও বর্তানে 'মুড়াকড়ি' হিসেবেই লিখিত হয়।[৩৬]

নবীগঞ্জ রাজস্ব জিলাধীন মুড়াকড়ি পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৮টি; মোট ভূমি ১,৪৭৯ একর; তালুক সংখ্যা ৪টি এবং রাজস্ব ছিল ৪৩৯ টাকা। বর্তমানে এ নামে সেখানে একটি ইউনিয়ন, মৌজা ও গ্রাম রয়েছে।

হবিগঞ্জ উপজেলা

চতুর্দশ শতাব্দীতে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার বর্ণনায় 'হবঙ্গ' নামে যে জনপদের কথা জানা যায় অনেক ঐতিহাসিক তাকেই হবিগঞ্জ মনে করেন।[৩৭] ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাবডিভিশন গঠনের পূর্বে হবিগঞ্জ নামে কোনো প্রশাসনিক ইউনিট ছিল না। সুদূর অতীতে এ অঞ্চলটি তরফ রাজ্যের অংশ ছিল।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরাধিপতি অমর মাণিক্য ও তরফের অধিপতি সৈয়দ মুসার মধ্যে সংঘটিত জিকুয়ার যুদ্ধে তরফের পতন ঘটলে ইতিহাস থেকে কিছু কালের জন্য তরফ নামটি বিলুপ্ত হয়। পরবর্তীতে বারো ভূঁইয়াদের পতনের পর তরফের শাসকেরা তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পেলেও তা কেবল পরগণার মর্যাদায় বর্তমান হবিগঞ্জ শহর এলাকার পূর্বাংশ থেকে চুনারুঘাট ও বাহুবল পর্যন্ত সীমিত থাকে।

এ সময় কালেই রিচি পরগণার সৃষ্টি হয়। তখন খোয়াই নদীর পশ্চিম সীমাবর্তী অংশ রিচি পরগণার অংশ হিসেবে শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলার অন্তর্ভুক্ত হয়। শহরের খোয়াই নদীর পুরনো স্রোতের পূর্বপাশ ও গোপায়া ইউনিয়ন এলাকা থেকে পূর্ব দিকে চুনারুঘাট ও বাহুবল পর্যন্ত তখন লস্করপুর রাজস্ব জিলা ও তারপরে লস্করপুর থানার অধীনে ন্যস্ত থাকে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাবডিভিশন গঠনের পরও সাবডিভিশন সদর ছিল লস্করপুরেই। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুর থেকে থানা সদর হবিগঞ্জে স্থানান্তর কালে থানার সীমায় ব্যাপক পরিবর্তন তথা বর্তমান সীমা নির্ধারিত হয়।

বর্তমানে উত্তরে বানিয়াচঙ্গ ও নবীগঞ্জ উপজেলা; দক্ষিণে চুনারুঘাট ও মাধবপুর উপজেলা; পূর্বে বাহুবল উপজেলা; পশ্চিমে লাখাই উপজেলায় সীমাবদ্ধ হবিগঞ্জ উপজেলা এলাকায় ১. লুকড়া ২. রিচি ৩. তেঘরিয়া ৪. পৈল ৫. গোপায়া ৬. রাজিউড়া ৭. নূরপুর ৮. শায়েস্তাগঞ্জ ৯. নিজামপুর ১০.

লস্করপুর **১১.** ব্রাহ্মণডোড়া ইউনিয়ন রয়েছে। হবিগঞ্জ ও শায়েস্তাগঞ্জ এ ২টি পৌরসভাসহ এই **১১**টি ইউনিয়ন এলাকায় অতীতে যেসব পরগণা ছিল তার পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। রিচি : রিচি পরগণার মালিক ছিলেন জনৈক মুসলমান জমিদার। তখন সেখানে কোনো হিন্দু ভদ্রলোকের বাস ছিল না। সংশ্লিষ্ট জমিদার খুবই বিলাসপ্রবণ অথচ অলস প্রকৃতির ছিলেন। অর্থের প্রয়োজনে তিনি সম্পদ বিক্রিকেই প্রাধান্য দিতেন।

এ সময়ে পঞ্চখণ্ডের জনৈক দত্ত চৌধুরী সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি বুদ্ধিবলে সেখানকার কিছু ভূমির মালিক হন। এরপরে দত্ত চৌধুরীর পুত্র ও পৌত্রগণ ক্রয়সূত্রে রিচির প্রায় ছয়পণ অংশের অধিকারী হয়ে পড়েন। জয়গোবিন্দ চৌধুরী নামে এ পরিবারের এক ব্যক্তি ব্যবসাসূত্রে ঢাকায় বাস করতেন। তিনি একদা জানতে পারেন, রাজস্ব অনাদায়ের কারণে রিচি পরগণা নিলামে উঠবে। এ সুযোগে জয়গোবিন্দ চৌধুরী নিলামে ক্রয় করে সমগ্র রিচি পরগণার মালিক হন।

শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলাধীন রিচি পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল **১১**টি; আবাদি জমি ২,৪২৯ হাল; মোট ভূমি **১১**,৭০৫ একর; তালুক সংখ্যা ২৫টি এবং রাজস্ব ছিল **১**,২০৬ টাকা। বর্তমানে রিচি নামে এখানে একটি ইউনিয়ন, মৌজা ও গ্রাম রয়েছে।

২। উচাইল : উচাইল একটি ঐতিহাসিক গ্রাম। এখানে হযরত শাহজালাল (র.)-এর অন্যতম সফরসঙ্গী হযরত শাহ মজলিশ আমিন (র.)-এর মাজার এবং এর পাশে সুলতান হোসেন শাহ্‌র আমলের একটি ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে।

তরফ বিজয় কালে বারো আউলিয়ার নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী সিলেট থেকে নৌপথে এসেছিলেন। যে সময়ে মুসলিম বাহিনী এ অভিযান পরিচালনা করে, সে সময়ে হবিগঞ্জসহ সমগ্র সিলেট অঞ্চলের পশ্চিমাংশ বছরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকত। সেজন্য মুসলিম বাহিনী দ্রুত আগমনের জন্য নৌপথ ব্যবহার করে। তার প্রমাণ হিসেবে ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, শ্রীহট্ট থেকে যাত্রার পর মুসলিম বাহিনী প্রথমে যে উচ্চ স্থান দর্শন করেন তা 'উচ্চ-আইল' হিসেবে কথিত হয়। উচ্চ আইল কালক্রমে 'উচাইল' হিসেবে খ্যাত হয়। পরবর্তীতে এটি একটি পরগণা এবং বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলাধীন রাজিউড়া ইউনিয়নের একটি বৃহৎ গ্রাম হিসেবে পরিচিত।[৩৮]

তবে এ নামে রাজিউড়া ইউনিয়নে লিখিত ভাবে কোনো গ্রামের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। বহুল পরিচিত এ গ্রামের অভ্যন্তরে শঙ্করপাশা, চারিনাও, শান্তিশা প্রভৃতি নামে যেসব পাড়া-মহল্লা ছিল ঐসব পাড়া মহল্লা পরবর্তীতে স্বতন্ত্র গ্রামের মর্যাদা লাভ করেছে। শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলা সদর এই পরগণা ও গ্রামেরই একটি অংশ মাত্র। বর্তমান রাজিউড়া ও ব্রাহ্মণডোড়া ইউনিয়ন এ পরগণার অন্তর্গত ছিল।

শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলাধীন উচাইল পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী তালুক ছিল ২৯টি; মোট ভূমি ৭,৮৯৬ একর এবং রাজস্ব ছিল ৩,৭৬০ টাকা।

৩। দাউদনগর : সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিনের নবম পুরুষ সৈয়দ শাহ দাউদ। তিনি যে এলাকায় বসতি স্থাপন করেন তাঁর নামানুসারে সে গ্রামটির নামকরণ হয় দাউদ নগর। তরফ থেকে দাউদ নগর নামে একটি পরগণা খারিজ করে তিনি প্রশাসক হিসেবে এর শাসন কর্তৃত্ব ভোগ করেন।

তিনি একজন অতিমানব ছিলেন বলে জানা যায়। যে স্থানে বসে তিনি চিল্লা করতেন সে স্থানটি দাউদ নগরের দরগাহ নামে খ্যাত। সেখানে তাঁর তক্তপোষ সংরক্ষিত আছে। দরগাহ সংলগ্ন পুকুরে অসংখ্য গজার মাছ ভেসে বেড়াতো। বর্তমান শায়েস্তাগঞ্জ পৌর এলাকাধীন দাউদ নগর দরগাহতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ-এর আমলে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ ছিল। মসজিদগাত্রে স্থাপিত শিলালিপি থেকে জানা যায়, ত্রিপুরার সেনাপতি ও মোয়াজ্জামাবাদের মন্ত্রী খোয়াজ খাঁ **৯১৯** হিজরিতে (**১৫১৩** খ্রি.) এই মসজিদ নির্মাণ করেন। হোসেন শাহ খোয়াজ খাঁকে তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমানার শাসনভার দিয়েছিলেন।[৩৯]

লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন দাউদ নগর পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল **১৮**টি; আবাদি জমি ৭,৩৬২ হাল; মোট ভূমি ৮,৬৪০ একর; তালুক সংখ্যা **১৭**টি এবং রাজস্ব ছিল ৫,৭৫০ টাকা।

৪। নুরুলহাসন নগর : কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের দৌহিত্র সৈয়দ মুসার পুত্র ছিলেন সৈয়দ শাহনুরি। তিনি দিল্লীর দরবারে সুপরিচিত ছিলেন। গদাহাসনের সাথে কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের সমাধিপাশে সমাহিত হওয়ার অধিকার প্রাপ্তির পর উভয়ের বিরোধ চলতেই থাকে। এরই জের ধরে শাহনুরি অন্যত্র বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে কারণে এক পর্যায়ে তিনি দিল্লী গমন করেন। সেখান থেকে তরফের পশ্চিম সীমানা এলাকায় নিজ নামে 'নুরুলহাসন নগর' পরগণা খারিজ করে আনেন এবং পৈল এসে বাসস্থান নির্মাণ করেন।[৪০] সৈয়দ শাহনূরী নিজ নামে পরগণা খারিজ করে তাঁর জমিদার বা শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নুরুলহাসন নগর পরগণা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরো একটি মত আছে। সে মতে: তরফের তিতারকোনা গ্রামের (বর্তমানে বাহুবলের মীরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত) অধিবাসী শাহ বাদখাঁর পুত্র মুল্লা মুসা বিদ্যা ও প্রতিভাবলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হন। তাঁর নুরুল হাসন, খলিলুর রহমান ও হবিবুর রহমান নামে তিন পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ নুরুল হাসন পিতা মুল্লা মুসার চেষ্টায় সম্রাটের নিকট থেকে নিজ নামে 'নুরুলহাসন নগর' পরগণা সৃষ্টি করেন। প্রতিষ্ঠাকালে উক্ত পরগণার ভূমির পরিমাণ ছিল ৭৮৩ হাল। তাঁর অপর দুই ভাই খলিলুর রহমানের নামে 'খলিলপুর' এবং হবিবুর রহমানের নামে 'হবিবপুর' নামক দু'টি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৪১] নবীগঞ্জের কালিয়ারভাঙ্গা ইউনিয়নে খলিলপুর ও হবিবপুর নামে দুটি মৌজা রয়েছে।[৪২]

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হবিগঞ্জ শহরের উত্তর দিকস্থ উমেদনগরের পার্শ্ববর্তী রামপুর মৌজা ও ঘুঙ্গিয়াজুড়ি হাওর এলাকটি নুরুলহাসন নগর পরগণার অন্তর্গত ছিল। লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন নূরুলহাসন নগর পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী মোট ভূমি **৩**,**১৩২** একর; তালুক সংখ্যা ৭০টি এবং রাজস্ব ছিল **২**,৭৮৪ টাকা।

৫। রিয়াজপুর : রামশ্রীর জমিদার মোতিউর রহমানের তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তোতিউর রহমান, মধ্যম রিয়াজুর রহমান এবং কনিষ্ঠ ছিলেন নেয়াজুর রহমান। তাঁরা সবাই বালিশিরা, বামৈ ও বেজোড়ায় বিস্তৃত জমিদারি অর্জন করেন। রিয়াজুর রহমান ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বালিশিরার চৌধুরাই প্রাপ্ত হন। তাঁর নামানুসারে রিয়াজ নগর গ্রাম ও রিয়াজপুর পরগণার নামকরণ হয়। পরবর্তীতে রিয়াজুর রহমানের নামে বালিশিরার ৩নং এবং গদাহাসন নগরের ৩০ ও ৩১নং তালুকের নামকরণ হয়।[৪৩]

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকায়ই রিয়াজপুর পরগণার অবস্থান হওয়ার কথা। বালিশিরা মৌলভীবাজার জেলায়, গদাহাসন নগর চুনারুঘাট, বেজোড়া মাধবপুর এবং বামৈ লাখাই উপজেলায় অবস্থিত। কিন্তু সেসব স্থানে রিয়াজপুর নামে কোনো স্থান নাম না থাকায় পরগণার অবস্থান বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হচ্ছে না।

তবে অচ্যুৎচরণ চৌধুরীর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, রিয়াজুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দুর রহমান পিতার নামীয় পরগণায় নিজ নামে সৈয়দপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৪] বর্তমানে নিজামপুর ইউনিয়নে সৈয়দপুর নামে মৌজা ও গ্রাম রয়েছে। এতে অনুমান করা যায় সম্ভবত এ এলাকায়ই রিয়াজপুর পরগণার অবস্থান ছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট উপজেলায় রিয়াজপুর নামে কোনো মৌজা বা গ্রাম দৃষ্ট হয় না।

লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন রিয়াজপুর পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী মোট ভূমি ১১৬ একর; তালুক সংখ্যা ২টি এবং রাজস্ব ছিল ৪৩ টাকা।

৬। গদাহাসন নগর[৪৫] : নরপতি নিবাসী কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন শাহ খোন্দকার। তদীয় পুত্র মোহাম্মদের গদাহাসন ও গিয়াস নামে দুই পুত্র ছিলেন। গদাহাসন একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি মোগল দরবারের সনদ মোতাবেক তরফ থেকে যে পরগণা খারিজ করে আনেন তার নামকরণ হয় 'গদাহাসন নগর'।

তরফের সৈয়দ মিনা আরাকানের অধিপতি কর্তৃক একটি তরবারি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কথিত আছে, তরবারিটি সৌভাগ্যের স্মারক হিসেবে পরিচিত ছিল। উক্ত তরবারি বংশানুক্রমে গদাহাসনের হস্তগত হয়। তিনি কোনো কারণবশত ত্রিপুরার সমশের গাজীকে একটি ঘোড়াসহ এ তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। সমশের গাজী এর মাধ্যমে পরগণা রোসনাবাদের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৪৬]

গদাহাসনের পিতৃব্য মুসার পুত্র শাহনুরও একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। গদাহাসন এবং শাহনুরি উভয়েই কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের সমাধিপাশে সমাহিত হওয়ার আশা ব্যক্ত করেন। একদা এ নিয়ে গদাহাসন ও শাহনুরির মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এ বিবাদ কোনোক্রমেই স্থানীয় ভাবে নিষ্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় উভয়ে দিল্লীর দরবারে বিচার প্রার্থী হন। দিল্লীতে বিভিন্ন ভাবে গদাহাসন তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হন। কিন্তু সম্রাট সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে যে সিদ্ধান্ত দেন তাতে শাহনুরি কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের সমাধিপাশে সমাহিত হওয়ার অধিকার পান। এ

সময়েই দিল্লী দরবারে গদাহাসন ও তাঁর ভাই গিয়াসের নামে তরফ থেকে খারিজ করে 'গদাহাসন নগর' ও 'গিয়াসনগর' নামে দু'টি পৃথক পরগণার সৃষ্টি হয়।[৪৭]

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমান শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার উল্লেখযোগ্য অংশ, শায়েস্তাগঞ্জ ও নূরপুর ইউনিয়ন এলাকা ছিল গদাহাসন নগর পরগণার অন্তর্গত। লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন গদাহাসন নগর পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ১৪৪টি, মোট ভূমি ৮,০৬৯ একর, তালুক সংখ্যা ৫৪৩টি এবং রাজস্ব ছিল ৬,৬৯৯ টাকা।

৭। আনন্দপুর : এ পরগণা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বর্তমানে গোপায়া ইউনিয়নে আনন্দপুর নামে একটি মৌজা ও গ্রাম রয়েছে বিধায় ধারণা করা যেতে পারে, উক্ত পরগণাটি এখানেই ছিল। বর্তমানে আংশিকভাবে হবিগঞ্জ পৌর এলাকার শায়েস্তানগর, মোহনপুর তথা কোর্টস্টেশন রোডের দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত এলাকা এর অন্তর্গত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন আনন্দপুর পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী ৫টি গ্রাম এবং ২টি তালুক ছিল।

মাধবপুর উপজেলা

মাধবপুর হবিগঞ্জ জেলার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এবং সিলেটের সিংহদ্বার হিসেবে পরিচিত। মাধবপুর নামে ব্রিটিশপূর্ব কালে কোনো প্রশাসনিক ইউনিটের তথ্য জানা যায় না। এর নামকরণ বিষয়ে জনশ্রুতি আছে, প্রাচীন কালে সোনাই নদীর তীরবর্তী বর্তমান মাধবপুর বাজার সংলগ্ন এলাকার কোনো একটি স্থানে মহাদেব নামে একজন সাধু পুরুষের আস্তানা ছিল। সে আস্তানাকে কেন্দ্র করে এক সময়ে সেখানে ক্রমান্বয়ে একটি জনবসতির সূচনা হয়। 'মহাদেব' 'মাধব' হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এই মাধবের অবস্থান কেন্দ্রিক সে স্থানটিই এক সময়ে মাধবপুর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলায় সৃষ্ট ১৭টি থানার মধ্যে 'বাজে বেজোড়া' নামে একটি থানার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বাজে বেজোড়া থানাটি বেজোড়া পরগণার অন্তর্গত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে পরগণার নাম বেজোড়া বাজু উল্লেখ আছে। এখানে উল্লেখিত 'বাজে' সম্ভবত 'বাজু'-এর অশুদ্ধ প্রয়োগ। উক্ত পরগণা সীমানা উত্তরে বাঘাসুরা ইউনিয়নের কালিকাপুর থেকে দক্ষিণে মাধবপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যে স্থানে থানা অবস্থিত সেটি মোগল আমলে বেজোড়া পরগণাধীন সোনাই নদীর তীরবর্তী একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল বলে জানা যায়। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেকোনো সময় বেজোড়া বাজুর পরিবর্তে মাধবপুর নামকরণ করত থানা কার্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়।

মূলত প্রাচীন বেজোড়া, কাশিমনগর, মনতলা ও আংশিকভাবে গিয়াসনগর পরগণা নিয়েই বর্তমান কালের মাধবপুর উপজেলা অঞ্চল।

বর্তমানে উত্তরে হবিগঞ্জ সদর ও লাখাই উপজেলা; দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য; পূর্বে চুনারুঘাট উপজেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর ও বিজয়নগর উপজেলায় সীমাবদ্ধ মাধবপুর উপজেলা এলাকায় ১. ধর্মঘর ২. চৌমুহনী ৩. বহরা ৪. আদাঐর ৫. আন্দিউড়া ৬. শাহজাহানপুর ৭. জগদীশপুর ৮. বুল্লা ৯. নয়াপাড়া ১০. ছাতিয়াইন ১১. বাঘাসুরা ইউনিয়ন রয়েছে। মাধবপুর পৌরসভাসহ এই ১১টি ইউনিয়ন এলাকায় অতীতে যেসব পরগণা ছিল তার পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। **বেজোড়া :** মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী টোডরমল সিলেট অঞ্চলে ৮টি মহালের রাজস্ব নির্ধারণ করেন। উক্ত রাজস্ব হিসাবে তরফের রঘুনন্দন পাহাড়ের নিম্নভাগ থেকে সরাইলের সীমা পর্যন্ত এলাকাটি 'বেজোড়া বাজু' মহাল নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। আইন-ই-আকবরীর এইচ ব্লকম্যান কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদে বেজোড়া বাজুকে 'Bajwa Biyaju'[৪৮] এবং সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে শুধু 'Baju'[৪৯] উল্লেখ করা হয়েছে। তখন এর রাজস্ব ছিল ৮০৪,০৮০ দাম।[৫০]

এই বেজোড়া বাজু বা বেজোড়ার নামকরণ সম্পর্কে ইতিহাসে যে বিয়োগান্তক ঘটনার তথ্য অবগত হওয়া যায় তা হলো : তরফের অধিপতি সৈয়দ মিকায়েলের চার পুত্রের মধ্যে সৈয়দ আব্বাস দিল্লীতে খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি রাজ দরবারের জনৈক ওমরাহ তনয়ার পাণিগ্রহণ পূর্বক সম্রাটের অনুকম্পা লাভ করেন। তরফ মহালে তখন একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান ছিল। এ অবস্থায়ই সৈয়দ আব্বাস রাজ-প্রসাদ স্বরূপ সম্রাট থেকে একটি জায়গির লাভ করে সস্ত্রীক তরফস্থ নিজ জন্মস্থানে আসছিলেন। এ সংবাদ এলাকায় প্রচারিত হয়। এতে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ নাজির ঈর্ষা বশে সৈয়দ আব্বাসকে পথিমধ্যে তরফের নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে হত্যার পরিবেশ সৃষ্টি করলে সেখানে তিনি অতর্কিত আক্রমনে নিহত হন।

ওমরাহ তনয়া এ ঘটনায় মর্মাহত হয়ে সেখান থেকেই দিল্লীতে ফিরে যান। যে স্থানে এ বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে সে স্থানটি তখন থেকে বেজোড়া নামে খ্যাত হয়। ঐ সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাটি মোগল শাসনাধীনেই ছিল।[৫১] সে সূত্রে তরফের এ অংশটি দিল্লী দরবারেও বেজোড়া নামে পরিচিতি লাভ করে। সে সুবাদে মোগল রাজস্ব হিসেবে সংশ্লিষ্ট পরগণার নামও 'বেজোড়া বাজু' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও টোডরমলের রাজস্ব হিসাবে তরফের নাম না থাকায় এ ধারণার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতীতে সেখানে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা পরবর্তীতে মাধবপুরে স্থানান্তরিত হয়। শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলাধীন বেজোড়া পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ১০২টি; আবাদি জমি ৯,৬৬১ হাল; মোট ভূমি ৫২,৩৫৬ একর; তালুক সংখ্যা ১,২৯৪টি এবং রাজস্ব ছিল ৩,০৭৬ টাকা।

বর্তমানে বেজোড়া জগদীশপুর ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত এবং বৃহৎ গ্রাম। জগদীশপুর ইউনিয়নে বেজোড়া নামে এবং বুল্লা ইউনিয়নে বেজোড়া চক নামে দু'টি বড় মৌজা রয়েছে।

২। মনতলা : মনতলা পরগণা সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৮৬১-৬৪ খ্রিষ্টাব্দের সার্ভে অনুযায়ী মনতলা ত্রিপুরা জেলার চাকলে রোশনাবাদের ৫৩টি পরগণা তালিকায় ১৪ নং ক্রমিকে দেখানো হয়েছে। তৎকালে এর ভূমির পরিমাণ ছিল ৬৭১১ একর।[৫২] এই অধ্যায়ের তালিকা সংক্রান্ত ৫নং টীকায় বলা হয়েছে,'মন্তলা মণিপুরের সহিত পরিমাপ হইয়াছে'।[৫৩] পরবর্তীতে এ পরগণা শঙ্করপাশা রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে সরাইল ব্যতীত ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর সমতল অঞ্চল নিয়ে রোশনাবাদ নামে একটি জেলা গঠিত হয়। পরে ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে এই রোশনাবাদ নামের পরিবর্তে জেলার নামকরণ করা হয় ত্রিপুরা।[৫৪] ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কিছু রদ বদলের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের সরাইল, দাউদপুর, হরিপুর ও বেজোড়া পরগণাগুলি ছাড়া বর্তমান কুমিল্লা জেলার বাকি অংশ ও বর্তমান নোয়াখালী জেলা নিয়ে ত্রিপুরা জেলা গঠিত হয়। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে স্বতন্ত্র নোয়াখালী জেলা গঠিত হয়। তখন সরাইল, দাউদপুর, হরিপুর বেজোড়া ও সতেরখণ্ডল পরগণাগুলি ময়মনসিংহের অধীন ছিল এবং ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে সেগুলো ময়মনসিংহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ত্রিপুরার অন্তর্গত করা হয়।[৫৫]

এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে ১৭৮১ থেকে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত মনতলা এবং কাশিমনগর পরগণা রোশনাবাদ হয়ে ত্রিপুরা জেলার অধীন ছিল। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় বলা হয়েছে, 'শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুরা হইতে গৃহীত। মুসলমানগণ দ্বারা ইহার সূত্রপাত হয়। অল্পকাল গত হইল ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ মন্তলা পরগণাটি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।'[৫৬] বর্তমানে বহরা ইউনিয়নে মনতলা নামে একটি রেলস্টেশন ও বাজার থাকলেও এ নামে কোনো মৌজা বা গ্রাম নেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই মনতলা এলাকাটি কাশিমনগর পরগণাধীন ছিল। এতে মনতলা পরগণার অস্তিস্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। তবে এটি যে, ক্ষুদ্র একটি পরগণা ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ধারণা করা যেতে পারে, মনতলা বাজার থেকে পূর্ব দিকে কৃষ্ণপুর হয়ে ত্রিপুরা সীমান্তের অভ্যন্তরভাগে এর বিস্তৃতি ছিল। এর অধিকাংশ এলাকাই ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্যমান।

রাজমালা গ্রন্থে চাকলে রোশনাবাদের অধীন ১৮৬১-৬৪ খ্রিষ্টাব্দের সার্ভে অনুযায়ী মনতলা ত্রিপুরা জেলার চাকলে রোশনাবাদের ৫৩টি পরগণা তালিকায় ১৪ নং ক্রমিকে দেখানো হয়েছে। এরপরে রাজমালায় ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের যে পরগণা তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে মন্তলা পরগণার উল্লেখ নেই। অপরদিকে ১৮৫৯-১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে থাকবস্তের জরিপানুযায়ী হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের যে পরগণা তালিকা রয়েছে তাতে ৫নং ক্রমিকে কাশিমনগর ও ২৮ ক্রমিকে মন্তলা পরগণার উল্লেখ রয়েছে।[৫৭]

এতে মন্তলা পরগণার কোনো আর কোনো তথ্য না থাকলেও কাশিমনগর পরগণার ভূমি ৬০৪৬ একর, রাজস্ব ৩৭৫৩ টাকা এবং তালুক সংখ্যা ১৬০টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই দাড়ায় যে, থাকবস্ত জরিপের পরে এবং এর রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে সম্ভবত ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দেই মন্তলা

পরগণাটির বিলুপ্তি সংক্রান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মন্তলা পরগণার কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী কাশিমনগর ও কিছু অংশ ত্রিপুরা রাজ্যের মণিপুর পরগণার সাথে একীভূত হয়ে যায়।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মন্তলা পরগণার বর্তমান বাংলাদেশ অংশের কোথাও মনতলা নামে কোনো গ্রাম বা মৌজার অস্তিত্ব নেই। তাহলে এই এলাকা যে মন্তলা পরগণার অংশ ছিল তার প্রমাণ কীভাবে পাওয়ায় সম্ভব? উত্তর হচ্ছে, কাশিমনগর পরগণার সাথে এর পশ্চিমাংশের উল্লেখযোগ্য অংশের সংযুক্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার দু'টি স্থাননামই স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করছে। এই নাম দু'টির একটি মন্তলা বাজার এবং অপরটি মন্তলা রেলস্টেশন। মন্তলা বাজার মন্তলা পরগণা চাকলে রোশনাবাদের অধীন থাকা কালেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পরগণার সদর এলাকায় এই বাজারটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরগণার একমাত্র বাজার ছিল এটি। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আখাউড়া-করিমগঞ্জ রেল লাইন চালু করা হয়।[৫৮] তখন যদিও মন্তলা পরগণা বিলুপ্ত তবু পুরনো ঐতিহ্য এবং এই বাজারকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট স্টেশনের নামকরণ করা হয় 'মন্তলা রেলস্টেশন'।

৩। **কাশিমনগর :** কাশিমনগর পরগণা এলাকা অতীতে ত্রিপুরাধীন সমতল ভূমির অন্তর্গত ছিল। ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা নেয়াবতের দেওয়ান মীর হবিব ধর্ম মাণিক্যকে পরাজিত করে ত্রিপুরার সমতল অংশ অধিকার করেন। নবাব সুজা উদ্দিন এই সংবাদ অবগত হয়ে বিজিত অঞ্চলের নামকরণ করেন 'রোশনাবাদ'। এই রোশনাবাদ বাংলার রাজস্ব হিসাবে একটি অতিরিক্ত চাকলা হিসেবে গণ্য হয়।[৫৯]

কাশিমনগর পরগণা ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই চাকলে রোশনাবাদ থেকে সিলেটের সাথে সংযুক্ত হয়। এর প্রমাণ হচ্ছে, প্রথমতঃ রাজমালা গ্রন্থে চাকলে রোশনাবাদের অধীন ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের যে পরগণা তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে কাসিমনগর পরগণার নাম নাই।[৬০]

দ্বিতীয়ত ১৮৫৯-১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে থাকবস্তের জরিপানুযায়ী হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের যে পরগণা তালিকা রয়েছে তাতে ৫নং ক্রমিকে কাশিমনগর পরগণা উল্লেখে এর ভূমির পরিমাণ ৬০৪৬ একর, রাজস্ব ৩,৭৫৩ টাকা এবং তালুক সংখ্যা ১৬০টি উল্লেখ করা হয়েছে।[৬১] তখন হবিগঞ্জ কালেক্টরি বিভাগের শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলার অন্তর্গত হয় এই কাশিমনগর পরগণা।

এ পরগণার উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায়:

> বঙ্গদেশ যখন পাঠানদের অধিকারে ছিল, তৎকালে ত্রিপুরা-রাজ্যসময় সময়ে পাঠান সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইত; ত্রিপুরার ইতিহাসে সে সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
>
> এক সময় দাউদ খাঁ ও কাশিম খাঁ নামক দুইজন পাঠান সেনানায়ক সএ দেশের প্রাকৃতিক শ্যামল শোভায় বিমোহিত ও ভূমির উর্ব্বরতা দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া এদেশেই বাস করেন। তাঁহারা নবাব হইতে পুরষ্কার স্বরূপ এতদ্দেশে যে ভূমি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের নামে তাহা খ্যাত হয়। দাউদ খাঁর বাসভূমি দাউদপুর নাম প্রাপ্ত হয়। (পরগণা দাউদপুর, জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত) সেনা-নায়ক কাশিম খাঁ যে স্থানবাসী হইয়াছিলেন, উহা দিনাদহ কথিত হইত, খাঁ নিজ নামে উহাকে কাশিম নগর নামে খ্যাত করেন। পরগণা কাশিম নগর শ্রীহট্টের দক্ষিণ

প্রান্তবর্ত্তী ও ত্রিপুরার সীমাসংলগ্ন। কাশিম নগর পরগণা পাঁচ মাইল মাত্র দীর্ঘ। কাশিম নগরের চৌধুরীবর্গ একসময় প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, সেই বংশে মোহাম্মদ নাজির চৌধুরী ও মোহাম্মদ হামজা চৌধুরীর এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, ইঁহারা স্বীয় অধিকারে জনৈক অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া একটি তেঁতুল বৃক্ষের শাখায় ফাঁসী দিয়েছিলেন।[৬২]

৪। গিয়াসনগর : গিয়াস নগর পরগণা মাধবপুরকে আকর্ষণ করেছিল এমন মনে হয়। কারণ নরপতি নিবাসী কুতুব-উল-আউলিয়ার বংশধর সৈয়দ গদাহাসন ও সৈয়দ গিয়াস নামের ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে তরফ পরগণার কিছু অংশ খারিজ করে নিজ নিজ নামে পরগণা সৃষ্টি করেন।[৬৩]
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে, গিয়াসের নামে যে পরগণা হয় তার ভূমি কাশিমনগর, বেজোড়া, লাখাই ও তরফ পরগণা থেকে নেয়া হয়। সৈয়দ গিয়াস চারাভাঙ্গায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখানে তাঁর মাঝার অবস্থিত।[৬৪] এতে ধারণা করা যায়, উক্ত পরগণা জগদীশপুরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকবর্তী জনপদ এবং তরফের কতক পাহাড়াঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল। জগদীশপুর তেমোহনার দক্ষিণ দিকে আঞ্চলিক মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বস্থ গ্রামটির নাম সৈয়দ গিয়াসের নামানুসারে গিয়াসনগর হিসেবে খ্যাত ছিল। এটিই সম্ভবত গিয়াসনগর পরগণা সদর ছিল। গ্রামটি বর্তমানে শাহজাহানপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর সুরমা হিসেবে লিখিত হয়।

শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলাধীন গিয়াসনগর পরগণায় হালাবাদী জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ১৩টি; আবাদী জমি ১৯৩ হাল; মোট ভূমি ১,২২৩ একর; তালুক সংখ্যা ৪২টি এবং রাজস্ব ছিল ৩৭৩ টাকা।

চুনারুঘাট উপজেলা

চুনারুঘাট নামে কোনো প্রশাসনিক ইউনিট কখনো ছিল না। অতীতে বর্তমান মিরাশী ইউনিয়নের মুছিকান্দি নামক স্থানে ও নামে লস্করপুর থানার অধীন একটি আউট পোস্ট ছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সেখান থেকে থানা সদর চুনারুঘাট নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয়।

চুনারুঘাট নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, ব্রিটিশ আমলে খোয়াই নদী পথে বিশাল বিশাল নৌযান ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করতো। তখন ত্রিপুরা পাহাড়ের কোনো কোনো স্থানে চুনাপাথর পাওয়া যেতো। সেগুলো সংগ্রহ পূর্বক ছোট ছোট নৌযানে করে খোয়াই নদীর একটি স্থানে এনে মজুদ করা হতো। সেখান থেকে বৃহৎ নৌযানে করে দেশে-বিদেশে রপ্তানি হতো। যে স্থানে চুন মজুদ করা হতো সে স্থান চুনের ঘাট হিসেবে তখন কথিত হতো। ক্রমান্বয়ে সেখানে জনবসতি ও একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় যার নাম হয় 'চুনেরঘাট'। কালক্রমে চুনেরঘাটই 'চুনারুঘাট'-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুছিকান্দি থেকে থানা কার্যালয় চুনারুঘাটে স্থানান্তর করা হয়।

বর্তমানে উত্তরে হবিগঞ্জ সদর ও বাহুবল উপজেলা; দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য; পূর্বে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পশ্চিমে মাধবপুর উপজেলা এলাকায় সীমাবদ্ধ চুনারুঘাট উপজেলায় **১.** গাজীপুর **২.** আহমদাবাদ **৩.** দেওরগাছ **৪.** পাইকপাড়া **৫.** শাহানখলা **৬.** চুনারুঘাট **৭.** উবাহাটা **৮.** সাটিয়াজুরী **৯.** রাণীগাঁও **১০.** মিরাশী ইউনিয়ন রয়েছে। **১**টি পৌরসভাসহ এ **১০**টি ইউনিয়ন এলাকায় অতীতে যেসব পরগণা ছিল তার পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। রঘুনন্দন : সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তরফ পরগণায় নরপতিদেব নামে এক ভূস্বামী ছিলেন। তিনি নিজ অধিকৃত এলাকার জঙ্গল আবাদ করে নরপতি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন রাজপণ্ডিত বন্দোপাধ্যায়। তদীয় উত্তর পুরুষ রত্নবল্লভের এক পুত্রের নাম ছিল রঘুনন্দন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনন্দন দিল্লী গমন করে বাদশাহর দরবারে কোনো এক কাজে নিয়োজিত হন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে রাজ দরবারে খ্যাতি অর্জন করেন। অতঃপর পৈতৃক ভূমিসহ তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি পরগণা প্রস্তাব করে 'রঘুনন্দন' নামে খারিজ করান।[৬৫]

এটি মূলত রঘুনন্দন পাহাড়ের অংশবিশেষ। বৃহত্তর রঘুনন্দন পাহাড়ের সাথে এই পরগণার নামকরণের বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন রঘুনন্দন পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল **১২**টি; মোট ভূমি **১১০** একর; তালুক সংখ্যা **২**টি এবং রাজস্ব ছিল **১৫৭** টাকা। বর্তমানে এ উপজেলার শানখলা ইউনিয়নে রঘুনন্দন (পাহাড়) নামে ৫০০০ একরের একটি মৌজা (বনাঞ্চল) রয়েছে।

২। উসাইনগর : উসাইনগর একটি ক্ষুদ্র পরগণা ছিল। এ পরগণা সাটিয়াজুরী ইউনিয়ন এলাকায় বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে উসাইনগর নামে সাটিয়াজুরী ইউনিয়নে একটি মৌজা ও গ্রাম রয়েছে। লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন উসাইনগর পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা **১৬**টি; তালুক ৬টি; ভূমি **১৬৯** একর ও রাজস্ব ছিল **১৮৩** টাকা।

৩। তরফ : চুনারুঘাট এবং বাহুবল উপজেলার সম্পূর্ণ অংশই অতীতে তরফ পরগণার অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীতে খারিজ হয়ে এ থেকে অনেক পরগণার সৃষ্টি হয়। তাই বিভিন্ন খারিজা পরগণা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন থানায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাহুবল উপজেলা

অতীতে বাহুবল নামে কোনো প্রশাসনিক ইউনিট ছিল না। সংশ্লিষ্ট এলাকাটি সুপ্রাচীন কালে রাজপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে, রাজা আচাক নারায়ণ যে গভীর জলাশয়ে (ঘুঙ্গিয়াজুরী হাওর) এসে স্নান করতেন সে স্থানটি 'স্নানঘাট' নামে খ্যাত হয়। মুসলিম বিজয় কালে হযরত সৈয়দ নাসির উদ্দিনের সাথে যে বারোজন আউলিয়া এখানে এসেছিলেন তাঁরা যেখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন সে স্থানের নাম হয় 'বার আউলিয়া' (মীরপুর ইউনিয়ন)। সে কালেও এলাকাটি তরফ

রাজ্যের অধীন ছিল। পরবর্তীতে তরফ রাজ্যের অস্তিত্ব বিলোপ হলেও সম্পূর্ণ এলাকা তরফ পরগণাধীনই ছিল।

বাহুবল নামকরণের ব্যাপারে জনশ্রুতি আছে, কোনো এককালে কুদরত মাল নামে এক পাহলোয়ান এখানে বসবাস করতেন। মৌলভীবাজারের দক্ষিণভাগ নামক স্থানের অপর এক পাহলোয়ান এসেছিলেন তাঁর সাথে মল্লযুদ্ধ করতে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর কুদরত মাল বিজয়ী হয়ে বলেছিলেন 'বাহুকা বল দেখ বেটা'। এ থেকেই নাকি এ অঞ্চলের নাম হয় 'বাহুবল'। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এ এলাকার মানুষ নাকি খুবই সাহসী ছিলেন। বনের বাঘের সাথেও নাকি লড়াই করতে দ্বিধা করতেন না। তাই বীরত্বের জন্যে নাকি এ এলাকার নাম হয় 'বাহুবল'।

হবিগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠা কালেও সম্পূর্ণ বাহুবল এলাকা লস্করপুর থানাধীনে ছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আসাম প্রাদেশিক সরকারের এক গেজেট নোটিফিকেশনে বর্তমান এলাকা নিয়ে বাহুবল পূর্ণাঙ্গ থানার মর্যাদা লাভ করলে বাহুবল একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে আবির্ভূত হয়।

বর্তমানে লস্করপুর এলাকার একাংশ বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত। লস্করপুরের যে স্থানে নবাবি আমলের রাজকীয় কাছারি ও বিচারালয় ছিল সে স্থানের নাম কোটান্দর (মীরপুর ইউনিয়ন)। সেখানে অবস্থিত লুতের মাজার হযরত শাহজালাল র.-এর অন্যতম সাথী সৈয়দ আহমদের মস্তকহীন দেহের সমাধিক্ষেত্র বলে দাবি করা হয়। কথিত আছে, তাঁর মস্তক নদীপথে ভাসতে ভাসতে তিতাস নদীর তীরবর্তী আখাউড়ার নিকটবর্তী খড়মপুরে জেলেদের জালে ধরা পড়ে। সেই মস্তকের সমাধি সৈয়দ আহমদের বলা হয়ে থাকে।

বর্তমানে উত্তরে নবীগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে চুনারুঘাট উপজেলা, পূর্বে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল এবং পশ্চিমে হবিগঞ্জ সদর উপজেলা এলাকায় সীমাবদ্ধ বাহুবল উপজেলায় ১. স্নানঘাট ২. পুটিজুরী ৩. সাতকাপন ৪. বাহুবল ৫. লামাতাসী ৬. মীরপুর ৭. ভাদেশ্বর এই ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে। এই ৭টি ইউনিয়ন এলাকায় অতীতে যেসব পরগণা ছিল তার পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। তরফ : ত্রিপুরার করদ রাজ্য তুঙ্গাচল বা রাজপুর রাজ্য ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহজালাল র. কর্তৃক বিজিত হবার পর হতে রাজ্যটি 'তরফ' নাম ধারণ করে।

তরফ রাজ্যের নামকরণ সম্পর্কে বহুল প্রচলিত মত হচ্ছে, ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহজালাল (র.) এর সাথী দ্বাদশ আউলিয়ার নেতৃত্বে রাজপুরের রাজা আচক নারায়ণকে আক্রমণের সময়ে জনৈক ওলি পথ নির্দেশের জন্য বলেছিলেন যে 'ইস্ তরফ যাওগে'। এ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকা 'তরফ' নামে পরিচিতি পায়। ক্রমান্বয়ে উক্ত রাজ্যও তরফ নামে খ্যাত হয়। কিন্তু ভিন দেশী ওলিগণ একসাথে এসে সুনির্দিষ্ট ভাবে একজন আরেক জনকে পথনির্দেশের কথা বলবেন আর তা থেকে একটি অঞ্চলের নামকরণ হয়ে যাবে তা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়।

১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বিজয়ে মুসলিম বাহিনী প্রথমে তুঙ্গাচল বা রাজপুর জয় করে সিলেটের উদ্দেশ্যে অগ্রাভিযান করেন।[৬৬] এরপর একই বছরে গৌড় বা সিলেট বিজিত হয়। বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল র. নিজে প্রশাসনিক দায়িত্ব না নিয়ে বিজিত রাজ্যকে দুই অংশ বা তরফে ভাগ

করে গোবিন্দের রাজ্য গৌড় বা সিলেট অংশের দায়িত্ব অভিযানের মূল সেনাপতি সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ’র ভাগিনেয় ও সেনাপতি সিকান্দর খান গাজীকে প্রদান করেন।[৬৭]

অপর অংশ বা তরফ আচক নারায়ণের তুঙ্গাচল বা রাজপুরের দায়িত্ব প্রদান করেন অপর সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দিনকে। তিনি হযরত শাহজালাল র. এর নির্দেশে বারোজন আউলিয়াসহ তাঁর অধীন এক হাজার অশ্বারোহী ও তিন হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে তুঙ্গাচল আসেন।[৬৮] দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী তরফের এই বিজয়কাল ৭০৮ হিজরি (১৩০৮ খ্রি.) উল্লেখ করেছেন।[৬৯]

তুঙ্গাচল বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী সিলেটের উদ্দেশ্যে গমনের পর আচাক নারায়ণ তার রাজ্যে পুনরায় অধিষ্ঠিত হলেও সৈয়দ নাসির উদ্দিন র.-এর নেতৃত্বে আবার ফিরে আসলে আচাক নারায়ণ বিনা যুদ্ধেই পলায়ন করেন। সেই থেকে তুঙ্গাচলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাই বাস্তব যে, গৌড় এবং তুঙ্গাচল বিজীত হওয়ার পর হজরত শাহজালাল র. উভয় রাজ্যকে দুই তরফ বা অংশে বিভক্ত করে গৌড় অংশের দায়িত্ব প্রদান করেন প্রধান সেনাপতি সিকান্দর খান গাজীকে– পরবর্তীতে যার নাম হয় ‘শ্রীহট্ট’। তিনি অপর তরফ বা অংশ অর্থাৎ তুঙ্গাচলের কর্তৃত্ব দেন আর এক সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দিন র.-কে। তখন থেকে মুসলিম রাজত্বের তুঙ্গাচল অংশ ‘তরফ’ হিসেবে কথিত হয়। এই তরফ বা অংশই ক্রমান্বয়ে ‘তরফ রাজ্য’ হিসেবে পরিচিতি পায়।

তুঙ্গাচল রাজ্যটি অতীতে ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশসহ বর্তমান চুনারুঘাট, বাহুবল ও আংশিকভাবে নবীগঞ্জ উপজেলা এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। মুসলিম বিজয়ের পর এর নাম ‘তরফ’ হওয়া ছাড়াও উত্তরে বরাক নদী, পূর্বে ভানুগাছের পাহাড়, দক্ষিণে সরাইল ও পশ্চিমে লাখাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরাধিপতি অমর মাণিক্য ও তরফের অধিপতি সৈয়দ মুসার মধ্যে সংঘটিত জিকুয়ার যুদ্ধে তরফের পতন ঘটলে ইতিহাস থেকে কিছু কালের জন্য তরফ নামটি বিলুপ্ত হয়। পরবর্তীতে বারো ভূঁইয়াদের পতনের পর তরফের শাসকেরা তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পেলেও তা কেবল পরগণার মর্যাদায় বর্তমান হবিগঞ্জ শহর এলাকার পূর্বাংশ থেকে চুনারুঘাট ও বাহুবল পর্যন্ত সীমিত থাকে। এরপর তরফ পরগণা থেকে আরো ১০টি পরগণা খারিজ হলে তরফ বর্তমান বাহুবল উপজেলার অধিকাংশ ও চুনারুঘাটের কিছু অংশে সীমাবদ্ধ থাকে।

দশসনা বন্দোবস্তের পূর্বে নাওরা মহাল উল্লেখে তরফ ঢাকার অন্তর্ভুক্ত ‘চাকলে জাহাঙ্গির নগর, জিলা লস্করপুর’ বলে খ্যাত হতো। মোহাম্মদ রেজা খাঁর চকবন্দি মতে এর সদরজমা ১৬,২১৭ টাকা ছিল। তখন পর্যন্ত তরফ একটি অখণ্ড জায়গির ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের তৌজিতেও বিভিন্ন ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয় না। এরপর বহু তালুকের সৃষ্টি হয়েছে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের দশসনা বন্দোবস্তের সময় তরফ সিলেটের কালেক্টরিভুক্ত হয়। তখন এর ১০টি খারিজা পরগণা ব্যতীত সদরজমা ছিল ৪৪ হাজার টাকা।[৭০]

লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন তরফ পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৬৩০টি; মোট ভূমি ৫০,৯৯৬ একর; তালুক সংখ্যা ১,৬০১টি এবং রাজস্ব ছিল ৪৪,০০০ টাকা। বর্তমানে

রানীগাঁও ইউনিয়নে তরফ হিল নামে একটি মৌজা রয়েছে। এটি মূলত ৬,০০০ একরের একটি রিজার্ভ ফরেস্ট।

২। **পুটিজুরী :** লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন পুটিজুরী পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল **১২৩**টি; মোট ভূমি ৬,**১৩৬** একর; তালুক সংখ্যা **১৮৯**টি এবং রাজস্ব ছিল **১**,৭৫৪ টাকা। বর্তমানে পুটিজুরী নামে একটি ইউনিয়ন রয়েছে।

৩। **ফয়েজাবাদ :** ফয়েজাবাদ পরগণা মূলত একটি পাহাড়াঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ভাদেশ্বর ইউনিয়নে ফয়েজাবাদ পাহাড় (৬,২৪৪ একর) ও ফয়েজাবাদ চা বাগান নামে (২৮৯ একর) দু'টি মৌজা রয়েছে। এ ছাড়া সেখানে ফয়েজাবাদ চা বাগান ও ফয়েজাবাদ বাদাম টিলা নামে দুটি গ্রাম রয়েছে।

লস্করপুর রাজস্ব জিলাধীন ফয়েজাবাদ পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৬**১**টি; মোট ভূমি **১**,৩২৮ একর; তালুক সংখ্যা **১১**৫টি এবং রাজস্ব ছিল ৫৫৮ টাকা।

অন্যান্য :

১। মগিশপুর : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে পরগণা তালিকার ২৭নং ক্রমিকে মগিশপুর নামে একটি পরগণা রয়েছে।[৭১] 'হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস' গ্রন্থেও এর সমর্থন বিদ্যমান।[৭২] কিন্তু সমগ্র হবিগঞ্জ মহকুমায় মগিশপুর নামে কোনো প্রাচীন গ্রাম কিংবা পরগণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।

শঙ্করপাশা রাজস্ব জিলাধীন মগিশপুর পরগণায় হালাবাদি জরিপানুযায়ী গ্রাম সংখ্যা ছিল ৫টি; আবাদি জমি **১**৮৪ হাল; মোট ভূমি ৮৯২ একর; তালুক সংখ্যা ৮টি এবং রাজস্ব ছিল **১**৮**১** টাকা।

তথ্যনির্দেশ:

১. ইরফান হবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, কে .পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী (কলিকাতা) **১৯৮৫**। পৃষ্ঠা **১৯০**

২. Abul Fazl Allami, *THE AIN – I – AKBARI (VOL.11)*, Translated by H. Blochman. Page- 152. দাম তৎকালীন তাম্রমুদ্রা। তখন চল্লিশ দামের মূল্যমান ছিল এক শেরশাহী মুদ্রা।

৩. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 351

৪. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ২২

৫. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-২ এর পরিবর্তে জোয়ার বানিয়াচঙ্গ, কিসমত সতরসতীর পরিবর্তে কিং বাজু সত্রসতী, বানিয়াচঙ্গ (কসবা)-র পরিবর্তে বানিয়াচঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া আগনা পরগণার উল্লেখ না করে তিনি অতিরিক্ত পাচাউন, হাং সত্রসতী, সুজাবাদ ও আথানগিরি উল্লেখ করে মোট **১**৮টি পরগণার তালিকা দিয়েছেন। (দ্রঃ জালালাবাদের কথা, পৃ. ২৭৪ এবং হযরত শাহজালাল র., পৃ. ৪৩৫।) অপর দিকে অচ্যুতচরণ চৌধুরী (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৯৭-৯৮) ও সৈয়দ মুর্তাজা আলী (হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ. ২৯০-২৯**১**) পাচাউন, হাং সত্রসতী, সুজাবাদ ও আথানগিরি এই ৪টি পরগণা দক্ষিণ সিলেট (মৌলভীবাজার) এর তালিকায় উল্লেখ করেছেন।

৬. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী মনতলা ব্যতীত মোট ৭টি পরগণার তালিকা দিয়েছেন। (দ্রঃ জালালাবাদের কথা, পৃ. ২৭৪ এবং *হযরত শাহজালাল র.*, পৃ. ৪৩৫।)

৭. লস্করপুর রাজস্ব জিলার উসাইনগরকে কোথাও কোথাও উজানী নগর লিখা হয়েছে। সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ।

৮. কোথাও কোথাও লস্করপুর রাজস্ব জিলার পরগণা তালিকায় তরফের নাম অনুল্লেখিত আছে।

৯. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ফয়েজাবাদ, নুরুলহাসন নগর ও দাউদ নগর এই ৩টি ব্যতীত মোট ৮টি পরগণার তালিকা দিয়েছেন। (দ্রঃ *জালালাবাদের কথা*, পৃ. ২৭৪ এবং *হযরত শাহজালাল র.*, পৃ. ৪৩৫।)

১০. পরগণার নাম, মৌজা বা গ্রামের সংখ্যা, আবাদি জমি, মোট ভূমি, তালুক সংখ্যা এবং রাজস্বের পরিমাণ বিষয়ক তথ্য *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত* (প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯) ও *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (পৃ.২৯২-২৯৩) থেকে নেয়া হয়েছে। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে* মুড়াকড়ি নামে (৩০ ও ৩১ ক্রমিকে) দু'টি পরগণার উল্লেখ করায় তাতে পরগণার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫টি। কিন্তু হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাসসহ অপর কোনো গ্রন্থেই মুড়াকড়ি নামে একাধিক পরগণার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। সে মতে পরগণার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪টিতে। বাস্তবতার নিরিখে কোনো কোনো পরগণার বানান সংশোধন করা হয়েছে। এতে ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো সূত্রের সাথে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হতে পারে।

১১. সৈয়দ মোসতাকীম আলী ও অব্দুল হাই আজাদ, প্রবন্ধ: নবীগঞ্জ থানা পরিচিতি, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল। পৃষ্ঠা ২৯৭

১২. দেওয়ান মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের পথিকৃত কোরেশী মাগন*, বন্ধন প্রকাশনী ১৯৯১। পৃষ্ঠা ১৩৬-১৪০

১৩. সালাহ্উদ্দীন আহমেদ, *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসী শব্দের অভিধান*, প্রকাশ ১৯৯৩। পৃষ্ঠা ৯২

১৪. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল র.*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ৩৭৫

১৫. শাহ মনসুর আহমেদ ও সৈয়দ শাহ দরাজ, প্রবন্ধ: দিনারপুর পরগণার ইতিহাস ও ঐতিহ্য; *তরফজ্যোতি-৪*, সম্পাঃ শাহ মনসুর আহমেদ সেলিম, তরফ সাহিত্য পরিষদ ২০১৫। পৃষ্ঠা ৯৩

১৬. দেওয়ান মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের পথিকৃত কোরেশী মাগন*, বন্ধন প্রকাশনী ১৯৯১। পৃষ্ঠা ১৩৮

১৭. তৎকালে মৌজা ও গ্রাম সমার্থক ছিল। সেটেলমেন্ট জরিপের সময়ে মৌজা ও গ্রামের পৃথকার্থ নিশ্চিত হয়।

১৮. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, উৎস প্রকাশন ২০১০। পৃষ্ঠা ২৪০-২৪১

১৯. দেওয়ান মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ কোরেশী মাগন*, বন্ধন প্রকাশনী ১৯৯১। পৃষ্ঠা ১৩৯

২০. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৩৫

২১. ফজলুর রহমান, *সিলেটের আরও একশ একজন*, প্রকাশক: তবস্সুম রহমান ২০০০, পৃষ্ঠা ২৬৩

২২. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ*, *দ্বিতীয় ভাগ-তৃতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ১৯

২৩. ক. হবিগঞ্জ সাবডিভিশনাল অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মে তারিখে ৫০৫ নং পত্রের উত্তরে বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান আজমান রজা কর্তৃক প্রদত্ত ২৮ পরগণার বিবরণ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট। খ. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ*, *দ্বিতীয় ভাগ-তৃতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ১৯

২৪. উক্ত পরগণাটি 'জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-১' ও 'জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-২' এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠাকালে জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-১ সুনামগঞ্জ এবং জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-২ হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়।

২৫. সিকসোনইতা ও হাউলিসোনাইতা পরগণা থেকে পরবর্তীতে 'বাজুসোনাইতা' নামে একটি পরগণা খারিজ করা হয়। সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠার সময়ে সিকসোনইতা ও হাউলি সোনাইতা পরগণা সুনামগঞ্জে এবং বাজুসুনাইতা হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন হয়।

২৬. সতরসতী পরগণার কেন্দ্রস্থল 'সতরসতী হাউলী' ও এর পার্শ্ববর্তী অংশ নিয়ে 'বাজুসতরসতী' এবং 'কিসমত বাজুসতরসতী' নামে ৩টি পরগণায় বিভক্ত হয়। সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠার সময় সতরসতী হাউলী মৌলভীবাজার এবং বাজুসতরসতী ও কিসমত বাজুসতরসতী হবিগঞ্জের অধীন ন্যস্ত হয়।

২৭. অধিক পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য: হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস, মুহম্মদ সায়েদুর রহমান; উৎস প্রকাশন ২০১০। পৃষ্ঠা ২৭৬-২৭৮

২৮. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৩৭

২৯. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৫৬

৩০. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ বি বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ২৭৭

৩১. In 1744 A.D. Laur was burned by the Khasis, and many of the people moved to Baniyachang. *Assam District Gazetteers. Vol. II. (Sylhet)* chap. II, Page 25

৩২. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৫৬

৩৩. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, প্রথম ভাগ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৯৯

৩৪. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৬৬

৩৫. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৫৮

৩৬. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৬০

৩৭. অত্র গ্রন্থের শেষাংশে 'হবিগঞ্জ নামকরণ : একটি প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা' শীর্ষক নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৩৮. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, উৎস প্রকাশন ২০১০। পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩

৩৯. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ বি বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ৫৭

৪০. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৬৯

৪১. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৮৭-৩৮৮

৪২. সৈয়দ মোসতাকীম আলী ও আব্দুল হাই, প্রবন্ধ: নবীগঞ্জ থানা পরিচিতি, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, পৃষ্ঠা ৩১৫

৪৩. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৭২

৪৪. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৮৩

৪৫. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত শ্রীহট্টের মানচিত্রে পরগণাটি সদর উপজেলার গোপায়ার নিকটবর্তী দেখানো হয়েছে।

৪৬. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৬৯

৪৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৬৯

৪৮. Abul Fazal Allami, *THE AIN-I-AKBARI (VOL-II)*, Translated by H. Blochman. Page 152

৪৯. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 68

৫০. Abul Fazal Allami, *THE AIN-I-AKBARI (VOL-II)*, Translated by H. Blochman. Page 152

৫১. ক. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ.বি.বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ২৮০। খ. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৬৪

৫২. শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, অক্ষর সংস্করণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২৭১

৫৩. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২৭৭

৫৪. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ব্রিটিশ ও বর্তমান যুগ, *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, কুমিল্লা জেলা পরিষদ ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ৩১১

৫৫. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩১২

৫৬. শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, অক্ষর সংস্করণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২৫৫

৫৭. শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ প্রথম ভাগ*, শ্রীউপেন্দ্র পাল চৌধুরী (কলিকাতা) ১৩১৭। পৃষ্ঠা ১৫৪

৫৮. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet* East Pakistan Government Press, Dacca 1970. Page 174

৫৯. শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, অক্ষর সংস্করণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২৭১

৬০. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ব্রিটিশ ও বর্তমান যুগ, *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, কুমিল্লা জেলা পরিষদ ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৫

৬১. শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ প্রথম ভাগ*, শ্রীউপেন্দ্র পাল চৌধুরী (কলিকাতা) ১৩১৭। পৃষ্ঠা ১৫৪

৬২. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৯০-৩৯১

৬৩. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৬৯

৬৪. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৮৬

৬৫. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০

৬৬. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, উৎস প্রকাশন ২০১০। পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৭

৬৭. ড. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭)*, বড়াল প্রকাশনী ১৯৯৯। পৃষ্ঠা ৫০

৬৮. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহ্‌জালাল র.*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ১৩১

৬৯. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৩৪

৭০. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৭৮

৭১. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, প্রথম ভাগ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৯৯

৭২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ.বি.বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ২৯৩

পঞ্চম অধ্যায়

আসাম প্রদেশকাল ও সাবডিভিশন গঠন

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্রহ্মরাজ্যের সাথে এক সন্ধিবলে আসাম ইংরেজদের শাসনাধীনে আসে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কাছাড় ইংরেজদের হস্তগত হয়। এর পরে গারো পর্বত, খাসি পর্বত, জয়ন্তিয়া পর্বত, নাগা পর্বত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ব্রিটিশ কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করে। তখন এই বিজিত অঞ্চলের শাসনভার ছিল বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সির সিলেট, গোয়ালপাড়া ও কাছাড় এ তিনটি জেলাসহ আসামকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট চিফ কমিশনারশিপ গঠন করা হয়। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক এবং সামরিক গুরুত্ব বিবেচনায় লুসাই পাহাড়কে আসামের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের চিফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড বাংলা হতে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামকে আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক বাধার কারণে তা বাস্তবায়ন হয়নি।[১]

আসামের তৎকলীন জনগণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠী হওয়ায় তারা আইন-কানুন বিষয়ে তেমন কোনো ধারণাই রাখতো না। তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড নর্থব্রুক। প্রশাসন থেকে উক্ত অঞ্চলে পৃথক চিফ কমিশনার নিয়োগ করার বিষয়টি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, আসামের আয় নিতান্ত অল্প। যা দিয়ে প্রশাসনের ব্যয় সঙ্কুলান সম্ভব নয়। তাছাড়া আসাম অঞ্চলে শিক্ষিত ও সভ্য জনগোষ্ঠীর সঙ্কটও ছিল। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী সিলেট যেমন ছিল একটি আয়বহুল এলাকা তেমনি শিক্ষিত জনবলও ছিল আশানুরূপ। এসব দিক বিবেচনায় সিলেটকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত হয়।

এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায় সমগ্র সিলেটবাসী। এর কারণ আসামের জনগণ পাহাড়ি জাতি হওয়ায় তাদেরকে শাসন করা বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণীত আইনের দ্বারা সম্ভব নয়। এর পরিবর্তে তাদের উপযোগী করে আইন-কানুন প্রণয়ন করতে হবে যা সিলেটবাসীর জন্য কেবল অস্বস্তিদায়কই নয় বরং কষ্টসাধ্যও হবে। তাই সিলেটবাসী আন্দোলন শুরু করে। এর প্রেক্ষিতে গভর্নর জেনারেল নর্থব্রুক সিলেটে আগমন করেন।[২]

তার আগমন উপলক্ষে সিলেটকে আসামের সাথে যুক্ত করা হলে এখানকার জনসাধারণের কী কী অসুবিধা হতে পারে তার বিবরণ দিয়ে গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে লর্ড নর্থব্রুক সরকারের সিদ্ধান্তে অটল থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সিলেটের বিধিব্যবস্থা, রাজস্ব সংগ্রহ ও ভূমি বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে বাংলার সর্বত্র যে নীতি প্রচলিত সে অনুযায়ীই চলবে। অর্থাৎ সিলেটে আসামের শাসন প্রণালী অনুসৃত হবে না।[৩]

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে সিলেটকে আসামের সাথে সংযুক্ত করে চিফ কমিশনার অব আসামের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়।[৪] সিলেটের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট পদের স্থলে

ডেপুটি কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং অক্টোবর মাসে এ এল ক্লে প্রথম ডেপুটি কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন।[৫] তখন শিলং ছিল আসাম প্রদেশের রাজধানী। আসাম সুরমা উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পার্বত্য প্রদেশ এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়।[৬] সিলেট তখন সুরমা উপত্যকা বিভাগের অন্তর্গত। তখন থেকেই সিলেটের সাথে বেজোড়া পরগণাও আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সিলেট জেলার আয়তন ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গ মাইল। এতবড় একটি এলাকা সিলেট শহর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা অসুবিধা জনক মনে করে আসামভুক্তির পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সিলেটকে সাবডিভিশন বা মহকুমায় বিভক্ত করার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।[৭] কিন্তু তখন এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলাকে সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সদর এই চারটি সাব-ডিভিশনে (মহকুমা) ভাগ করার লক্ষ্যে গেজেট নোটিফিকেশন জারি হয়।[৮] কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না হওয়ার কারণে তখন তা বাস্তবায়ন হয়নি। এর দশ বছর পর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সুনামগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] এরপরে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মৌলভীবাজার মহকুমা সৃষ্টি হয়।[১০]

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে যখন মহকুমার জন্য 'হবিগঞ্জ' নামটি প্রস্তাব ও ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাস্তবায়ন করা হয় তখন বর্তমান হবিগঞ্জ স্থানটিতে না ছিল কোনো পরগণা, রাজস্ব জিলা, থানা বা অন্য কোনো প্রশাসনিক ইউনিট; না ছিল কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সড়ক যোগাযোগ। পক্ষান্তরে লস্করপুর যেমন ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এলাকা তেমনি সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্র ও স্থাপনা, স্কুল, বাজার ও আধুনিক সমাজ বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র ছিল। যোগাযোগ ক্ষেত্রেও ছিল তৎকালীন সময়ের বাস্তবতায় উন্নত সুবিধা সম্পন্ন। তাই সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠার পর লস্করপুরেই (কোটান্দর) প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়।

সেখান থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে খোয়াই ও বরাকের সঙ্গমস্থল চিরাকান্দির নিকটবর্তী স্থানে (বর্তমান পুরাণ মুন্সেফী এলাকা) সাবডিভিশন কার্যালয় ও বিচারালয় স্থানান্তর করা হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে থানা কার্যালয় কুটান্দর থেকে হবিগঞ্জের বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।[১১] ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর হবিগঞ্জ থেকে শায়েস্তাগঞ্জে স্থানান্তরের একটি প্রক্রিয়া চলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি।[১২]

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যখন হবিগঞ্জ শহরের গোড়াপত্তন করা হয় তখন তা বর্তমান পুরাণ মুন্সেফী এলাকা থেকেই যাত্রা শুরু হয়। লস্করপুর থেকে মুন্সেফী কার্যালয় সেখানেই প্রথম স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান জজকোর্ট এলাকায় মুন্সেফী কার্যালয় স্থানান্তর করা হলে পুরাণ মুন্সেফী এলাকাটি কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পাশাপাশি এবই সময়ে হবিগঞ্জ বারও প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিলেট জেলা ৪টি মহকুমায় বিভক্ত হওয়ার পর দেখা যায়, সদর মহকুমার আয়তন এবং কাজকর্মও অনেক বেশি। সে বিবেচনায় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সদর মহকুমাকে উত্তর সিলেট ও দক্ষিণ সিলেট নামে

বিভক্ত করা হলে মহকুমার সংখ্যা পাঁচটিতে উন্নীত হয়।[১৩] ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ সিলেট মহকুমার নাম পরিবর্তন করে মৌলভীবাজার করা হয়।[১৪]

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। তখন এ নবগঠিত প্রদেশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সুরমা উপত্যকা ও আসাম উপত্যকা এই ৫টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ছিল– ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগে– ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা; রাজশাহী বিভাগে– দিনাজপুর, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলা; সুরমা উপত্যকা বিভাগে– শ্রীহট্ট, কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় ও লুসাই পাহাড় জেলা; আসাম উপত্যকা বিভাগে– গোয়াল পাড়া, কামরূপ, দরঙ্গ, নওগাঁ, লক্ষীমপুর, শিবসাগর ও গারো পাহাড় জেলা।[১৫]

এ সময়েই হবিগঞ্জ মহকুমাসহ সমগ্র সিলেট জেলার চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন সংশ্লিষ্ট নতুন প্রদেশভুক্ত হয় এবং মনতলা পরগণাকে ত্রিপুরা জেলার চাকলে রোশনাবাদ থেকে সিলেটের শঙ্করপাশা রাজস্ব জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বাংলার এই বিভক্তি হিন্দু নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেননি। স্বদেশী আন্দোলনের নামে তারা এর তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে সরকার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করলে পুনরায় আসামে চিফ কমিশনারের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আসাম গভর্নর শাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত হয়।[১৬]

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে সিলেট পুনরায় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৭] চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুনরায় সুরমা উপত্যকা বিভাগের সাথে সিলেটকে যুক্ত করা হয়। সেই থেকে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন তথা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ জেলা আসামের সাথেই থাকে। আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সুবিধা তখন সিলেটবাসী ভোগ করতে পারেনি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনের পর তারা সে অধিকার লাভ করে।[১৮]

সিলেটের আসামভুক্তির বিষয়ে সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে:

> *Sylhet was in Dacca Division of Bengal Province till 1874 but transferred to Chief Commissionership of Assam in order to make the Chief Commissioner's province of Assam economically viable and to secure the services of a number of educated and enlightened persons to administer it. There were, however, loud protests from Sylhet against its inclusion in Assam as people of Sylhet wanted to remain in Bengal with which it had linguistic and cultural links. It was necessary for the Governor General Lord North Brook to come down to Sylhet to pacify the people. In 1905, when the new Muslim majority Province of East Bengal and Assam was created, Sylhet was again included in Chittagong Division of the new province but the abrogation of the new province again transferred this*

district to the province of Assam in 1911, and Sylhet remained a part of Assam province till 1947.[১৯]

রেলওয়ে লাইন নির্মাণ

ব্রিটিশ চা-করগণ কর্তৃক আসাম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত তাদের চা বাগান থেকে চা রপ্তানির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানালে প্রধানত তাদের স্বার্থে সরকার ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির অধীন মিটার-গেজ রেল লাইন নির্মাণে উদ্যোগী হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আখাউড়া-করিমগঞ্জ লাইন চালু হয়।[২০] ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে চালু হয় শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ রেললাইন এবং পর বৎসর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চালু হয় শায়েস্তাগঞ্জ-বাল্লা রেললাইন।[২১] শায়েস্তাগঞ্জকে জংশন করে হবিগঞ্জ ও ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী বাল্লাগামী যে দুটি লাইন নির্মিত হয় তন্মধ্যে বাল্লার দূরত্ব ১৭ মাইল ও বরাক নদীর তীরবর্তী হবিগঞ্জের দূরত্ব ছিল ৯ মাইল।[২২]

প্রধান রেল লাইনটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১৩৫ মাইল দূরত্বে হবিগঞ্জ অঞ্চলের কাশিমনগর পরগণাধীন হরষপুর এলাকায় প্রবেশ করে ১৭০ মাইল দূরত্বে রসিদপুর এলাকা হয়ে সিলেটের দিকে হবিগঞ্জ ত্যাগ করেছে। প্রতিষ্ঠাকালে এই ৩৫ মাইলে চট্টগ্রাম থেকে ১৪২ মাইল দূরত্বে মনতলা, ১৪৭ মাইল দূরত্বে ইটাখলা, ১৫৫ মাইল দূরত্বে শাহাজীবাজার, ১৬০ মাইল দূরত্বে শায়েস্তাগঞ্জ, ১৬৫ মাইল দূরত্বে দারাগাঁও ও ১৬৮ মাইল দূরত্বে রসিদপুর স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩] পরবর্তীতে হরষপুর, কাসিমপুর, শাহপুর, তেলিয়াপাড়া, ছাতিয়াইন, সুতাং, লস্করপুর ও ষাটিয়াজুড়ি স্টেশন স্থাপিত।

তথ্যনির্দেশ:

১. ড. এম এ রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৮১। পৃষ্ঠা ৫১৬

২. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 79

৩. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ*, *দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৭

৪. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ৬৩। সৈয়দ মোস্তফা কামাল *সিলেট বিভাগের পরিচিতি* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩৩) '৬ ফেব্রুয়ারি' উল্লেখ করেছেন।

৫. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ*, *দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৮

৬. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩। এর অন্তর্গত জেলাসমূহ হল: **সুরমা উপত্যকা–** শ্রীহট্ট ও কাছাড়। **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা–** গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, দরঙ্গ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর। **পার্বত্য প্রদেশ–** গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুসাই পাহাড়।

৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৮

৮. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 352

৯. *Ibid*, Page, 353

১০. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ১৬৪। সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (পৃষ্ঠা ৩৯০) ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৯৯৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে হবিগঞ্জ সাব-ডিভিশনের কার্যক্রম শুরু হয় বলা হয়েছে।

১১. ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা।* পৃষ্ঠা ৩১৮

১২. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩০৯ (ফুটনোট-২)।

১৩. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৯

১৪. রব্বানী চৌধুরী, *মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা ২০০০। পৃষ্ঠা ১১

১৫. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩

১৬. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *সিলেট বিভাগের পরিচিত*, রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৩

১৭. ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রকাশনায় : আলহাজ্ব এম. এ. সাত্তার ১৯৯১। পৃষ্ঠা ১১৮

১৮. মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা, *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫

১৯. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 79

২০. *Ibid,* Page, 174

২১. *Ibid,* Page, 175

২২. *Ibid,* Page, 176

২৩. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ-প্রথম ভা*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজ ব্যবস্থা

নানা নৃগোষ্ঠী ও আর্য-অনার্যের সম্মিলনে প্রাগৈতিহাসিক কালেই যে সঙ্কর সম্বন্ধীয় বাঙালি জাতি-সমাজের উদ্ভব হয় ইতিহাসকালে তার সাথে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আরো কিছু উপাদানের মিশ্রণ ঘটে। বাংলাদেশ এ প্রক্রিয়ার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। হবিগঞ্জ অঞ্চল এরই অংশমাত্র বিবেচিত হলেও সমগ্র দেশের বিবেচনায় এখানকার চিত্র কিছুটা ভিন্ন মাত্রাবহ। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ জাতিসত্তার ক্রম-বিবর্তনের বিষয়ে প্রথম খণ্ডে যে আলোচনা হয়েছে তার আলোকে এক্ষণে হবিগঞ্জ অঞ্চলে সমাজ বিবর্তনের আধুনিক ধারা ও এর উপাদান-উপকরণ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

সমাজ হচ্ছে সেই সংগঠন যার মাধ্যমে দলগত ভাবে মানুষের কর্ম-পেশা, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির নিরিখে সামগ্রিক আচার-ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ন সাধনের সার্থক ক্ষেত্র বিশেষ। জীবনবোধের তাগিদে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে মানুষ নিজেদের সুবিধার কথা ভেবে দলীয় বা গোষ্ঠীগত ভাবে তাদের আচরণকে ধাপে ধাপে প্রগতির পথে চালিত করতে সচেষ্ট এবং সক্ষম হয়েছে। এক সময়ে প্রতিটি খণ্ডিত সমাজ পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বৃহত্তর মানব সমাজের সৃষ্টি করেছে। সমাজ ব্যবস্থার এই ক্রমোন্নয়নের পথ পরিক্রমায় মানুষের আচার-আচরণের যেমন উন্নয়ন ঘটেছে তেমনি অনাচারের ভয়াবহতাও কম ছিল না। এ ক্ষেত্রে ধর্ম যুগে যুগে নৈতিকতা ও অনৈতিকতার তফাৎ বিশ্লেষণ করে শুদ্ধির পথ প্রদর্শনে ভূমিকা রেখেছে। ধর্মের এই মহত্ত অদ্যাবধি সমাজকে সুপথে চালিত করতে সক্রিয়। অবশ্য কিছু কিছু গোরামী বা কুসংস্কার যে, ধর্মের অমিয় বাণীকে কলুষিত করছে না, তাও বলা যাবে না।

সমাজ ব্যবস্থার প্রাগৈতিহাসিক ধারণা থেকে উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে সুস্পষ্ট ভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকার পরিচিতি নেই। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর যাযাবর প্রবণতায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রগতির অধিষ্ঠান হয়েছে। তাদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর সংঘর্ষ-সম্প্রীতি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে প্রাগৈতিহাসিক কালেই এ অঞ্চলে যে সঙ্কর সম্বন্ধীয় নতুন জাতি সত্তার সৃষ্টি হয়েছে সে জাতি-সমাজের নাম বাঙালি। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। প্রাচীন সিলেট অঞ্চলে যে বৌদ্ধ ধর্মমতের শক্ত ভিত্তি ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। হবিগঞ্জবাসী সেই বাঙালি জাতি-সমাজের অংশ বিশেষ।

বাংলাদেশে গুপ্ত শাসনামলে আসে ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী। সে কালে হবিগঞ্জ অঞ্চল সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রতুলতা এ আলোচনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে। তবে এখানকার সমাজব্যবস্থা যে এককালে উপজাতীয় ভাবধারার ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও সামগ্রিকভাবে তাতে সামাজিক বিবর্তন হয়নি। পরবর্তীতে ষষ্ঠ শতাব্দীর নিধনপুর তাম্রশাসন

ও দশম শতাব্দীর পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনোক্ত দানপত্রের বলে সৃষ্ট অভিবাসন প্রক্রিয়ায় এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশে যে ৪১টি মিশ্র বা সঙ্কর সম্বন্ধীয় শূদ্র জাতির উল্লেখ করেছেন,[১] তাদের মধ্যে উত্তম সঙ্কর: তন্তুবায়, গান্ধিকরণিক, নাপিত, গোপ (লেখক), কর্মকার, তৌলিক (সুপারি-ব্যবসায়ী), কুম্ভকার, কংসকার, দাস (কৃষিজীবি), বারুজীবি, মোদক, মালাকার, সূত, ও তাম্বুলী; মধ্যম সঙ্কর: তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শেখর, জালিক ও নিম্ন সঙ্কর: চণ্ডাল, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী ও মল্ল প্রভৃতি ৩০টি জাতি তখন হবিগঞ্জ অঞ্চলেও বসবাসরত ছিল। এরা সবাই নিগৃহীত শ্রেণির পেশাজীবী হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ।

পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে এ সব পেশাজীবীদের প্রায় সবারই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই তাম্রশাসনের ক্ষেত্র যে হবিগঞ্জ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[২] পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে 'বঙ্গালদেশীয়' ও 'দেশান্তরীয়' ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানপত্রে সংশ্লিষ্ট উপাধ্যায় ও ৩৬ জন ব্রাহ্মণের নামোল্লেখে নানা গোত্র, নানা প্রবর, চতুর্বেদের নানা শাখাধ্যায়ী ছয় হাজার জনকে[৩] দান করত তাদের অভিবাসনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত উপজাতীয় ভাবধারার সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে একটি পরিমার্জিত ও নবতর সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের পর তা আদ্যমাটী এলাকায় বিস্তৃত হয়। সিলেট অঞ্চলে আদ্যমাটী বলতে তরফকে বুঝাতো। সেখানে বৌদ্ধ যোগীদের আবাস ছিল। সেখান থেকে যে বৌদ্ধরা সিলেট শহরে গিয়ে ছোটখাটো আবাস গড়ে তুলেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন গবেষক আসাদ্দর আলী। পণ্ডিত মথুরা নাথ'র উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, '*তরফ ব্যতীত শ্রীহট্ট শহরের মীনারের টিলায় বৌদ্ধ-যোগীদের আর একটি ছোট খাটো আবাস ভূমি ছিল।*'[৪]

এক সময়ে এ অঞ্চলে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ বিরল নয়। জানা যায়, 'আদ্য ও পূর্বমাটী মহাযান বৌদ্ধদিগের একটি প্রাচীন প্রচার কেন্দ্র ছিল।'[৫] গোপীচন্দ্রের গীতিকায় বলা হয়েছে:

আদ্য মাটী আছে কিছু মেহেরকুল নগরে,
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর শহরে।
আর আছে আদ্য মাটী তরফের দেশ,
চাটীগ্রাম পূর্ব মাটী জানিবা বিশেষ।

সম্ভবত দশম-একাদশ শতকে বৌদ্ধগুরু মীননাথ সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, লোকায়ত ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয়ে নাথ ধর্মমতের প্রচার করেন। হবিগঞ্জ অঞ্চলে এ ধর্মমতের প্রসার ঘটেছিল। এ সময়ে যে সব বৌদ্ধরা ধর্মমত ত্যাগ করেনি তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর আশ্রয় করে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষায় ব্রতী ছিলেন। তবে তখন সবাই যে ব্রাহ্মণ্যবাদের আবেষ্টনেই সমাজকর্ম পালনে বাধ্য ছিল তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এভাবেই এখানে প্রাক-আর্য ধর্ম, সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং নাথ ধর্মমতের সংঘর্ষ-সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি হিন্দু মতাদর্শভিত্তিক নতুন সমাজ-সংস্কৃতি। ফলে ধর্মীয়

বিভাজন সত্ত্বেও সামাজিক সংস্কৃতিতে বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। তবে এতদসত্ত্বেও ধর্মীয় বিভেদের বিষবৃক্ষটি তখনও নিরাপদেই ছিল।

শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু এ বিষয়ের বর্ণনায় বলেছেন,

> *বহুবিধ উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত এই হিন্দু ধর্ম বাঙালীর সমাজ-দেহকে নানাভাবে পুষ্ট করেছিল বলে বলা হয়ে থাকে। তবে সেই সঙ্গে সমাজ-দেহকে প্রদুষ্ট করে বর্ণভেদ অর্থাৎ মানুষে মানুষে ভেদাভেদের অবমাননাকর পরিস্থিতির সৃষ্টিও যে এই ধর্মই করেছিল, অস্বীকার করার উপায় নেই।*[৬]

এ ধারায় এতদাঞ্চলেও বর্ণভেদপূর্ণ যে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে তাতে যুক্ত হয় ত্রয়োদশ শতকের মুসলিম প্রভাব। পূর্ব থেকেই আরব বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু কিছু মানুষ এদেশে এসে বসতি স্থাপন কালে তাদের সাথে সূফী-দরবেশগণেরও আগমন ঘটেছিল। পাশাপাশি তখন থেকে এদেশে মুসলিম সামরিক অভিযানেরও সূত্রপাত হয়। বাণিজ্য, ধর্ম প্রচার এবং যুদ্ধ বিগ্রহের পথ ধরে আগত মুসলমানদের বৈষম্যহীন জীবনাচারে বর্ণবাদের যাতাকলে পিষ্ট স্থানীয় হিন্দু সমাজে ব্যাপক ভাবে ধর্মান্তরের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনকারী মুসলমান ও স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সমন্বয়ে এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। উদ্ভব হয় ভারসাম্যপূর্ণ এক নতুন সংস্কৃতির। মোগল আমলে পাঠান বাহিনীর অভিবাসনের ফলে এ সমাজ আরো সমৃদ্ধ হয়।

আরব দেশ থেকে হযরত শাহজালাল (রঃ) বহু সূফী দরবেশ নিয়ে সিলেট অঞ্চলে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্ম প্রচারসহ বসতি স্থাপন করেন। তাঁর সাথে আগত সুলতান শামস্ উদ্দিন ফিরোজ শাহের সেনাপতি সিকান্দর খান গাজীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর সদস্যরাও তখন থেকে এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। বহু সংখ্যক ধর্ম প্রচারক, সৈনিক ও বণিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রভাবে এতদাঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মান্তর, মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকে। এ ভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই মূল মুসলিম সমাজের সাথে বিপুল সংখ্যক ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ভিত্তিক একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। মোগল আমলে পাঠান সৈনিকদের একটি বিরাট অংশও সিলেট অঞ্চলে ঠাঁই নেয়। এভাবে এ ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে মুসলমান জাতিভিত্তিক নতুন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করে।

সিলেট অঞ্চলে বুরহান উদ্দিন-এর ঘটনা যেমন সেখানে হযরত শাহজালাল (র.)-এর পূর্ববর্তী কালের মুসলিম জনসমাজের সাক্ষ্য দেয় তেমনি সমসাময়িক কালে হবিগঞ্জ অঞ্চলেও যে মুসলিম জনসমাজ ছিল তার সাক্ষ্য দেয় কাজী নুরউদ্দীনের ঘটনা। তিনি হেলিমউদ্দীন এবং ছলিমউদ্দীন নামীয় অপর দুই ভাইসহ সপরিবারে ষাটিয়াজুরি ও চিচিরকুট গ্রামে বসবাস করতেন।[৭]

সিলেট বিজয়ের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে শুধু বুরহান উদ্দিন ও কাজী নুরউদ্দিনের দুটি পরিবারের উপস্থিতিই বিবেচনায় নেয়া ঠিক হবে না। আরো অনেক পরিবারের অবস্থান এখানে ছিল তা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। কোনো এলাকায় একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে গরু জবাই করা সে অনুষ্ঠানে লোক সমাগমের ব্যাপকতাকেই ইঙ্গিত করে। যেহেতু সে সময়ে মাংস সংরক্ষণের কোনো

ব্যবস্থা ছিল না এবং সমসাময়িক কালে মুসলমান ছাড়া গোমাংস ভক্ষণের বিষয়টি অকল্পনীয় ছিল সেহেতু উক্ত গোমাংস খাবার জন্য বেশ কিছু লোকের সমাগম হয়েছিল বা হবার সম্ভাবনা ছিল এমন মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুসলিম বাহিনীর সাথে তরফের রাজা আচক নারায়ণের যে যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধে এক সহস্র অশ্বারোহী এবং তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য অংশ নেয়।[৮] প্রায় বিনা যুদ্ধে তরফ বিজয়ের পর এই বিপুল সংখ্যক মুসলিম লস্কর বা সৈন্য যে তখন তরফ অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেছিল 'লস্করপুর' স্থান-নামের সাথেই এর সত্যতা নিহিত। যেখানে সাধারণ সৈন্যদের শিবির নির্মিত হয়েছিল সে স্থান লস্করপুর এবং যেখানে বিজীত রাজ্যের শাসন দপ্তর ছিল সে স্থান 'কোটান্দর'[৯] নামে অভিহিত হয়। এর আশপাশে সেনাদের আবাসভিত্তিক কিছু স্থান-নাম কেবল তাদের বিরাট সংখ্যারই সাক্ষ্য বহন করে না, বংশ ও পেশাভিত্তিক স্বকীয়তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: মির্জাটোলা, পাঠানটোলা, শেখযাদু টোলা, গোয়ালটোলা, দর্জিটোলা, চকজালাল ইত্যাদি। এ ছাড়া উর্দু বাজার ও বন্দর বাজার নামে দু'টি বাজারও তখন সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।[১০]

উচ্চবর্ণের নিগ্রহ ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে হিন্দু জাতীয়তাবাদে ব্যাপক ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছিল নাথ ধর্মের আবির্ভাব কালেই। কিন্তু হিন্দু সমাজ সেটাকে ভাঙন হিসেবে গ্রহণ না করে হিন্দু বলয়েরই একটি অপাংক্তেয় শাখা হিসেবে বিবেচনা করে। ফলত এ শাখাটি যেমন স্বতন্ত্র ধর্মমত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি তেমনি বর্ণবৈষম্যের কবল থেকেও মুক্তি পায়নি। তাই সাধারণ মানুষের মনে একটি ছাইচাপা আক্ষেপ সুপ্তই থেকে যায়।

তরফ বিজয় কালে সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিনের সাথে আগত বারো জন আউলিয়া এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের ভক্তকুলও বিভিন্ন এলাকায় খানকাহ বা আস্তানা স্থাপনপূর্বক ধর্ম প্রচার এবং নানা রকম জনহিতকর কার্য সম্পাদনে তৎপর হন। তাঁদের বৈষম্যহীন সর্বজনীন মানসিকতা, মহানুভবতা, হিতকর্ম ও নৈতিকতার গুণে নিগৃহীত হিন্দু সমাজের ছাইচাপা ক্ষোভ জাগরুক হয়। তারা মুসলমানদের কোরআন ও পীর-দরবেশদের প্রতি আস্থাশীল হয়। এমনি প্রেক্ষাপটে এখানে হিন্দু সম্প্রদায় এবং নাথ ও অপাংক্তেয় বৌদ্ধ সমাজের ধর্মান্তর প্রক্রিয়াটি বেগবান হয়। ওলি-দরবেশগণের প্রতি কেবল বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মুসলিমরাই না অদ্যাবধি সার্বিক হিন্দু সমাজেরও আস্থা বিদ্যমান।

একটি ক্ষুদ্র এলাকায় হঠাৎ করে বিপুল পরিমাণ মুসলিম জনসংখ্যার অভিবাসন; বর্ণ বৈষম্যহীন ইসলামী মূল্যবোধের কারণে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ধর্মান্তরিত নারীদের সাথে বহিরাগত পুরুষদের বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বংশ বিস্তারের ধারা হবিগঞ্জ অঞ্চলের সমাজচিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। যেহেতু চতুর্দশ শতাব্দীকে বাংলাদেশে মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বিবেচনা করা হয় সেহেতু নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে মুসলিম সমাজ ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্র ক্ষণেই হবিগঞ্জেও মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার বর্ণাঢ্য অভিষেক ঘটে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ধর্ম প্রচারক হিসেবে ওলি-আউলিয়াগণের নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবতাবাদী চরিত্রের কারণে তাঁদের একটি সর্বজনীন অবয়ব সৃষ্টি হয়। তাছাড়া রক্তের নৈকট্যের কারণে

ধর্মান্তরিত মুসলিম ও তাদের অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে সেতুবন্ধন জাগরুক থাকে তার প্রভাবে সর্বজনীন সমাজচিত্রে একটি ভারসাম্যের সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি ওলি-আউলিয়াগণের সর্বজনীন চরিত্র, বৈষম্যহীন মুসলিম আচার-আচরণ এবং শিক্ষা বিস্তারমূলক কার্যক্রম এতদাঞ্চলের ধর্মীয় বিভেদকে সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে নবসৃষ্ট মুসলিম ও স্থানীয় অমুসলিম সমাজ ব্যবস্থার যুগল প্রয়াসে ধর্মীয় সংস্কৃতির সমান্তরালে একটি সহনশীল সম্মিলিত সংস্কৃতিরও উদ্ভব ঘটে।

বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনাকাল বিবেচনা করলে সিলেট অঞ্চলে এর প্রভাব আরো পরের ঘটনা। এর মেজাজও ছিল কিছুটা পৃথক প্রকৃতির। সিলেটের সমাজ বিবর্তনে শাসন-নীতির চেয়ে আদর্শ-প্রচার নীতিই ছিল মুখ্য। ঐতিহাসিক কারণেই এ অঞ্চলে মুসলিম পীর-দরবেশগণের ধর্ম প্রচার নীতিতে শরিয়ত পন্থার চেয়ে সূফী আদর্শের আধিক্য ছিল। সূফী দর্শনের সাথে যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনা-মার্গের সম্পর্ক রয়েছে। আবার সূফীবাদের সাথে হিন্দু-বৌদ্ধ ভাবধারার গুরুবাদেরও সাযুজ্য ছিল। এই সূফী দর্শনই ছিল মুসলিম পীর প্রথার প্রাণ শক্তি। পীর-দরবেশদের খানকাহগুলো অনায়াসে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভরসার স্থলে পরিণত হয়।

ডক্টর এম. এ. রহিম বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> *হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মতের লোকদের মিলনকেন্দ্র ছিল এই খানকাহগুলো। এ কেন্দ্রগুলো অবারিত প্রতিষ্ঠান ও খোলাখুলি আলোচনার স্থানে পরিণত হয়। এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান একটা উদারনৈতিক ও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। ফলত উভয় শ্রেণির জনগণ একে অন্যের নিকটতর হয় এবং একে অন্যের মতামত বুঝতে পারে। এই উদার পরিবেশ সেখানে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। সূফী সিদ্ধপুরুষগণ যে উদার আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন তার ফলে হিন্দু সমাজে একটি উদার সংস্কার আন্দোলনের জন্ম সম্ভব হয় এবং এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে বৈষ্ণব ধর্মে।*[১১]

সুপ্রাচীন কাল থেকে আর্য জাত্যাভিমান প্রসূত বৈষম্যের যে খড়গ হিন্দু জাতীয়তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তার ফলশ্রুতিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার এবং নাথ ধর্মমতের উদ্ভব হলেও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে এ অঞ্চলে সাম্যের সুবাতাস বইতে পারেনি। মুসলিম বিজয়ের পর মুসলমানদের সহনশীল নীতি-আদর্শের কারণে ধর্মান্তর প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতন ধর্মের বলয় থেকেই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারমূলক বৈষ্ণব মতবাদের আবির্ভাব ঘটে। কেউ কেউ মনে করেন, এই বৈষ্ণব মতের সাথে মুসলিম সূফীবাদ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ ভাবধারার গুরুবাদের নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। অনেকে এমনও মনে করেন, হিন্দু ধর্মের বর্ণগত বৈষম্য-সংঘাতের বিপরীতে মুসলিম পীর-দরবেশগণের উদারনৈতিক সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের প্রভাবেই বৈষ্ণব মতবাদের আবির্ভাব ঘটে।

মুসলিম প্রভাবের ফলে প্রাচীন কালেই হবিগঞ্জ অঞ্চলে সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামাজিক সাম্য গড়ে উঠেছিল। সাহিত্য চর্চা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মকে পাশ কাটিয়ে সামাজিক আচার-আচরণ পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বন্ধনে বিকশিত হতে থাকে। উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির

হিন্দুরা তাদের আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে মুসলমান অভিজাত মহলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে প্রয়াসী হন। মুসলমানরাও হিন্দুদের বৈষম্যহীন উত্তম আচরণ অবলম্বনে আন্তরিক হন। এই সাম্যভিত্তিক সামাজিক আচার-আচরণের কিছুটা বিবরণ দৃষ্ট হয় জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গলে। তিনি অবশ্য ক্ষোভের সাথেই ব্যক্ত করেছেন:

ব্রাহ্মণ রাখিবে দাড়ি, পারস্য পড়িবে
মোজা পায়ে নড়ি হাতে কামান ধরিবে।
মসনবী আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর
জকাচুরি ঘাটি ঘাটিবেক নিরন্তর।

যাহোক, ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারমূলক বৈষ্ণব ধর্মমত নবদ্বীপ থেকে সিলেট পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার প্রায় সমসাময়িক কালেই হবিগঞ্জ অঞ্চলে বাঘাসুরার জগন্মোহন গোসাই কর্তৃক অনুরূপ বৈষ্ণব ভাবধারার একটি ধর্মমতের সূচনা হয়। অচ্যুৎচরণ চৌধুরী এটিকে 'সম্পূর্ণ নূতন একটি ধর্ম্মসম্পদায়' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১২] শুরুতে এ ধর্মমত তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। পরবর্তীতে এর প্রসার ঘটে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে।

জগন্মোহন গোসাইর প্রশিষ্য রিচি গ্রামের রামকৃষ্ণ গোসাই হতে এ ধর্মের বহুল প্রচার হয়। বিথঙ্গলের আখড়া এদের প্রধান তীর্থস্থান। মাছুলিয়াতেও এদের একটি আখড়া ছিল। এ ধর্মমত স্থানীয়ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবক্ষয় রোধে ভূমিকা রেখেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তৎকালে তাদের শিষ্য সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ছিল বলে অচ্যুৎচরণ চৌধুরী উল্লেখ করেন।[১৩] বিথঙ্গলের আখড়ায় তৎকালে শিষ্যদের দেয়া বার্ষিক আয় ছিল ৪০ হাজার টাকা।[১৪]

জগন্মোহন ও রামকৃষ্ণ গোসাইর ধর্মমত প্রচারের বিষয়ে বিশিষ্ট দার্শনিক ও জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> *এদের এ অভিনব ধর্ম প্রচারের ফলে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের বুকে আবার আশার সঞ্চার হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও একই ভগবান বা একই ব্রহ্মের আরাধনা করা যায় এবং জাতিভেদ প্রথা বর্জন করেও হিন্দু বলে পরিচিত হওয়া যায়– এ ভাব হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে।*[১৫]

পূর্বাপর ধারাবাহিকতায় হিন্দু-মুসলিম সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এ অঞ্চলের বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতি। এই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ধর্মীয় মতান্তরকে পাশ কাটিয়ে বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা অকপটে স্বীকার করেছেন বিপিনচন্দ্র পাল। প্রসঙ্গত তাঁর একটি বক্তব্য স্মর্তব্য। যদিও বক্তব্যটি পরবর্তী কালের তবু সামাজিক সৌহার্দ্য সম্পর্কিত অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তাঁর ধারণার প্রতিফলন ঘটেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তিনি বলেন :

> *ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত পড়িতেন। প্রত্যেক গ্রামে এজন্য টোল ও ফার্সি শেখার জন্য মাদ্রাসা বা মোক্তব ছিল। অনেক সময় এ সকল মাদ্রাসা গ্রামের মসজিদের সঙ্গে যুক্ত থাকিত। মসজিদের ইমাম বা অন্য কোনো মৌলবী শিক্ষকতা করিতেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে*

ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার ছিলনা। হিন্দু বালকেরাও মুসলমান মৌলবীকে শিক্ষাগুরুর প্রাপ্য মর্যাদা ও ভক্তি অসঙ্কোচে অর্পণ করিত। হিন্দুরা যেমন নিজেদের বিদ্যারম্ভে বা হাতেখড়ির সময় সরস্বতীর বন্দনা করিয়া লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করিত, সেইরূপ মাদ্রাসায় বা মোক্তবে যাইয়া ফার্সি পড়িতে আরম্ভ করিবার সময় এবং প্রতিদিনের পাঠের প্রারম্ভে কোরানের আদি কথার লা এলাহি এল আল্লা, মহম্মদ রসুল আল্লা আবৃত্তি কারত। ইহার ফলে তখনকার মধ্য শ্রেণীর হিন্দু ভদ্রলোকদিগের অন্তরে মুসলমানদিগের ধর্মের প্রতি একটা শ্রদ্ধা জন্মিত।[১৬]

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় ইংরেজ শাসনামলের প্রথমভাগে হবিগঞ্জ সংলগ্ন পৈল গ্রামের যে সামাজ-চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে কেবল হবিগঞ্জ অঞ্চলই না বরং সমগ্র বাংলাদেশের চিত্রই ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সূতিকাগার হিসেবে পৈলের সমাজব্যবস্থাকে উদাহরণ হিসেবে সর্বাবস্থায় বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিক কারণেই এক্ষণে তার কিছু অংশ চয়ন করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় সমাজের সাম্য সম্বন্ধীয় একটি চমৎকার বর্ণনা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এতে হবিগঞ্জ অঞ্চলে ধর্মীয় সম্প্রীতির যে চিত্র ফুটে উঠে তা হিন্দুদের ধর্মান্তর বিষয়ক সকল অপপ্রচারকেও নাকচ করে। তিনি বলেন :

আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে বড় মুসলমান পাড়াও ছিল। এই পাড়ায় এক মুসলমান জমিদার বাড়িও ছিল। ইহাদেরই রায়ত ও নফরেরা এই পল্লীতে বাস করতেন। পৈলের এই মুসলমান জমিদার পরিবার কুমিল্লা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজে বংশমর্যাদায় খুব বড় ছিলেন। ইহারা মুসলমান এবং আমরা হিন্দু হইলেও এই মুসলমান জমিদারের সঙ্গে আমাদের লৌকলৌকিকতায় কোনো বাধা ছিল না। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি, গার্হস্থ্য ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যে ভাবে হিন্দু আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে আমাদের লৌকিকতা আদান প্রদান চলিত, সেভাবে ইহাদের সঙ্গেও চলিত। ইহাদিগকে আমরা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী নিমন্ত্রণ করিতাম, ইহারাও আমাদিগকে সেইরূপ নিমন্ত্রণাদি করিতেন। আমরা ইহাদের বাড়িতে যাইয়া খাইতাম না, ইহারাও আমাদের বাড়িতে আসিয়া খাইতেন না। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সর্বদা আদান প্রদান হইত। মুসলমান বলিয়া আমরা ইহাদিগকে ঘৃণা করিতাম না, ইহারাও আমাদিগকে কাফের ভাবিয়া নরকে পাঠাইতেন না; উভয়ে নিষ্ঠা সহকারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করিতেন। উভয়েই এই ভাবে মোক্ষলাভ করিবেন বিশ্বাস করিতেন, একে অন্যকে নিজের ধর্মে লওয়াইতে চেষ্টা করিতেন না।[১৭]

সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে অন্যত্র বলা হয়েছে :

আমরা বাল্যে এবং যৌবনে আমাদের গ্রাম্যজীবনে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই সম্বন্ধই ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। ও পথ তাহাদের নিজের পথ নহে কিন্তু ও পথে যে পরমার্থ মেলে না এ কল্পনা হিন্দু করিতেন না। মুসলমানও সেইরূপ হিন্দুর ধর্মকে নিজে না মানিলেও সর্বদা সম্মান করিয়া চলিতেন। মুসলমান না হইলে যে মানুষ নরকে যাইবে এ সংবাদ তখনও মুসলমানের কানে পৌঁছায় নাই অথবা কোনদিন পৌঁছিয়া থাকিলেও বাঙ্গালী মুসলমান সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। মুসলমান যেমন হিন্দুও সেইরূপ মুসলমানের দরগায় শিন্নি দিত। এইভাবে ৬০/৭০ বছর পূর্বে হিন্দু ও মুসলমানে মিলিয়া বাংলার গ্রামে বাস করিত। বিষয়

আশয় জমিজেরাত লইয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইত বটে। হিন্দু মুসলমানে যেমন হইত মুসলমানে মুসলমানে বা হিন্দুতে হিন্দুতে সেইরূপই হইত। কিন্তু ধর্ম লইয়া মারামারি কাটাকাটি হইত না। হিন্দুর মধ্যে যেমন জাত আছে, একে অন্যের সাথে খাওয়া-দাওয়া বা আদান-প্রদান করে না, সাধারণ হিন্দুরা সেকালে মুসলমানদিগকে সেইরূপ ভিন্ন ভাবিত। বাংলার অনেক মুসলমানের পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। সুতরাং ইহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোনো দিন হিন্দু দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি হারান নাই। বিশেষত ইহাদের অনেকেই হিন্দু ধর্ম মিথ্যা বলিয়া পরিত্যঅগ করেন নাই, আর মুসলমান ধর্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে বা হিন্দু ধর্মের কড়াকড়িতে ইহাদের অনেকে অনিচ্ছায় মুসলমান সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান হইয়াও ইহাদের অন্তরে হিন্দু ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ জন্মে নাই। আমাদের গ্রামে এখনকার সামাজিক অবস্থা কি জানি না, কিন্তু আমার শৈশব, বাল্যে এবং প্রথম যৌবনে হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম লইয়া কোন বিরোধ ছিল না।[১৮]

হিন্দু গ্রাম সংগঠন বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পালের অভিমত :

প্রাচীনকালে কোনো নূতন গ্রাম পত্তন করিবার সময় এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। দেবকার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ, গ্রামের জমিজমার তত্ত্বাবধান ও রাজস্বাদির হিসাব রাখিবার জন্য কায়স্থ, চিকিৎসার জন্য বৈদ্য, ইহাদের পরিচর্য্যার জন্য শূদ্র, ক্ষৌরকার্য্যের জন্য নাপিত, কাপড় ধুইবার জন্য ধোপা, যজ্ঞবেদী ও প্রতিমাদি নির্মাণ ও জ্যোতিষ গণনার জন্য আচার্য্য বা গণক ছিল।[১৯]

অত্রাঞ্চলে বল্লালী কৌলিণ্য প্রথা ছিল না বলে মন্তব্য করে তিনি তৎকালীন একটি সমাজচিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

এ অঞ্চলে যাহারা যত পূর্বে আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন তাঁহাদের বংশ-মর্যাদা তত বেশি। পৈল গ্রামে আমার বাল্যকালেও দেখিয়াছি যে পালেরা এবং সেনেরা সামাজিক পংক্তি ভোজনে অগ্রণীর আসন পাইতেন। ইহা হইতে মনে হয় যে পালেরা এই গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রবীণ অধিবাসী, বোধ হয় ইহাও শুনিয়াছিলাম যে সেনেরা পালেদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পৈলে আসেন। ---বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের লোকই আমার শৈশবে বোধহয় সকলের চাইতে বেশি ছিলেন। কায়েস্থরা তখনও নিজেদের পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতেন না। বর্ণবিচারে আপনাদিগকে শূদ্রের কোঠায়ই ফেলিতেন। তবে এখানে যাঁহাদিগকে শূদ্র কহিলাম, ইহারা হয় নিজের হাতে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতেন অথবা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ভদ্রলোকদিগের পরিচর্য্যা করিতেন। ইহারা ভৃত্যস্থানীয় ছিলেন। এ শ্রেণীর শূদ্ররাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। কতকগুলি শূদ্র গ্রামের ভদ্রলোকদিগের 'নফর' ছিলেন। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রমে স্বাধীন হইয়া কৃষিকার্য্য ও ব্যাবসা-চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে আরম্ভ করেন।[২০]

পোশাক পরিচ্ছদ ও আহার-বিহার সম্পর্কে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

তখনকার দিনে মুসলিম সমাজের পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে হিন্দুদের পোষাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য খুব কম ছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত ধূতিই পরিধান করতো। জামা বা পীরান পরার রেওয়াজ গ্রামে বড় একটা ছিল না। তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিত, মাথায় ব্যবহৃত বিষয়ে। মুসলিমরা প্রায় সকলেই মাথায় দু'কল্লিদার টুপি

পরতো। অপরদিকে হিন্দু মাত্রেই ছিল অনাবৃত মস্তক। উচ্চকোটী মহলের হিন্দু সমাজের লোকদের মধ্যে চওগা, চাপকান ও মাথায় শ্যানলা ব্যবহার করার রেওয়াজ চালু ছিল। মুসলিম সমাজের সে শ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করতো আঙ্গরমা, চওগা ও মোড়াশা। অর্থাৎ নওয়াব বা আমির-ওমরাহদের দরবারে যারা যাতায়াত করতেন এবং যারা রায়রায়া হতেন, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রমেই মুসলিমদের ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদেরই এদেশীয় এক সংস্করণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আহার্য দ্রব্য উভয় সম্প্রদায়েরই ছিল সাধারণভাবে মাছ-ভাত। উচ্চশ্রেণীর মুসলিম সমাজের মধ্যে মাঝে মাঝে কোরমা, কুফতা, কালিয়া প্রভৃতি বাদশাহী খানাপিনার রেওয়াজ থাকলেও সাধারণ শ্রেণীর মুসলিমরা হিন্দুদের মতই ছিল মাছ-ভাতের উপর নির্ভরশীল।[২১]

তবে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের অনুকরণে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্রের একটি সমান্তরাল ধারাও যে বহমান ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জমিদার, মিরাশদার, তালুকদার, চৌধুরী, পাটোয়ারি প্রভৃতি পদবির ভূস্বামীগণ মোগল আমল থেকেই অভিজাত শ্রেণির কাতারে সামিল ছিলেন। তাদের প্রজা বা রায়ত শ্রেণির কৃষক ও শ্রমজীবীরা ছিলেন নিম্ন মর্যাদার মানুষ। ব্রিটিশ শাসনামলেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। অভিজাত শ্রেণি সর্বদাই তাদেরকে তুচ্ছার্থ জ্ঞান করতেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বলে দখলীয় ভূমিতে প্রজাদের অধিকার নিশ্চিত হওয়ায় কৃষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। অবহেলিত কৃষক সমাজ কেবল ভূমি বিষয়ে না, সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার পথে অগ্রসর হতে থাকে। এতে সাধারণ কৃষক ও ভূস্বামীদের মধ্যে অধিকার ও আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠে।

গ্রাম সংগঠনে সাধারণত মাতবর নামীয় সমাজপতিরা নেতৃত্ব দিতেন। নেতৃস্থানীয় এ সকল ব্যক্তিরা মূলত উচ্চবিত্তের অন্তর্গত ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত আইন বলে এ অঞ্চলে জনসমর্থনের ভিত্তিতে মাতবর মনোনয়নের ক্ষেত্র তৈরি হয়। যাদের সংখ্যা ৫ থেকে ১০ জন হতো। এসকল মাতবরগণ সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করতেন।

প্রসঙ্গত ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ নং আইন প্রবর্তনকালে সমগ্র দেশে যে কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় তাতে সিলেট অঞ্চলের তেমন সম্পৃক্ততা না থাকলেও তখন খাজনার হার বৃদ্ধি ও কৃষক সমাজের অধিকারবোধের প্রতিক্রিয়ায় হবিগঞ্জ অঞ্চলের কৃষক ও ভূস্বামীদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তার একটি চিত্র ফুটে উঠেছে 'পুটিজুরি প্রকাশ' নামক কবিতা পুস্তকে।[২২] নিম্নে সমসাময়িক কালের সমাজচিত্রমূলক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে এর প্রাসঙ্গিক অংশ চয়ন করা হল। এতে বলা হয়েছে :

পুটিজুরিবাসী যত, জমীদার মনমত,
অভিমত করিলা সকলে।
পুরকায়স্ত চৌধুরী, দৃঢ় রূপ পণ করি,
ডবল করিবে কর বলে ॥
বুঝা যাবে কিছু পাছে, সেদিন কি এখন আছে,

মিছে মিছে হবে সব সলা।
রাইয়ত জিরতে যত,   করি দৃঢ় পঞ্চায়ত,
ডবলেতে দেখাইল কলা ৷৷

বলা আবশ্যক যে, কবি নিজেও তখন একজন ভূস্বামী ছিলেন। এতে দেখা যায়, ভূস্বামীগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কর বৃদ্ধি করলে রায়তগণও সম্মিলিত ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন (ডবলেতে দেখাইল কলা)। কৃষককুলের সম্মিলিত সামাজিক প্রয়াসকে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন:

নেড়ে লোক ছিল যত,   জমীদারে করি হত,
অনাহত কটু কত কহে।
বিড়ালের অধিকার,   মূষিকে করিল ছার,
পিপীলিকা যেন গিরি বহে ৷৷

তিনি অন্যত্র বলেন:

নেকড়া নেঙ্গটী পেটে,   আহার ঘটে না ঘটে,
বুদ্ধি আর কত হবে ঘটে?
তবে যে গৌরব ঘটা,   কৌতুক বুঝিবে কেটা,
হেসে হেসে মরি বুক ফেটে ৷৷

কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তাদেরকে নাজেহাল করার জন্য মামলার মাধ্যমে শায়েস্তা করার তথ্যও এ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে কৃষকদের সামাজিক মর্যাদাবোধের প্রতি কবির যে অবজ্ঞার চিত্র ফুটে উঠেছে তা সমকালীন সকল ভূস্বামীর চেহারাকেই প্রতিনিধিত্ব করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ধর্মভিত্তিক সমাজ

এখানকার অধিবাসীরা অতীতে হিন্দু প্রধান ও বর্তমানে মুসলিম প্রধান এই দুই ধারায় বিভক্ত। হিন্দু সমাজ কৌলিণ্যের মাপকাঠিতে বিভক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রধান চার বর্ণে বিভক্ত। হবিগঞ্জ অঞ্চলে সেন রাজা বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিণ্য প্রথার কোনো প্রভাব ছিল না। এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এ দুই বর্ণের অবস্থানই দৃষ্ট হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের উপস্থিতি অনুল্লেখযোগ্য।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, *'ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলাদেশে আর যত বর্ণ আছে, সমস্তই সঙ্কর, চতুর্বর্ণের যথেচ্ছ পারস্পরিক যৌন মিলনে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণ এবং তাহারা সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত।'*[২৩]

এখানকার হিন্দু সমাজ শাক্ত ও বৈষ্ণব এ দুই ধারায় বিভক্ত ছিল। তবে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক ছিল। পাহাড়াঞ্চলে ত্রিপুর বংশোদ্ভূত তিপ্রা, খাসিয়া ও মনিপুরী জাতির লোক ছিল। তাদের সাথে এখানকার সাধারণ জনসমাজের তেমন সম্পর্ক ছিল না।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট মতে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ (বর্ণ), কায়স্ত, সাহা বা সাহু, সুবর্ণ বণিক বা সোনার, কাহার, কামার, কুমার, কুশিয়ারী, কেওয়ালী, কৈবর্ত্ত, গণক, গণ্ডপাল বা গাড়ওয়াল, গন্ধবণিক, গোয়ালা, চামার, চুনার, ঢোলি বা বাদ্যকর, তাঁতি, তেলি, দাস, ধোপা বা ধোবি, নদীয়াল (ডোম ও পাটনি), নমঃশূদ্র (চণ্ডাল), নাপিত, ভাট বা ভট্টকবি, ভূঁইমালী, ময়রা, মাহারা, মালো, যুগী, লোহাইত কুরী, বারুই, বৈদ্য, শাঁখারি, শুড়ী নামক হিন্দু বর্ণের উল্লেখ আছে।

মুসলিম সম্প্রদায় সুন্নি ও শিয়া ওই দুই ভাগে বিভক্ত। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সুন্নিগণ হানিফি, সাফি, মালিকী ও হাম্বলী এই ৪ ভাগে বিভক্ত থাকলেও হবিগঞ্জ অঞ্চলে হানিফি ব্যতীত আর কোনো উপ-সম্প্রদায় কখনও ছিল না। তবে তরফের কোনো কোনো সৈয়দ পরিবারে শিয়াদের মতো মহররমের সময়ে তাবু ও ঘোড়ার প্রতিকৃতি তৈরি করে মর্সিয়া-জারি ইত্যাদি চর্চার প্রচলন আছে। তাদেরকে অনুসরণ করে কিছু সাধারণ মানুষও এ সংস্কারের প্রতি অনুরাগ পোষণ করছেন।

অপর দিকে উক্ত রিপোর্টে (১৯০১) মুসলমানদের মধ্যে শেখ[২৪], সৈয়দ, পাঠান, কুরেশী, মোগল, গাইন, জোলা, মাহিমাল, মীর শিকারি, বেজ ইত্যাদি শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে কোনো বর্ণবাদ নেই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে গাইন, জোলা, মাহিমাল, মীর শিকারি ও বেজ সম্প্রদায়কে তুলনামূলক নিম্ন শ্রেণিরই মনে করা হয়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের এক হিসাব অনুযায়ী হবিগঞ্জের লোকসংখ্যা ছিল ৪,৮২,০৫১ জন।[২৫] ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সেন্সাস রিপোর্ট মোতাবেক মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৫,১৮,৯২৩ জনে। তন্মধ্যে মুসলমান ২,৬২,০০৪ জন এবং হিন্দু ২,৫৬,৯১৯ জন। হিন্দু ধর্মের মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব মতাবলম্বীরাই প্রধান। রিপোর্টে হবিগঞ্জে ১,৩২,৮৪৫ জন বৈষ্ণব, ২৭,১৯৪ জন শাক্ত ও ৯,৩১৩ জন শৈব মতাবলম্বীর উল্লেখ আছে।[২৬]

ধর্ম-বর্ণ সম্বন্ধীয় উপরোক্ত বিভাজনের বাইরে রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনিক কর্মভিত্তিক দেওয়ান, কানুনগো, মজুমদার, শিকদার, পাটোয়ারি, পুরকায়স্ত, মিরাশদার, তালুকদার, চৌধুরী, ভূঁইয়া, অধিকারী, কাজী, মুনশী, লস্কর প্রভৃতি পদবিধারীগণ কোনো ধর্মীয় শ্রেণি সমাজের অন্তর্ভুক্ত নন। কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এ সমস্ত উপাধি প্রদান করা হতো। পরবর্তী কালে বংশ পরম্পরায় এ উপাধির ব্যবহার চলতে থাকে।

অতীতে এখানকার পাহাড়াঞ্চলে আদিবাসী বা নৃ-গোষ্ঠীর ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। চা-বাগান প্রতিষ্ঠার কারণে ক্রমান্বয়ে এরা স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হয়। বর্তমানে বাহুবল উপজেলায় খাসিয়া, চুনারুঘাটে মণিপুরী ও সাতছড়ি পাহাড়ে ত্রিপুরা জাতির স্বল্প সংখ্যক অধিবাসী সেই প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। এছাড়া চা-বাগান প্রতিষ্ঠার সুবাদে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে

আমদানিকৃত আদিবাসী চা-শ্রমিকরা উপজাতি হিসেবে পৃথক একটি সমাজ ব্যবস্থা বহন করছে। তবে তারা এখানকার বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

ইসলামী বিধান অনুযায়ী মুসলমানিত্বের ৫টি ফরজ শর্ত হচ্ছে কলেমা, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। এর প্রথমটি হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বাধ্যতামূলক বিশ্বাসগত আচরণ। এর বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অনাবশ্যক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে মেনে চলা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। শেষের দু'টিও আনুষ্ঠানিক তবে সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল।

নামাজ একটি আনুষ্ঠানিক উপাসনা। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নির্ধারিত সময়ে দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় বাধ্যতামূলক বিধান। উক্ত নামাজ এককভাবে আদায়যোগ্য হলেও সূচনাকাল থেকেই পৃথিবীব্যাপী রেওয়াজ জামাত বা বহুজনের একত্রে আদায় করা। এই একত্রে আদায়ের জন্য প্রত্যেক পাড়া, মহল্লায় 'মসজিদ' নামক উপাসনালয় স্থাপিত হয়েছে। মসজিদে জামাতের সাথে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় একটি মুসলিম সমাজের ধর্মীয় আচার বা সংস্কৃতি। প্রতি শুক্রবার দুপুরে প্রতিটি মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় সাপ্তাহিক প্রার্থনা– মুসলিম পরিভাষায় যার নাম 'জুম্মার নামাজ'। যদিও নারী-পুরুষ সবার জন্য জামাতের সাথে নামাজ পড়ায় কোনো আপত্তি নেই, তবু সাধারণত কেবল পুরুষরাই মসজিদে নামাজ আদায় করে থাকেন।

আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হচ্ছে রোজা বা সিয়াম সাধনা। আরবি রমজান মাসব্যাপী ভোর রাতে আহারের পর সারাদিন উপোস করে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আহার গ্রহণপূর্বক রোজা খোলা এ অনুষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক রোজার পূর্বরাতে এশার নামাজের সাথে সাধারণত ২০ রাকাত তারাবীহ নামাজ আদায় রোজার অন্যতম শর্ত। এ অনুষ্ঠান মুসলমানরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আদায় করেন।

আনন্দ-উৎসব হচ্ছে ঈদ-উল-আযহা ও ঈদ-উল-ফিতর নামে দু'টি ঈদ। ঈদের মূল তাৎপর্য হচ্ছে, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে মানুষে মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধ প্রতিষ্ঠা। ঈদগাহ বা মসজিদে ধনী-দরিদ্র সকলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে জামাতের সাথে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে পারস্পরিক কোলাকুলি ও শ্রেণিমত সালাম-শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শান্তির পথে যাত্রা করা। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা এ দিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ঈদ-উল-আযহার দিনে সামর্থ্যবান সকল মুসলিম পরিবারের পক্ষ থেকে হালাল পশু কোরবানি করা হয়। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি কোরবানির তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষের অন্তরে বিদ্যমান পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করা। বিধানানুযায়ী এ দেশে একজন মানুষের জন্য একটি ছাগল কোরবানি করা ওয়াজিব। একটি গরু বা মহিষে সাত জন মানুষের কোরবানি আদায় হয়। কোরবানি দাতারা পশুর মাংস তিন ভাগ করে এক ভাগ দরিদ্র ও এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বণ্টন করেন। বাকি এক ভাগ নিজেরা ভক্ষণ করে থাকেন।

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ঘরে ঘরে চলে নতুন জামা-কাপড় কেনার ধুম। ঈদের দিনে নতুন জামা পরে মানুষ ঈদগাহে নামাজ আদায় করে পারস্পরিক কোলাকুলি, সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সাম্যের জয়গান গায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বাড়িতে চলে অতিথি আপ্যায়নের আনুষ্ঠানিকতা।

শবে কদর, শবে বরাত, শবে মেরাজ, আশুরা দিবসের আনুষ্ঠানিকতাও এখানকার মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূণ্য লাভের আশায় প্রায়শ মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বারো আউলিয়ার মুল্লুক হিসেবে ওলি-আউলিয়াগণের মাজারে মাজারে ওরস পালনের রেওয়াজ চালু হয়েছে এখানে চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই। এ সকল ওরস উপলক্ষে প্রতিটি মাজারে নির্ধারিত দিনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অগণিত নারী-পুরুষের ঢল নামে। দেহতত্ত্ব বা মারেফতি গান-বাজনার মাধ্যমে এ সকল ওরস পালিত হয়। মৃতের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে মিলাদ-মাহফিল, জিয়াফত, ওয়াজ-নসিহত করা হয়। এছাড়া বিবাহ, আকিকা, খাতনা, প্রভৃতি অনুষ্ঠান এখানকার মুসলিম সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে গেছে।

হিন্দুদের ধর্মমতে বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়। শিব ও কালীর পূজা ছাড়াও তারা বহু দেবদেবীর পূজা করে। দুর্গাপূজা তাদের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সবাই দুর্গা পূজায় বিশেষ আগ্রহী। শৈবদের বারুণী অনুষ্ঠান এবং বৈষ্ণবদের ঝুলনযাত্রা ও রথযাত্রার অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক সমাগম হতো। মনসা পূজা, লক্ষীপূজা, স্বরস্বতী পূজা, ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি তারা ঘটা করে পালন করে। মাঘী সংক্রান্তি, নৌকাপূজা ও গোবিন্দকীর্ত্তন এ অঞ্চলের বিশেষ ধর্মোৎসব ছিল। সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপূজা, অবিবাহিতা বালিকাদের মাঘব্রত এবং নারীদের সূর্যব্রতেরও বিশেষ প্রচলন ছিল।

দশহরা ও অষ্টমী স্নানকে তারা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করে। কোনো নদীকে পবিত্র মনে করে মাঘী-সপ্তমী-স্নান, দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি উৎসব সর্বত্র প্রচলিত।

হিন্দু ধর্মীয় সমাজে বৈষ্ণব মতবাদ একটি উপ ধর্মমত হিসেবে স্বীকৃত। এর মধ্যে জগন্মোহনী সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদের সূতিকাগার হবিগঞ্জ। এখানে কেবল এর সূচনাই হয়নি বিকাশও ঘটেছে। যার ধারাবাহিকতায় বিথঙ্গলের আখড়া, মাছুলিয়ার আখড়া আজও এর সাক্ষ্য বহন করছে।

তথ্যনির্দেশ:

১. 'করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গান্ধিকরণিক, নাপিত, গোপ (লেখক), কর্মকার, তৌলিক (সুপারি-ব্যবসায়ী), কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খিক, দাস (কৃষিজীবী), বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত ও তাম্বুলী – এই কুড়িটি উত্তম সঙ্কর। তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক – এই বারটি মধ্যম সঙ্কর। মলেগ্রহি, কুড়ব, চণ্ডাল,

বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী ও মল্ল – এই নয়টি অধম সঙ্কর। সূত্র: বাংলা দেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, সপ্তম সংস্করণ ১৯৮১। পৃষ্ঠা ২৩৮

২. কমলাকান্ত গুপ্ত 'শ্রীহট্টে প্রাপ্ত তাম্রশাসনাবলী' প্রবন্ধে পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন সম্পর্কে লিখেছেন, শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ (বা চন্দ্রপুর) তাম্রশাসন তদীয় রাজত্বের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির (প্রদেশের) অন্তঃপাতি শ্রীহট্ট মণ্ডলের (বিভাগের) অন্তর্গত উপকূলীয় দ্বীপসমেত চন্দ্রপুর, গরলা ও পোগার নামক তিনটি বিষয় (জেলা) সম্বন্ধীয়। ৩টি বিষয় বা জেলার সীমানা সম্পর্কে বলা হয়েছে, পূর্বদিকে 'বৃহৎকোট্ট' (বড়দুর্গ), দক্ষিণে মনি নদী, পশ্চিমে 'জুজু' ও 'কাষ্ঠপরণি' খাল এবং 'বেত্রঘটি' নদী এবং উত্তরে প্রবাহিত 'কুশিয়ারা' নদী। তিনটি বিষয় ছিল পরস্পর সংলগ্ন এবং সাধারণভাবে 'চন্দ্রপুর' নামে পরিচিত। উক্ত বর্ণনায় গরাল, পোগার ও চন্দ্রপুর এর সাথে 'সতলবর্গ' নামক স্থানের উল্লেখ আছে। অপরদিকে পশ্চিমে 'কাষ্ঠপরণি' খালেরও উল্লেখ আছে। এ দুটি নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে দুটি নাম মাধবপুর থানা সদরের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যায় তা হচ্ছে– 'সাতবর্গ' ও 'কাষ্টি' গাঙ। সাতবর্গ (ব্রাক্ষণবাড়িয়া) মাধবপুর বাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং কাষ্টি মাধবপুরের অন্যতম নদী। যদি পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'সতলবর্গ' এবং 'কাষ্ঠপরণি' খালের সাথে যথাক্রমে 'সাতবর্গ' এবং 'কাষ্টি' গাঙ অভিন্ন হয় তবে সমগ্র হবিগঞ্জ জেলা বৃহত্তর চন্দ্রপুর বিষয়ান্তর্গত শ্রীহট্ট মণ্ডলের অধীন এবং পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনের ক্ষেত্র ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। বিষয়টি হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রথম খণ্ডের 'প্রচীন বঙ্গে হবিগঞ্জ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' শিরোনামে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড*। এ গ্রন্থের 'প্রচীন বঙ্গে হবিগঞ্জ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' শিরোনামে বিস্তারিত ভাবে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

৪. মুহম্মদ আসাদ্দর আলী, *চর্যাপদে সিলেটী ভাষা*, প্রকাশক: আব্দুল নূর ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৫

৫. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৪

৬. শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু, প্রবন্ধ: ধর্ম ও ধ্যান-ধারণা, *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, সম্পাঃ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া ও অন্যান্য, জেলা পরিষদ, কুমিল্লা ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ২০০

৭. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৩৬

৮. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৪২

৯. কোট শব্দের অর্থ হচ্ছে নগর বা দুর্গ। কোট + অন্দর = কোটান্দর।

১০. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৪৬

১১. ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি ১৯৮২। পৃষ্ঠা ১২৭-২৮

১২. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, প্রথম ভাগ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৬০

১৩. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৬১

১৪. ওয়াকিল আহমদ, প্রবন্ধ: সিলেটে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য, *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি। পৃষ্ঠা ৪৫৫

১৫. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ৯৬

১৬. বিপিনচন্দ্র পাল, *সত্তর দশক : আত্মজীবনী*, যুগযাত্রী প্রকাশনী, কলিকাতা ১৩৬২। পৃষ্ঠা ২৭

১৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৯

১৮. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২০-২১

১৯. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১

২০. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৩-১৪

২১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ১০১-১০২

২২. পুটিজুরি পরগণার ঐতিহাসিক বিবরণমূলক গুরুনারায়ণ কর বিরচিত 'পুটিজুরি প্রকাশ গ্রন্থটি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য অংশ পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

২৩. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬। পৃষ্ঠা ৫৭৬

২৪. তৎকালে মুসলমানরা নামের পূর্বে সবাই শেখ উপাধি ধারণ করতেন। এ জন্যে রিপোর্টে শেখ সম্প্রদায়ের লোক সংখাই সর্বাধিক দৃষ্ট হয়।

২৫. মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ, *শ্রীহট্ট দর্পণ*, উৎস সংস্করণ ২০০২, পৃষ্ঠা ২৮

২৬. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৫৯

সপ্তম অধ্যায়

অর্থনৈতিক অবস্থা

এ অঞ্চলের প্রাচীন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন তথ্য জানা যায় না। ঔপনিবেশিক আমলে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার জেলাগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করে প্রতি জেলায় একজন করে কালেক্টর নিয়োগ করতঃ প্রতিটি জেলা ও পরগণার ইতিহাস, অর্থনীতি ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সিলেটের অর্থনীতি সম্পর্কে প্রথম তথ্যানুসন্ধান শুরু হয় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জেলার অর্থনীতি, রাজস্ব ও অন্যান্য সম্পদ বিষয়ে যে রিপোর্ট তৈরি করে তাতে সম্পূর্ণ জেলাভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, তখন সিলেট জেলায় ভূমিতে কৃষকদের কোনো অধিকার ছিল না। তারা তালুকদারদের অধীনস্থ ছিলেন। তালুকদারদের কাছ থেকে চুক্তি মোতাবেক ফসলের বিনিময়ে বর্গা চাষ করতেন।

তখন অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি ছিল কৃষি। কৃষির আনুষঙ্গিক উপাদান ও সম্পদ হিসেবে গবাদি পশু ছিল উল্লেখযোগ্য। নবীগঞ্জ ও আজমিরীগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে ঘি উৎপাদন হতো। জেলার অধিকাংশই নিচু তথা হাওর এলাকা বিধায় মৎস্য আহরণ, শুঁটকি হিসেবে প্রক্রিয়াজাত এবং বাজারজাতকরণ ছিল দ্বিতীয় পেশা। এখানকার শুঁটকি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হতো।

কৃষি ব্যবস্থা

এখানকার জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে কৃষি। আবার কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধানই প্রধান ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ এলাকা নিম্ন জলাভূমির অন্তর্গত হওয়ায় ভূমি খুবই উর্বর। অনায়াসেই প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো। উৎপাদন কাল বিবেচনায় ধান আউশ, আমন ও বোরো এই ৩টি ভাগে বিভক্ত।

জমিগুলোরও কিছুটা প্রকারভেদ ছিল। যে সকল এলাকায় ঘরবাড়ি বিদ্যমান সেগুলো টানের জমি বা উঁচু জমি। তারপর থেকে জমি কিছুটা ঢালু হয়েছে। বসতি বা উঁচু জায়গার পরের যে জমি, তাকে জেরের জমি বলা হতো। জেরের জমি থেকে ক্রমান্বয়ে নিচু হয়ে বিল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিকে শাইল বা বোরো জমি বলা হতো। এরপর যে অংশ থাকে তা হচ্ছে বিল। হাওরের কৃষকরা জমির এই শ্রেণিবিভাগ মত মৌসুম ভিত্তিক উপযোগী কৃষি শস্য চাষাবাদ করেন।

ধানের জাতগুলোর মধ্যে আউশ শ্রেণির ধান হচ্ছে : চেংরী, আড়াই, মুরালী, ধুমাই, ষাইট্টা, কাশিয়াবিন্নি, ইত্যাদি। আমন : দুধ লাকী, দুধ সাগর, গুয়ার শাইল, ধলা আমন, আগুনী, আখনী শাইল, নাগ্রাশাইল, লতি শাইল, কালিজিরা, মধুমালঞ্চ, লুঞ্জবাইন, কার্তিক শাইল, কার্তিয়া ভোগ,

গদা লাকী, বিন্নি, মিহি, চিনিগুড়া ইত্যাদি। বোরো : শাইল, তুলসি মালা, বাঁশফুল, লাখাই, আখনি শাইল, রাতা শাইল, খৈয়া বোরো, বিচি বোরো, চৌধুরী শাইল, কইন্যা শাইল, লাল টেপি, টেপি বোরো, রাতা রোরো, পশু শাইল, বিন্নি ইত্যাদি।

এছাড়া পাট, তামাক প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে ফলানো হতো। বেশির ভাগ হাওরেই উঁচু বা কান্দা জমি এবং গ্রামাঞ্চলের চারা (বিছড়া) জমিতে কার্তিক থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে চাষ করা হতো কালো বেগুন, টমেটো, চীনাবাদাম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, মুকি, উরি(সীম), মূলা, গোল আলু, মিষ্টি আলু, রামাইশ(বরবটি), করল্লা, কইডা, কাঁকরোল, ঝিঙ্গা, ঢেরস, ডুগি(ডেঙ্গা)সহ বিভিন্ন সবজি চাষ হতো। সরিষা, তিসি, তিল, কলাই, মুগ ছাড়াও মরিচ, ধনিয়া, হলুদ, আদা, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি মসলাও উৎপাদন করা হতো।

খাসিয়ারা পাহাড়ে পান চাষ করতো। সমতল ভূমির বিভিন্ন এলাকায় পান চাষের বরজ ছিল। জমির উপযোগিতা, বাজার চাহিদা ও কৃষকের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে এই কৃষি বৈচিত্র্যের সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে তা ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে।

রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনের সাথে জড়িত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা ছাড়া অধিকাংশ মানুষই জীবিকার তাগিদে কৃষি ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিলেন। এখানে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর চাষ হতো। তরফাঞ্চলে ইক্ষু ছিল দ্বিতীয় স্থানীয় পণ্য। নদীর তীরে শন জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদের চাষ হতো যার আঁশ দ্বারা জাল তৈরি করে বিক্রি করা হতো। পার্বত্য ভূমিতে উপজাতীয়রা কার্পাসের চাষ করতো।

তরফে প্রচুর আম ফলতো এবং সুমিষ্ট হিসেবে এর খ্যাতি ছিল। কাঁঠাল ছিল দ্বিতীয় বৃহৎ উৎপাদিত ফল। তাছাড়া জাম, কলা, বেল, পেঁপে, শফরি, তেঁতুল, চালতা, আমড়া, লেওইর, ডেফল, টেকরই প্রভৃতি ফল প্রচুর উৎপাদন হতো।

হাওর এলাকা ছিল মৎস্য সম্পদে পরিপূর্ণ। মৎস্য আহরণ ও ব্যবসার সাথে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা জড়িত ছিলেন। তৎকালে বর্তমান কালের ন্যায় ইজারা পদ্ধতি ছিল না বিধায় কেবল হাওরেই না উঁচু এলাকার খাল-জলাশয়েও প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। হাওর এলাকার নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষের প্রধান পেশাই ছিল মাছ আহরণ ও হাটে-বাজারে বিক্রি করা। অতিরিক্ত মাছ ধরা পড়লে কম দামের ভয়ে তারা শুঁটকি করে মজুদ ও বিক্রি করতেন।

শূদ্র শ্রেণির হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ পেশার পাশাপাশি কৃষির সাথেও কমবেশি জড়িত ছিলেন। নৌকার কদর ছিল সব সময়ই। এখানে কাঠ সহজলভ্য হওয়ায় বিভিন্ন স্থানে নৌকা তৈরির ব্যবসা গড়ে উঠে। এখানকার 'পলওয়ার' নামক নৌকা প্রসিদ্ধ ছিল। কচুয়াদি গ্রামে উৎকৃষ্ট বেহালা তৈরির শিল্প ছিল।[১]

বিভিন্ন রকমের কুটির শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন এলাকার মানুষ জড়িত ছিলেন। তরফের চিড়া, লাকড়িপাড়ায় মুসলমানগণ রাক্ষারঞ্জিত লাঠি, রঙিন বাক্স, বল্লম ও ছাতির বাঁট তৈরি হতো। মাধবপুরের ফিল্টার, বেঙ্গাডুবার মাটির তৈরি পাতিল, হবিগঞ্জের লুকরা ও তরফের মাটির তৈরি বাসনপত্রের সমগ্র জেলায় খ্যাতি ছিল।[২] মাধবপুরে পিতল ও কাঁসার তৈজসপত্র তৈরি হতো।

লস্করপুরের সোনা-রূপায় গিলটির কাজ (ivory-ware)[৩] এবং লার চুড়ি[৪] অতি চমৎকার এবং প্রসিদ্ধ ছিল।

এ অঞ্চলে তাঁত শিল্পের সুনাম ছিল। মহিলারা চরকা দিয়ে সুতা কাটতে জানতেন। লস্করপুরের উর্ণি চাদর ঢাকাই উর্ণি চাদরের চেয়ে কোনো অংশেই নিম্নমানের ছিল না। সেখানকার ছিলিমনগরের তাঁতিরা তাদের নিজের প্রস্তুত তাঁতে এই দামি চাদর, ধুতি ও শাড়ি প্রস্তুত করতেন। তখন এসব ধুতি-শাড়ির এতটাই কদও ছিল যে, একজোড়া ধুতি ১০ টাকা, শাড়ি ১২ টাকা বিক্রি হতো।[৫]

মাছুলিয়া, হিয়ালা, জলসুখা প্রভৃতি এলাকার নমঃশূদ্র লোকেরা গুটিপোকা পোষে তদ্বারা প্রস্তুত সুতায় এণ্ডি বস্ত্র তৈরি করতেন। এণ্ডি রেশম সুতার ধুতি মুগার ধুতি নামে পরিচিত ছিল। এ সমস্ত ধুতি ৮/১০ বছর অনায়াসে ব্যবহার করা যেতো।[৬]

বানিয়াচং অঞ্চলের ভাট বা ভট্ট জাতীয় লোকেদের পেশা ছিল কবিতা ও গান রচনা এবং গাওয়া। তাদের এসব রচনায় পৌরাণিক ও লৌকিক বিষয়ের যেমন ব্যঞ্জনা ছিল তেমনি ঐতিহাসিক উপাদানও ছিল। যাত্রা ও ঘাটু গানের মাধ্যমে উপার্জনের প্রবণতাও হবিগঞ্জে ছিল।

ভূঁইমালীরা পাল্কি বহন ও মাটি খনন করতেন। কুরীরা খই-চিড়া প্রস্তুত করে বিক্রি করতেন। মুসলমানদের মধ্যে নিম্ন শাখার জোলা, নাগারছি, গাইন, মীরশিকারী, বেজ প্রভৃতি নিজ নিজ পেশায় জীবিকা নির্বাহ করতেন।

এ অঞ্চলের পাহাড়ে অনেকগুলো চা বাগান রয়েছে। পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও ছন (খড়) উৎপন্ন হতো। যার দ্বারা গ্রামাঞ্চলের গৃহাদি নির্মাণ করা হতো। ঘুঙ্গিয়াজুরি হাওরে উৎকৃষ্ট শুক্তি ও করাঙ্গী নদীর ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যেতো।[৭]

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই সস্তা। তখন টাকায় দেড় মণ চাউল পাওয়া যেতো। ঘৃতের সের ছয় আনা, তেলের সের তিন আনা, দুধের সের দুই পয়সা ছিল। কোনো কোনো গ্রামে দুধ বিক্রয়ই হতো না। মাসে এক টাকা খরচে একজন মানুষ সচ্ছলভাবে চলতে পারতেন। শ্রমিকের মাসিক বেতন ছয় আনা থেকে বারো আনা ছিল। জমির মূল্য এমন ছিল যে, এক কেদার ভূমি দশ টাকার উর্ধ্বে বিক্রি হতো না।[৮]

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের বিবরণ অনুযায়ী চাউলের মূল্য ছিল সর্বনিম্ন। তখন টাকায় সাড়ে ৪ মণ চাউল পাওয়া যেতো। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে টাকায় ২ মণ; ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ৩১ সের; ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ১১ সের; ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৩৮ সের; ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ সের; ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৩৭ সের; ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৯ সের; ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ২০ সের চাউল পাওয়া যেতো। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গড়ে টাকায় সাড়ে ৮ সের, ১৮৮২ থেকে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টাকায় ১১ সের, ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টাকায় ১০ সের, ১৯০২ থেকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টাকায় সাড়ে ১০ সের লবণ পাওয়া যেতো। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ১টি সাধারণ ধুতি, শাড়ি ও কুর্তা বারো আনা কওে বিক্রি হতো। একটি গরম চাদরের মূল্য ছিল ৪ টাকা।[৯]

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল চার আনা। মজুরের মাসিক বেতন খাদ্য ছাড়া ছয় টাকা থেকে ৮ টাকা এবং খাদ্য ও কাপড়সহ আড়াই টাকা থেকে চার টাকা। এক-চতুর্থাংশ কৃষক ঋণজালে আবদ্ধ ছিলেন। সুদের হার শতকরা ১৮ টাকা থেকে ৭৫ টাকা পর্যন্ত ছিল। লগ্নি ধান ফসল প্রতি দেড় থেকে দিগুণ পর্যন্ত ফেরত দিতে হতো।

বিপিন চন্দ্র পালের আত্মজীবনী থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে জানা যায়ঃ তখন চাউল টাকায় ২ মণ, দুধ ১২ থেকে ১৫ সের, ঘি সের প্রতি ৮ আনা থেকে ১২ আনা, সরিষার তেল ৪ আনা ছিল। গৃহভৃত্যের মাসিক বেতন ছিল ৮ আনা থেকে ১২ আনা।[১০]

ত্রিপুরা থেকে কাঠ, বাঁশ, বেত, তুলা, তিল প্রভৃতি; বঙ্গ প্রদেশ থেকে কাপড়, লবণ, তামাক, চিনি, সরিষার তেল প্রভৃতি আমদানি হতো। ত্রিপুরাঞ্চলে কার্পাস সুতা, কাপড়, তামাক প্রভৃতি এবং বঙ্গদেশে ধান, চা, তৈলবীজ, চামড়া, বাঁশ প্রভৃতি রপ্তানি হতো।[১১]

মুদ্রা ব্যবস্থা

বাংলায় মুদ্রা হিসেবে কড়ির ব্যবহার ছিল সুপ্রাচীন ব্যবস্থা। সিলেট অঞ্চল এর ব্যতিক্রম নয়। সীমিত পর্যায়ে আর্কট মুদ্রা বা স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি চালু হলেও কড়ির প্রচলন ছিল ব্যাপক হারে। পুরাতন টাকাকে সিক্কা টাকায় রূপান্তরিত করে বাটা প্রদানের মোগল নিয়ম অব্যাহত থাকে এবং স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

স্মরণাতীত কাল থেকেই সমগ্র সিলেট অঞ্চলে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কড়ির প্রচলন শুরু হয়। সীমিত পর্যায়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সিক্কা প্রভৃতি মুদ্রার পাশাপাশি ব্যাপক হারে কড়ি ব্যবহার করা হতো। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কড়ি মুদ্রার প্রচলন ছিল।[১২] কিন্তু সিলেট অঞ্চলে সুদীর্ঘ কালব্যাপী কড়ির ব্যবহার নিয়ে ভাবতে গিয়ে কড়ির প্রাপ্তি বিষয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এর উৎসস্থল সমুদ্র। সাধারণত মালাবার উপকূলের বিপরীত দিকে করমণ্ডল উপকূলে, মালদ্বীপ বা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কড়ি পাওয়া যায়। সেখান থেকে ১৫০০ মাইল দূরবর্তী সিলেটে বিপুল পরিমাণ কড়ি প্রাপ্তি সেকালে কীভাবে সম্ভব হয়েছিল তা আজও অজানা রয়েছে।

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট লিন্ডসে সিলেটের রেসিডেন্ট পদে যোগদান করেন। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, সিলেট জেলায় তখন মুদ্রা হিসেবে 'কড়ি'র ব্যাপক প্রচলন ছিল। লিন্ডসে রাজস্ব হিসেবে কড়ি গ্রহণ, মওজুদ ও তা ঢাকায় প্রেরণ সংক্রান্ত নানা রকম জটিলতার বিষয়টি তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ

> *আমরা রাজস্ব সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠাই। সিলেটের রাজস্ব ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। যে কেউ জানতে চাইবেন কয় কড়িতে এক টাকা! পরিষ্কার করেই বলি। চার কড়িতে এক গণ্ডা, বিশ গণ্ডায় এক পন, ষোলো পনে এক কাহন (কাউন), চার কাউনে এক টাকা। অর্থাৎ ৫১২০ কড়িতে এক টাকা। পাউন্ডের হিসেবে এক পাউন্ডে ৪০,৯৬০ কড়ি।*[১৩]

বিপুল পরিমাণ কড়ি রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ ও সংরক্ষণের জন্য অনেকগুলো বড় বড় ঘর নির্মাণ ও বছর শেষে নৌ-বহর সাজিয়ে ঢাকায় প্রেরণ করতে হতো। ঢাকা যাওয়ার পথেও কিছু অপচয় হতো। এ প্রক্রিয়ায় খরচ বাবৎ শতকরা দশ টাকা ক্ষতি হতো। লিন্ডসের পূর্বে কড়ি মাপার জন্য 'ঝুড়ি' ব্যবহার করা হতো। তিনি ওজনের মাধ্যমে কড়ি গ্রহণের প্রথা চালু করেন। উক্ত কড়ি ঢাকায় প্রেরণ করা হলে তা নিলামে বিক্রয় করে রৌপ্য মুদ্রায় পরিণত করা হতো।[১৪] ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কড়ির ব্যবহার সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

তথ্যনির্দেশ:

১. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, প্রথম ভাগ,* উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ২৯

২. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৩

৩. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩২

৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৫

৫. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২৬

৬. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২৬

৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৭

৮. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস,* এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৬৬

৯. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৭২-৭৩

১০. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৭৩

১১. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৭৩

১২. শ্রী মোহিনীমোহন দাশ গুপ্ত, *শ্রীহট্টের ইতিহাস,* রব্বানী চৌধুরী সংস্করণ ২০০৪। পৃষ্ঠা ৪৭

১৩. রবার্ট লিন্ডসে, *সিলেটে আমার বারো বছর,* (ভাষান্তরঃ অব্দুল হামিদ মানিক), কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৬

১৪. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-পঞ্চম খণ্ড,* উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৮।

অষ্টম অধ্যায়

রাজনীতি চর্চা

হবিগঞ্জ অঞ্চলে কখন রাজনীতি চর্চার শুরু হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়। তথ্যগত সীমাবদ্ধতার দরুন এ ব্যাপারে সঠিকভাবে বলা সম্ভব না হলেও সমগ্র দেশের ন্যায় কোম্পানি শাসনামলেই যে এখানকার বরেণ্য ব্যক্তিগণ জাতীয় রাজনীতিতে পদচারণা শুরু করেছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। স্থানীয়ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে সচেতনতা ও প্রতিবাদের স্ফুরণ ঘটেছিল তারও অনেক প্রমাণ বিদ্যমান।

কোম্পানি প্রশাসন একের পর এক রাজস্ব বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এর প্রভাব পড়ে কৃষক সমাজেও। কৃষকরা বর্ধিত খাজনা দিতে অপারগ হওয়ায় ভূস্বামীগণও রাজস্ব পরিশোধে সমস্যার সম্মুখীন হন। ফলে ভূস্বামীরা জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিবাদ করে রাজস্ব বয়কটের পদক্ষেপ নেন। এ পর্যায়ে কালেক্টরগণ অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ভূমি মালিকদের সম্পত্তিতে সাজোয়াল লেলিয়ে দেন। এতেও কাজ না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ সম্পত্তি নিলামের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু সকল ভূমি মালিকরা একতাবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় নিলামের তেমন খরিদ্দার পাওয়া যায়নি।

এমতবস্থায় সিলেটের বাইরে থেকে দালাল খরিদ্দার এনে নিলাম দিলে বহিরাগতদের দখলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। বালিশিরার জমিদার মুহাম্মদ রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে এ প্রতিরোধে তরফের সৈয়দ রেজাউর রহমান, দিনারপুরের মুহাম্মদ রাব্বী চৌধুরী, আনিস চৌধুরী, নওয়াজ চৌধুরী প্রমুখ ভূমিকা রাখেন। তারা প্রায় ১০,০০০ অস্ত্রধারী জনতাকে সাথে নিয়ে যে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাতে ঢাকা অঞ্চলের জমিদারগণও প্রভাবিত হয়ে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। এর সত্যতা পাওয়া যায় কালেক্টরির ২৯-০৭-১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দের এক সরকারি পত্রে। এতে বলা হয়:

> *Mohammed Rezah, the late proprietor, had assembled upwards of 10,000 men armed with matchlocks, bows and spears, to oppose their landing. Upon the parties endeavouring to carry into execution the Order of Government, they were fired upon, two dandies killed, and several wounded; upon which the party was under the necessity of retreating, and are now returned of Sylhet----. But I have received certain information that he has received private assistance from all the neighboring zemindars, both under Dacca and Sylhet, and is encouraged in opposing the orders of the Administration.*

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে পুটিজুরি পরগণায় খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাতে কৃষকরা জমিদারদের কোণঠাসা করতে সক্ষম হলেও সরকারি মদদে মামলার মাধ্যমে কৃষকদেরকে দমন করা হয়।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট অঞ্চলকে আসামের সাথে সংযুক্ত করার যে ব্রিটিশ প্রক্রিয়া তার বিরুদ্ধে সিলেটবাসী ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিজে প্রত্যক্ষ করার জন্য ভারতের গভর্নর লর্ড নর্থব্রুক সিলেটে আসনে। তার আগমনে নেতৃবৃন্দ ব্যাপক প্রস্তুতিসহ হাজী সৈয়দ বখত মজুমদারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তার সাথে বৈঠক করে। বৈঠকে আসামভুক্তির কারণে এখানকার মানুষের কি কি সমস্যা হতে পারে সে বিষয় বিস্তারিত বিবরণসমেত একটি প্রতিবাদ লিপি পেশ করা হয়।

নর্থব্রুক সিলেটবাসীর দাবির যৌক্তিকতা অনুধাবন করে আসামের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধানের পাশাপাশি সিলেটের রাজস্ব, ভূমিব্যবস্থা ও অন্যান্য সাধারণ বিধিব্যবস্থা বাংলার অনুরূপই থাকবে এ মর্মে প্রতিশ্রুত হন। বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত হয় তন্মধ্যে সিলেটের জন্য ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার প্রশাসক নিয়োগ, বাংলা থেকে মুনসেফ, জজ, সাব-জজ ইত্যাদি পদে নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খ্রি. সিলেটকে আসামের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

এই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে সিলেটে বসবাসরত হবিগঞ্জ এলাকার অনেকে ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে অবগত হওয়া যায়। স্মর্তব্য যে, তখন পর্যন্ত হবিগঞ্জ নামে কোনো প্রশাসনিক ইউনিট কিংবা স্থানের অস্তিত্ব ছিল না। লস্করপুর, সুলতানশী ও কোটান্দর এলাকায় ছিল বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্র। হবিগঞ্জ অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সিলেট ও কলিকাতায় অবস্থান করে পেশাগত ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন। আসামভুক্তির পর থেকে অনেকে শিলং ও শিলচরে কর্ম-পেশার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করেন।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল সাধারণভাবে আসামের এবং বিশেষভাবে সুরমা উপত্যকার চা শ্রমিকদের দুর্দশার বিষয়টি তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। বাংলার সঙ্গে সিলেটের পুনঃসংযুক্তির প্রশ্নে সুরমা উপত্যকার নেতৃবৃন্দ তখন অধিকতর সোচ্চার হন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কংগ্রেসের প্রায় সবগুলো অধিবেশনেই বিপিনচন্দ্র পাল এবং কামিনী কুমার চন্দ জোরালো বক্তব্য রেখে এ দাবির সপক্ষে সর্বজনীন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এই ঐকমত্যের ফলেই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সিলেট ও কাছাড় জেলার কংগ্রেস কমিটির একত্রীভূত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পরোক্ষভাবে এ উপত্যকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলেই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনে কংগ্রেসের অঙ্গীকারের কারণ হয়েছিল।[১]

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হবার পর এখানে সরকারি মহলের আবাস গড়ে উঠার সাথে সাথে ব্যাবসা, আইন ইত্যাদি পেশাজীবী সমাজেরও বসবাস শুরু হয়। তখন থেকে এখানে যে নতুন একটি অগ্রসর সমাজের সৃষ্টি হয় তাদের সাথে যোগাযোগ ঘটে বঙ্গীয় রাজনৈতিক মহলের। তাদের প্রেরণায় সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক সংগঠনের। তৎকালীন সময়ে হবিগঞ্জের সন্তানদের

মধ্যে কামিনী কুমার চন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের প্রেরণায় হবিগঞ্জে শহরকেন্দ্রিক রাজনীতির চর্চা শুরু হয়। এ পর্যায়ে সম্ভবত কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী বিএলই প্রথম ব্যক্তি যিনি মহকুমার রাজনীতি চর্চায় নেতৃত্ব দেন। কামিনী কুমার চন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের সাথে কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর যোগাযোগ থাকায় তিনিই হবিগঞ্জে কংগ্রেস রাজনীতির সূচনা করেন।[২]

কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী বিএল-এর গ্রামের বাড়ি ছিল মাধবপুরের সুরমা গ্রামে। গোপেন্দ্রলাল চৌধুরী, শিবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, অমিয়কুমার দত্তচৌধুরী প্রমুখও তখন মহকুমার রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গোপেন্দ্রলাল চৌধুরী কংগ্রেসের মনোনয়নে এমএলসি (Member of Legislative Council) নির্বাচিত হন। বানিয়াচঙ্গের শিবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস পেশায় ছিলেন মোক্তার। অসহযোগ আন্দোলনে শরিক হয়ে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কারাবরণ করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জে অনুষ্ঠিত সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন আয়োজনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩] তরুণ সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ি ছিল লাখাইর মুড়াকড়িতে। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ পৌরসভার সভাপতি, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের মনোনয়নে আসাম প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হন।[৪]

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড বারীণ দত্তের বাড়ি ছিল হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে (মতান্তরে লাখাই)। তার অগ্রজ সত্যব্রত দত্ত চরমপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি নিজেও এ রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কারাবরণ করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হওয়ার পর সুরমা ভ্যালির বিভিন্ন কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন।

এছাড়াও এডভোকেট রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত (চুনারুঘাট), সৈয়দ নূরুর রহমান (চুনারুঘাট), সৈয়দ সামিউর রহমান (চুনারুঘাট), সৈয়দ আব্দুল মন্নান (হবিগঞ্জ), দেওয়ান আব্দুর রহিম চৌধুরী (নবীগঞ্জ), দেওয়ান আলীরাজা চৌধুরী (বানিয়াচঙ্গ), আব্দুর রহমান মোক্তার (চুনারুঘাট), আশরাফ উদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী (মাধবপুর), সৈয়দ বদরুদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন চৌধুরী, এডভোকেট আব্দুল হাই, এ জেড আব্দুন নুর চৌধুরী, মৌলভী আব্দুল্লাহ প্রমুখ ব্রিটিশ ভারতে হবিগঞ্জের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিবাদে ভারতে বহু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কাজ করে তা আমাদের সকলেরই জানা। সন্ত্রাসবাদীরা সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত ও তহবিল সংগ্রহ করার জন্য নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। সেসব সংগঠনে হবিগঞ্জ অঞ্চলের বহু যুবক সম্পৃক্ত ছিলেন। তেমনি একজন বানিয়াচঙ্গের সুশীল কুমার সেন। তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে চন্দন নগরের মেয়র ভার্দিভ্যালের বাসভবনে বোমা হামলার আসামি হয়ে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।[৫]

তাদের দ্বারা সিলেট অঞ্চলে যে সব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় তন্মধ্যে শাহজিবাজারে ট্রেন ডাকাতি সর্বপ্রথম ঘটনা। ঘটনাটি শাহজিবাজার থেকে সুতাং রেল স্টেশনের মধ্যে সংঘটিত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ অঞ্চলের বিপ্লবী গুনেন্দ্র মিত্র, অজিত চক্রবর্তী, মাখন চক্রবর্তী ও সুশীল

দত্ত এ কাজে অংশ নেন। তারা একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে একটি খেলনা রিভলবার দেখিয়ে বার্মা ওয়েল কোম্পানির টাকা নিয়ে নিরাপদে পালাতে সক্ষম হন। এ টাকায় তারা কলকাতা থেকে ৪টি পিস্তল কিনেছিলেন বলে জানা যায়।[৬]

এর কিছুদিন পর ইটাখোলা রেল স্টেশনে মেইল ট্রেন থেকে বিপ্লবীদের দ্বারা ডাক লুটের ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় জড়িত ছিলেন অসিত রঞ্জন ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ লাল দাস, বিরাজ মোহন দেব, বিদ্যাধর সাহা, মহেশ রায় ও মনমোহন সাহা। হবিগঞ্জ সদর ও বানিয়াচঙ্গের মধ্যবর্তী রত্না নদীর তীরবর্তী সোনারু গ্রামে যে ডাক লুট হয় তাতে অংশ গ্রহণ করেন যোগেশ চ্যাটার্জি, রবি সেন ও নীরদ দাস। হবিগঞ্জ শহরের পার্শ্ববর্তী উমেদ নগর গ্রামেও একটি ডাক লুটের চেষ্টা করা হয়। উক্ত কাজে অংশ নেন সত্যেন্দ্র কুমার রায় ও গোপেন্দ্র লাল রায়। ঘটনার সময় সত্যেন্দ্র কুমার রায় ও পরে গোপেন্দ্র লাল রায় ধৃত হলে বিচারে ৫ বছরের সাজা দিয়ে তাদেরকে আন্দামান দ্বীপে পাঠানো হয়। সিলেট অঞ্চলের সর্বশেষ রাজনৈতিক ডাকাতি ছিল আজমিরীগঞ্জের ডাক লুট। এতে তারা ১৬ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। এ ডাকাতিতে নেতৃত্ব দেন দেবেন্দ্র চন্দ্র দত্ত। অন্যান্য সদস্য ছিলেন দিগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন দাস, গিরিজা কুমার ভদ্র, মহিম দাস ও অঙ্গিরা কুমার শর্মা।[৭]

হবিগঞ্জ উমেদ নগর গ্রামে ডাক লুটের ঘটনার সাথে জড়িত গোপেন্দ্র লাল রায় পরে ভারতের কাছাড় জেলা সিপিএম-এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আজমিরিগঞ্জের ডাক লুটের ঘটনায় জড়িত চিত্তরঞ্জন দাস সিলেট জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৮]

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর সিলেটে খেলাফত সম্মেলনের জোর প্রস্তুতি চলে। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বি.এল, মৌলানা আব্দুল হক চৌধুরী, আব্দুল হামিদ প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৫ মার্চ (মতান্তরে ৭ মার্চ)[৯] মৌলভীবাজারের যুগিডরে আসাম প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। মৌলানা হোসেন আহমদ মাদানীও এ সম্মেলনে যোগ দেন।

সম্মেলনের পরদিন ১৬ মার্চ মৌলানা আবদুল মুছাব্বিরকে সভাপতি ও মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বি.এল. কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে প্রাদেশিক খেলাফত কমিটি গঠিত হয়। তাদের তত্ত্বাবধানে ১৫ এপ্রিল থেকে মহকুমা কমিটি হিসেবে সিলেট সদর, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ, শিলচর ও হাইলাকান্দি কমিটি গঠিত হয়। তখন হবিগঞ্জ কমিটির সভাপতি ছিলেন পীর সৈয়দ আম্বর আলী চৌধুরী, সম্পাদক ডা. আবদুস শহীদ, সহকারি সম্পাদক রেজওয়ান উদ্দিন আহমদ।[১০]

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের যখন টালমাটাল অবস্থা, তখন ১৫ নভেম্বর '২১ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের জেলা প্রশাসন সভা-সমিতি, মিছিল ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নেতা-কর্মীরা মিছিল-মিটিং এবং গণসংযোগ কর্মসূচি চালিয়ে যান। এতে সমগ্র সিলেট জেলায় ৫৪ জন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তন্মধ্যে হবিগঞ্জের কাজী হাবিবুর রহমান, মৌলানা আব্দুর রশিদ, দেওয়ান মুজিবুর রহমান চৌধুরী; বাহুবলের মোহাম্মদ আদুল

হাসিম; বানিয়াচঙ্গের মোহাম্মদ আবুল হোসেন খান, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, মৌলবি সিকান্দর আলী, মৌলবি গোলাম রহমান এবং চুনারুঘাটের মৌলবি আবদুর রহমান মোক্তারের নাম স্মরণযোগ্য।[১১]

উক্ত ৫৪ জনের বাইরে পৃথকভাবে গ্রেফতারকৃত আরো ২২ জনের নাম জানা যায়। তারা হলেন বানিয়াচঙ্গের রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, মৌলবি কালাই উল্লাহ, মৌলবি লতিফ উল্লাহ, শিবেন্দ্র বিশ্বাস, প্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, মাস্টার হাতিম উল্লাহ খান, মৌলানা রেদওয়ান উদ্দিন আহমদ, মৌলবি আবদুর রশীদ, শ্যামচরণ দেব, অক্ষয় কুমার বিশ্বাস, মোহাম্মদ হুসেন ঠাকুর, মোহাম্মদ হোসেন খান, ডাঃ মোহাম্মদ ইলিয়াস, মোহাম্মদ আদম আলী, মৌলবি সৈয়দ আবুল ফজল, সৈয়দ আবুল মুহসিন, মৌলবি হাবিবুর রহমান চৌধুরী, মৌলবি আবদুল লফিত, মোহাম্মদ উবেদুর রহমান, মৌলবি গোলাম আমজাদ; নবীগঞ্জের মৌলবি রেদওয়ান উদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও চুনারুঘাটের মৌলবি আব্দুর রহমান।[১২]

সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলনে ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’এর প্রতি সমর্থন জানানো হয়। এ সম্মেলনে হবিগঞ্জের কংগ্রেস নেতা গোপেন্দ্রলাল দাশ চৌধুরী পরবর্তী সম্মেলন হবিগঞ্জে অনুষ্ঠানের আহ্বান জানালে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এর সপ্তম অধিবেশন হবিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়।

ইংরেজ শাসনকালে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি চালু হওয়ার পর অফিস আদালতে ইংরেজি ছাড়া কোনো ভাষা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার খেলাফত আন্দোলনের জনৈক কর্মীর বাড়িতে পুলিশ কর্তৃক খানা-তল্লাসির সময় পবিত্র কোরআন শরীফের অবমাননাসহ তা ছিঁড়ে ফেলা হয়। এ ঘটনার সংবাদ ছাপার অপরাধে সাপ্তাহিক জনশক্তি পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের শাস্তি হয়। কিন্তু আপিলে এ শাস্তি নাকচ হবার পর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর আসাম প্রাদেশিক পরিষদে ঘটনার সাথে জড়িত দারোগার বরখাস্তের দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সদর আসনের সদস্য আব্দুল হামিদ চৌধুরী। উক্ত প্রস্তাবটি লিখা ছিল বাংলায়। অধিবেশন চলাকালে জনাব আব্দুল হামিদ চৌধুরী প্রস্তাবটি সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে সরকার পক্ষের জুডিশিয়াল মেম্বার কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবতা পালন করেন। বার বার প্রশ্নের পরও জুডিশিয়াল মেম্বার কোনো উত্তর না দেয়ায় হবিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সদস্য গোপেন্দ্র লাল চৌধুরী ও সিলেটের সদস্য রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে জুডিশিয়াল মেম্বার জানান যে, বাংলা ভাষায় কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়ার বিধান আইনে নাই। এর প্রেক্ষিতে সিলেট অঞ্চলের পরিষদ সদস্যগণ প্রত্যেক সদস্যের মাতৃভাষায় বক্তৃতা করার অধিকার ও সরকার পক্ষ থেকে এর জবাব দেয়ার বিধান তৈরি করার দাবি জানিয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। পরিষদ কক্ষে ঘণ্টা দেড়েক বিতর্কের পর বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেবার মধ্য দিয়ে আসাম প্রাদেশিক পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা ও প্রশ্ন করার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩]

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় আসাম প্রদেশের সিলেট হয়ে উঠে আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। আন্দোলন দমনের জন্য সরকার ঘরে ঘরে তল্লাশি করে সারা দেশে হাজার হাজার লোককে বন্দি করে। থানার লক-আপে বন্দিদের

উপর চালানো হয় নির্দয় নির্যাতন। শহরে শহরে জারি হয় ১৪৪ ধারা। হবিগঞ্জ এর ব্যতিক্রম ছিল না। ধর্মঘট-বিক্ষোভ করে হবিগঞ্জে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আসাম সরকার হবিগঞ্জ কংগ্রেস কমিটিকে বে-আইনি ঘোষণা করে। এ আন্দোলনে হবিগঞ্জের প্রচুর লোক কারাবরণ করেন। তাদের মধ্যে শিবেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, শিশুপুত্রসহ সুমতি নাগ প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য।[১৪]

১৯৩৯ সালে ধুবড়িতে অনুষ্ঠিত আসাম মুসলিম লীগের প্রথম সম্মেলনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন সৈয়দ সাদ উল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক হন মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হবিগঞ্জে। এ সম্মেলনের ব্যাপক প্রচারের জন্য বিতরণ করা হয় হাজার হাজার লিফলেট ও ক্যালেণ্ডার। সম্মেলন উপলক্ষ্যে হাজার হাজার মানুষের পদভারে প্রকম্পিত হয় হবিগঞ্জ শহর। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন শেরেবাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক। তিনি রেলযোগে শায়েস্তাগঞ্জ আসেন। তাঁকে শায়েস্তাগঞ্জ থেকে হবিগঞ্জ নিয়ে আসা হয় ৫২টি সুসজ্জিত হস্তী, অসংখ্য ঘোড়া, প্রচুর গাড়ি ও সাইকেল সমেত রাজকীয় শোভাযাত্রা সহকারে। এ সময়ে শায়েস্তাগঞ্জ থেকে হবিগঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র রাস্তা ছিলো লোকে লোকারণ্য। এখানকার জনমনে দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল।[১৫]

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে কংগ্রেস ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ একযোগে অংশ গ্রহণ করে। এই আন্দোলনের সময়ে ছাত্ররা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল মিটিং করতো। তখন হবিগঞ্জের উল্লেখযোগ্য ঘটনা শাহ্জীবাজার রেলওয়ে স্টেশনের নিকট সৈন্যবাহী চলন্ত ট্রেন লাইনচ্যুৎ করা। এতে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। এ আন্দোলনে কারাবরণ করেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর মৌলবি আবদুল গফুর, মৌলবি আবদুল বারি চৌধুরী, মৌলবি গোলাম রহমান, মৌলবি মোয়াজ্জেম হোসেন, মৌলবি আব্দুর রাজ্জাক, মৌলবি আবদুল হামিদ প্রমুখ এবং কংগ্রেসের শিবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, জিতেন্দ্র লাল দাস চৌধুরী, ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, সুখদাসুন্দরী পাল চৌধুরী, শোভন বালা দেব, দীপ্তি দেবী প্রমুখ।[১৬]

ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে এ অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যেও যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে নবীগঞ্জ থানার দেওয়ান আবদুর রহমান চৌধুরীর স্ত্রী মহীয়সী জোবেদা খাতুন চৌধুরীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি মুসলিম সমাজের কঠোর পর্দা প্রথা ছিন্ন করে 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ'-এর সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেস দলের মহিলাদের নিয়ে গঠিত এই শ্রীহট্ট মহিলা সংঘের উদ্যোগে হবিগঞ্জসহ অত্রাঞ্চলে ২৮টি শাখা খোলা হয়েছিল। সিলেট জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলনে গঠিত জেলা কমিটিতে জোবেদা খাতুন চৌধুরী সর্বসম্মতভাবে সভানেত্রীর পদে নির্বাচিত হন। হবিগঞ্জেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে ওঠে। এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন সুমতি নাগ, সুখদা সুন্দরী পাল চৌধুরী, ডা. মৃণালিনী মজুমদার, অর্পনা ধর প্রমুখ।[১৭]

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় চলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিহারের ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের সাহায্যের জন্য হবিগঞ্জের মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে পাঠানো

হয়েছিল। আসামে কংগ্রেস সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হবিগঞ্জ মহকুমা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ভূতপূর্ব সভাপতি ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিল সদস্য মৌলবি নুরুল ইসলাম চৌধুরী। এতে হবিগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের পক্ষে সভাপতি সৈয়দ বদরুদ্দিন, নাসির উদ্দিন চৌধুরী এম.এন.এ, মৌলবি সাহাব উদ্দিন (মোক্তার) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।[১৮]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে আসাম প্রদেশে আসীন ছিল কংগ্রেস সরকার। তারা সিলেটকে আসামের সাথে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু সিলেট জেলার জনগণের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। কর্তৃপক্ষ সিলেটবাসীর সে ইচ্ছাকে প্রথমে পাত্তা দেয়নি। এর কারণ ছিল হিন্দু নেতৃবৃন্দ সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, এ জেলা একটি হিন্দু প্রধান অঞ্চল। তাই একে আসাম তথা ভারতের সাথে রাখা হোক। কিন্তু মুসলমান নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, এটি মুসলিম প্রধান অঞ্চল। উভয় পক্ষের দাবির প্রেক্ষিতে সিলেট জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানের পক্ষে না হিন্দুপ্রধান আসামের পক্ষে থাকবে তা গণভোট (রেফারেন্ডাম)-এর মাধ্যমে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত গণভোটে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে।

এ গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে এ অঞ্চলে যে সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দের আগমন ঘটে তাদের মধ্যে আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, খাজা নাজিম উদ্দিন, তমিজ উদ্দিন খান, আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, নবাবজাদা হাবিব উল্লাহ্ সহ তৎকালীন ছাত্রনেতা শাহ আজিজুর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান, মৌলভী ফরিদ আহমদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী, দেওয়ান শফিউল আলম প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য।[১৯]

হবিগঞ্জের সকল মুসলমান নেতৃবৃন্দই রেফারেন্ডামে ব্যাপক জনমত সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিলেন। এ পর্বে কারো অবদানকেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে, খান সাহেব নুরুল হোসেন খান এম.এল.এ, বানিয়াচং; মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী এম.এল.এ, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত, মোস্তফাপুর, নবীগঞ্জ; আবদুর রহমান (মোক্তার) এম.এল.এ, শ্রীকুটা, চুনারুঘাট; মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এম.এল.এ, বসিনা, বাহুবল; নাসির উদ্দিন চৌধুরী এম.এল.এ, মন্ত্রী, পিয়াইম, মাধবপুর; সৈয়দ সঈদ উদ্দিন আহমেদ এম.পি.এ. নোয়াপাড়া, মাধবপুর; মৌলভী রফিজ উদ্দিন চৌধুরী এম.এল.এ দৌলতপুর, বাহুবল; আবদুল মান্নান এম.পি.এ. ঘোলডুবা, নবীগঞ্জ; দেওয়ান মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী এম.এন.এ পানিউমদা, নবীগঞ্জ; দেওয়ান ফরিদগাজী দেবপাড়া, নবীগঞ্জ; সৈয়দ এ.বি মাহমুদ হোসেন (পরে চিফ জাস্টিস) লস্করপুর, হবিগঞ্জ; খান বাহাদুর আবু আলী আহমদ চৌধুরী বানেশ্বর, মাধবপুর; আব্দুল বারী এম.পি.এ, শরীফাবাদ, হবিগঞ্জ; খান সাহেব মাহতাব আলী আজমিরীগঞ্জ; জাহেদ উদ্দিন চৌধুরী পিয়াইম, মাধবপুর (তিনিই হবিগঞ্জ ট্রেজারিতে ১৪ আগস্ট প্রথম পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন); সৈয়দ মহিবুল হাসান নরপতি, চুনারুঘাট; আব্দুল হাই এডভোকেট পাটুলী, মাধবপুর প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য।[২০]

এছাড়াও থানাওয়ারী যাদের নাম স্মরণযোগ্য তারা হলেন:

হবিগঞ্জ সদর : সৈয়দ আব্দুল মন্নান সুলতানশী, সৈয়দ ইয়াকুব রেজা লস্করপুর, রফিক উদ্দিন মার্চেন্ট নিজামপুর, মৌলবী আব্দুল বারী মশাজান, আশরাফ উদ্দিন আহমদ মার্চেন্ট, গোপায়া। **নবীগঞ্জ :** দেওয়ান মুজিবুর রহমান ইজপুর, দেওয়ান আব্দুর রহিম চৌধুরী ও বেগম জোবেদা রহিম চৌধুরী পানিউমদা, আব্দুল হাই চৌধুরী কসবা, মৌলানা আবু আব্দিল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল রাইয়াপুর, আব্দুল কুদ্দুস মার্চেন্ট পাইকপাড়া, তালিব উদ্দিন আহমদ উকিল রাইয়াপুর, আব্দুল কাদির চৌধুরী, কসবা। **বানিয়াচং :** মৌলভী আব্দুল্লাহ বানিয়াচঙ্গী তোপখানা, শাহাব উদ্দিন আহমদ মোক্তার চতুরঙ্গরায়ের পাড়া, শাহ কারী মমীন উদ্দিন নন্দীপাড়া, আবুল হোসেন খান সাগরদিঘীর পশ্চিমপাড়, শেখ মোহাম্মদ সানুয়ার মিয়াখানী, ডাঃ মসলন্দ আলী। **আজমিরীগঞ্জ :** মৌলানা আব্দুর রহমান আজমিরিগঞ্জ, দরছ আলী চৌধুরী বংশিপ্পা। **লাখাই :** বদর উদ্দিন চৌধুরী এডভোকেট তেঘরিয়া, আলফু মিয়া বুল্লা, করিম হোসেন হাজী লাখাই, মোহাম্মদ আতাব মোল্লা মুড়াকরি, আব্দুল ওহাব চৌধুরী, করাব। **মাধবপুর :** সৈয়দ সোয়াব উদ্দিন চারাভাঙ্গা, মতিউল বর চৌধুরী বহরা, আফতাব উদ্দিন আহমদ এডভোকেট বাখরনগর, সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সার নোয়াপাড়া, মৌলানা হাফিজ উদ্দিন দাশপাড়া, আব্দুল আলী তালুকদার কালিকাপুর, মৌলানা মুতিউর রহমান বাঘাসুরা। **চুনারুঘাট :** সৈয়দ মোহাম্মদ ইদ্রিছ নরপতি, সৈয়দ খলিলুর রহমান ও সৈয়দ উবেদুর রহমান রামশ্রী, এ জে আব্দুর নূর চৌধুরী শিউরিকান্দি, মোহাম্মদ ইসহাক বনগাও, ডাঃ আব্দুর রশিদ তালুকদার ময়নাবাদ, আব্দুল হক এডভোকেট আইতন। **বাহুবল :** মৌলানা আবুল হাসিম বাহুবল, মৌলানা আব্দুল বশির চৌধুরী ও আব্দুল হামিদ চৌধুরী খাগাউড়া, আব্দুল বশীর পুটিজুরী, আব্দুল বারি বানিয়াগাও প্রমুখ।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ও ৭ জুলাই সিলেটের তদানিন্তন ডেপুটি কমিশনার মি. ডামব্রেক'র তত্ত্বাবধানে এই গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটের ভোট বাক্সে পাকিস্তানের পক্ষের প্রতীক ছিল 'কুড়াল' এবং আসামের পক্ষে 'কুঁড়েঘর'।[২১] মুসলমানরা দলমত নির্বিশেষে পাকিস্তানের পক্ষে এবং হিন্দুরা আসাম তথা ভারতের পক্ষে ভোট দেয়। সরকারি ভাবে উক্ত ভোটের ফলাফল প্রকাশ করা হয় **১২** জুলাই'৪৭। মুসলমানরা ৫৫ হাজার ৫শত ৭৮ ভোটের ব্যবধানে পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়। ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

মহকুমার নাম	**পাকিস্তানের পক্ষে ভোট**	**আসামের পক্ষে ভোট**
সিলেট সদর	৬৮,৩৮১	৩৮,৮৭১
করিমগঞ্জ	৪১,২৬২	৪০,৫৩৬
হবিগঞ্জ	৫৪,৫৪৩	৩৬,৯৫২
দক্ষিণ সিলেট (মৌঃ বাজার)	৩১,৭১৮	৩৩,৪৭১
সুনামগঞ্জ	৪৩,৭১২	৩৪,২১১
মোট:	২,৩৯,৬১৯	১,৮৪,০৪১

ব্রিটিশ শাসনামলে রাজনীতি চর্চায় খ্যাতি অর্জন করে হবিগঞ্জের যেসব ব্যক্তি আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন :

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন মাধবপুরের কামিনী কুমার চন্দ[২২];
১৯২১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে চুনারুঘাটের এডভোকেট রায়বাহাদুর প্রমোদ চন্দ্র দত্ত (শিক্ষামন্ত্রী) ও সৈয়দ নূরুর রহমান[২৩];
১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে নবীগঞ্জের এডভোকেট মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী ও চুনারুঘাটের সৈয়দ সামিউর রহমান[২৪];
১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে চুনারুঘাটের সৈয়দ সামিউর রহমান[২৫];
১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে সদরের সৈয়দ আব্দুল মন্নান ও নবীগঞ্জের এডভোকেট দেওয়ান আব্দুর রহিম চৌধুরী[২৬];
১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে নবীগঞ্জের এডভোকেট মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী, বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান আলীরাজা চৌধুরী, মাধবপুরের এডভোকেট আশরাফ উদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী ও চুনারুঘাটের আব্দুর রহমান মোক্তার।[২৭]

হবিগঞ্জবাসী সেকালের ক'জন রাজনীতিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

বিপিনচন্দ্র পাল

ব্রিটিশ ভারতের খ্যাতিমান বাগ্মী নেতা বিপিনচন্দ্র পালের জন্মস্থান এই হবিগঞ্জের পৈল গ্রামে। তিনি **১৮৫৮** খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামচন্দ্র পাল সিলেট বারে আইন পেশার সাথে যুক্ত থাকায় তিনি সেখানেই লেখাপড়া শুরু করেন। সিলেট থেকে এন্ট্রান্স পাস করে **১৮৭৫** খ্রিস্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সে সময়েই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। **১৮৮৫** খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। রাজনীতিতে যোগদান করে তিনি অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে নিজের স্থান কেড়ে নেন। তাঁর রাজনৈতিক উত্থান সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা রয়েছে শ্রীহট্ট প্রতিভায়। এতে বলা হয়েছে:

> *বিপিনচন্দ্রের কম্বুকণ্ঠে যখন স্বাধীনতার বাণী কলিকাতার স্কোয়ারে স্কোয়ারে ধ্বনিত হইতে লাগিল, ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষার সুললিত রচনা-বিন্যাস ও উন্মাদিনী শক্তিতে বিপুল জনসঙ্ঘ যখন মাতিয়া উঠিল, তখন শ্রীহট্টবাসী ছাত্রগণ সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনার স্রোতে ভাসিয়া চলিল, প্রতিদিন নানাস্থানে ২/৩টি করিয়া সভা। কোথায় কোন দলের মত গৃহীত হয়, ইহা নিয়া মহাব্যস্ততা। "কোথাকার একটা বাঙ্গাল" আসিয়া কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত নেতাদের বিরুদ্ধে গলাবাজী করিতেছে, ইহা অসহ্য। ইহাকে জব্দ করা দরকার। কিছুদিন বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা দিতে উঠিলেই একদল লোক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বাঙ্গাল বিপিনচন্দ্র বাধা পইয়া দমিবার পাত্র ছিলেন না। জনতা যত বেশীই উৎক্ষিপ্ত ও সংক্ষুব্ধ হউক না কেন, তিনি সিংহ বিক্রমে গণ্ডগোলকারীদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া যখন তাঁহার দিগন্ত বিদারী*

কণ্ঠনিনাদে স্বীয় মত ও পথের ব্যাখ্যা করিতেন, তখন সব গণ্ডগোল কোথায় মিলাইয়া যাইত। বিশাল জনরাশির মধ্যে আর "টু" শব্দটা পর্যন্ত থাকিত না। তাঁহার কণ্ঠ যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া বিমুগ্ধ জনমণ্ডলীকে অকাট্য যুক্তি ও প্রাণ-উন্মাদিনী ভাষা ও ভাবের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিত, চতুর্দ্দিকে ততই ঘন করতালি ও সাধুবাদে ধ্বনিত হইয়া উঠিত।[২৮]

কেবল কলকাতায়ই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেননি, সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিনি পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার মন্ত্র শোনাতেন। স্বীয় প্রতিভা-বলে অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র দেশে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী বলেন :

কুশাগ্র বুদ্ধি রাজনৈতিক, দার্শনিক, পণ্ডিত ও সাহিত্যিক, সর্ব্বোপরি এত বড় বক্তা এই উপমহাদেশে এ পর্যন্ত আর জন্মেন নাই। তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত বক্তৃতায় যুবমনে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করিত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিতেন। লালা লাজপতরায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল তখন ভারতের রাজনৈতিকগণের তিন দিকপাল ছিলেন। তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে "লাল-বাল-পাল" বলা হইত।[২৯]

তিনি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট-সুরমা উপত্যকার প্রথম রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ১৯০৮ খ্রি. করিমগঞ্জে সুরমা উপত্যকার দ্বিতীয় সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের সাইমন কমিশন বর্জন, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতিতে সুরমা উপত্যকায় জনমত সৃষ্টিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখেন। তিনি শ্রীহট্ট সম্মিলনীর মূল সংগঠক হিসেবে অবদান রাখেন। ছাত্র আন্দোলন, নারী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অবদান রেখেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে যে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় তাতে লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের সাথে তিনি নীতি-নির্ধারণী ভূমিকায় ছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। অসাধারন সুবক্তা হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী নেতার খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁর ক্ষুরধার বক্তৃতার গুণে ব্রিটিশ প্রশাসনে তাঁর একটি প্রভাব বলয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মধ্যপন্থি ও চরমপন্থি অংশের মধ্যে একটি ভাঙনের সৃষ্টি হয়। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল মতাদর্শগত ভাবে গান্ধীবাদী ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি গান্ধী-নেহেরুর রাজনৈতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রুখে দাঁড়িয়ে নানা ঘটনা প্রবাহের জন্ম দিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে দাঁড়ান।[৩০]

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমণ করেন।

কামিনী কুমার চন্দ

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-এর মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সৃষ্টি হলে এর প্রতিবাদে ভারতের হিন্দু নেতৃবৃন্দ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায়। অত্যন্ত সময়োপযোগী এই সরকারি সিদ্ধান্তকে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় স্বাগত জানালেও বাংলার এই বিভক্তি হিন্দু নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেননি। এর প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন নামে একটি সন্ত্রাসনির্ভর রাজনৈতিক সংগঠন নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট অঞ্চলে যে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন কামিনী কুমার চন্দ।

তিনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এমএ ও ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিএল পাস করে শিলচর গিয়ে আইন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। অসাধারণ মেধাবি কামিনী কুমার ছাত্র জীবনেই রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে কলকাতাস্থ শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। স্যার আশুতোষ মুখার্জী ও স্যার শামসুল হুদার সাথে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি।

তিনি 'হোমরুল লীগ' এর বিশেষ সদস্য ছিলেন। এর সহ সভাপতি মিস এনি বেসান্ত কারারুদ্ধ হলে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম বেসরকারি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এ সময়েই তিনি আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। আসাম সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন সভায় যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রায়বাহাদুর খেতাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৩১] উল্লেখ্য আসাম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তিনি সদস্য হয়েছিলেন মিউনিসিপ্যালিটি কোটায়।[৩২]

কামিনী কুমার চন্দ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মাধবপুর উপজেলার ছাতিয়াইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রাম কুমার চন্দ। তিনি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পরলোক গমন করেন।

প্রমোদ চন্দ্র দত্ত

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আসামের শিক্ষামন্ত্রী হন প্রমোদচন্দ্র দত্ত। তিনি চুনারুঘাটের মিরাশী গ্রামে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেট সরকারি স্কুল থেকে আসামে প্রথম হয়ে প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিএল পাস করে তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে সিলেট বারে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি উকিল হিসেবে নিয়োগ পান।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আসাম গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত হন। এ সময়ে তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। নূতন ভারত শাসন আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

এ পদে থাকা কালে তিনি আসামের বিভিন্ন কারাগার থেকে রাজবন্দীদের মুক্তি দেন এবং মুক্ত বন্দীদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। তাঁর কার্যকালে এবং চেষ্ঠায় সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজের নূতন গৃহ নির্মাণের অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত এবং সেখানে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজ ও সিলেটের মদন মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর উদ্যোগে। উভয়

কলেজে পরিচালনা পরিষদের তৎকালীন সভাপতিও ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্ঠায় সিলেট-শিলং রাস্তা এবং সুরমা নদীর উপর কিন ব্রিজ নির্মিত হয়।

তিনি সরকার কর্তৃক রায়বাহাদুর ও সি.আই.ই. খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৩]

এডভোকেট মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী

আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী। নবীগঞ্জের মোস্তফাপুর গ্রামে তিনি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। তদবস্থায় বিএল পাস করে তিনি হবিগঞ্জে আইন পেশায় যুক্ত হন। হবিগঞ্জে মুসলিম লীগের রাজনীতি সংগঠনে তার অসামান্য অবদান রয়েছে।

গণপ্রতিনিধি হিসেবে প্রথমে তিনি হবিগঞ্জ লোকাল বোর্ডের মেম্বার নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আসাম প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এমএলএ নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাদ উল্লাহ মন্ত্রিসভায় যুক্ত হন।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ধুবড়িতে অনুষ্ঠিত আসাম মুসলিম লীগের প্রথম সম্মেলনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন সৈয়দ সাদ উল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক হন মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী। সিলেট মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করায় তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। হবিগঞ্জে আসাম মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠানে তিনি শীর্ষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডেরও অধিনায়ক ছিলেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসঙ্ঘের প্যারিস সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইন্দোনেশিয়ায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজনীতি থেকে সরে যান। প্রবীন এই রাজনীতিক ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন।[৩৪]

রামনাথ বিশ্বাস

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যখন সর্বসাধারণের ব্যবহার্য পতিত গোচারণ ভূমি, জলাশয়, জঙ্গল প্রভৃতি ভূমির উপর খাজনা প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে তখন কৃষকের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কৃষকদের এই ক্ষোভ নিরসনে সিলেটের অগ্রসর সমাজ এর প্রতিবাদের উদ্যোগ নেন।

বানিয়াচঙ্গের রামনাথ বিশ্বাস তখন কিশোর অবস্থাতেই অনুশীলন নামের একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সুশীল সেনের শাখায় তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি এই খাজনা আরোপের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য প্রতিবাদের পথে আসার ব্রত নেন। তাই এ অঞ্চলের কৃষকদেরকে সংগঠিত

করার চেষ্টা করেন। এতে ব্যাপক সংখ্যক কৃষক তাকে অনুসরণ করলে তিনি হবিগঞ্জ অঞ্চলে একটি কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনে কৃষকরা খাজনা প্রদান বন্ধ করে দেয়। ফলে প্রশাসন মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর শেষ পর্যন্ত হাই কোর্ট কৃষকদের পক্ষে রায় প্রদান করলে রামনাথ বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলনের বিজয় নিশ্চিত হয়।[৩৫]

রামনাথ বিশ্বাস এরপর থেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে যুক্ত থাকেননি। তিনি এরপর থেকে বিশ্ব ভ্রমনে বেড় হন এবং কিংবদন্তী ভূ-পর্যটক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বানিয়াচঙ্গের বিদ্যাভূষণ পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত সৎ ও আদর্শবাদী রামনাথের পিতার নাম ছিল বিরজানাথ বিশ্বাস। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে দেহত্যাগ করেন।

আব্দুল্লাহ বানিয়াচঙ্গী

১৯২০ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে দু'টি আন্দোলন সংঘটিত হয়। এর একটি খেলাফত আন্দোলন ও অন্যটি অসহযোগ আন্দোলন। আব্দুল্লাহ বানিয়াচঙ্গী ২০ বছর বয়সে খেলাফত আন্দোলনে যুক্ত হন। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তব্যের কারণে তিনি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দন্ডিত হন।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বানিয়াচঙ্গে 'দেশবন্ধু পল্লী সমিতি' 'বানিয়াচঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয়' বানিয়াচঙ্গ আঞ্জুমানে ইসলাম' 'বানিয়াচঙ্গ তবলীগ ও তানজিম কমিটি' প্রভৃতি সংগঠনের নামে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আসাম মুসলিম লীগ অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হলে তিনি এর প্রাদেশিক অর্গানাইজার মনোনীত হন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। সিলেট রেফারেন্ডামে জনমত সংগঠনে তিনি রাত-দিন পরিশ্রম করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করে নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদান করেন। তবে তখন থেকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে এবং এক সময় তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। তিনি বানিয়াচঙ্গের তোপখানা মহল্লায় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। 'আব্দুল্লাহ' নামে তখন একাধিক রাজনীতিক থাকায় পরিচিতির সুবিধার জন্য সবাই তাঁর নামের সাথে 'বানিয়াচঙ্গী' শব্দটি যুক্ত করতেন। এ থেকে তিনি আব্দুল্লাহ বানিয়াচঙ্গী হিসেবে সুপরিচিত হয়ে পড়েন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন।

তথ্যনির্দেশ:

১. মঞ্জুলিকা ভট্টাচার্য, প্রবন্ধ: ব্রিটিশ আমলের বরাক উপত্যকার ইতিহাসের উপাদান : মহাফেজখানার দলিলপত্র, *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য,* সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ। পৃষ্ঠা ২৩

২. নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী, *শ্রীহট্ট প্রতিভা,* শ্রীহট্ট ১২৯৪ বাংলা। পৃষ্ঠা ২১

৩. নীরদকুমার গুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি,* শিলচর ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ১০৭

৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৫৮

৫. তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন,* আগামী প্রকাশনী ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ২৪

৬. চঞ্চলকুমার শর্মা, *শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন স্মৃতিকথা*। পৃষ্ঠা ৮৮-৯১

৭. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ,* উৎস প্রকাশন ২০১১। পৃষ্ঠা ৩১

৮. তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন,* আগামী প্রকাশনী ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ২৮

৯. মোহাম্মদ ফারুক আহমদ, প্রবন্ধ: সিলেটে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস প্রথম খণ্ড,* সম্পাঃ মো. আবদুল আজিজ ও অন্যান্য; বৃহত্তর সিলেট ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ ১৯৯৭। পৃষ্ঠা ১০০

১০. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১০১

১১. ডা. মোর্তজা চৌধুরী এর *অপ্রকাশিত ডায়েরি*। পৃষ্ঠা ২৪-২৫

১২. সি. এম. আবদুল ওয়াহেদ, প্রবন্ধ: হবিগঞ্জে খেলাফত আন্দোলন, *মাসিক মদিনা (৯৩ সংখ্যা)* ১৯৯৩।

১৩. ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ,* আলহাজ্ব এম. এ. সাত্তার ১৯৯১। পৃষ্ঠা ১২১-১২২

১৪. নীরদকুমার গুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি,* শিলচর ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ১০২ ও ১৮১

১৫. ক. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ,* উৎস প্রকাশন ২০১১। পৃষ্ঠা ৩৩। খ. তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন,* আগামী প্রকাশনী ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ৩৭

১৬. নীরদ কুমার গুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি,* শিলচর ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

১৭. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ,* উৎস প্রকাশন ২০১১। পৃষ্ঠা ৩৪

১৮. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩৪

১৯. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাতচল্লিশের গণভোট : হবিগঞ্জ প্রসঙ্গ, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, পৃষ্ঠা ১৯২

২০. মুহম্মদ সায়েদুর রহমান, *প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ,* উৎস প্রকাশন ২০১১। পৃষ্ঠা ৩৫

২১. সফর আলী আকন্দ, ১৯৪৭ সালে ভারত বনাম পাকিস্তান প্রশ্নে সিলেটে গণভোট ও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ, *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস প্রথম খণ্ড,* সম্পাঃ মো. আব্দুল আজিজ ও অন্যান্য; বৃহত্তর সিলেট ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ ১৯৯৭। পৃষ্ঠা ১২০

২২. ফজলুর রহমান; *সিলেটের একশত একজন,* ফখরুল কবির খাঁ ১৯৯৪। পৃষ্ঠা ১২৬

২৩. সৈয়দ মোস্তফা কামাল; *প্রসঙ্গ বিচিত্রা,* প্রকাশক: সৈয়দ মোস্তফা মুবিন ২০১০। পৃষ্ঠা ৫১

২৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৫১-৫২

২৫. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৫২

২৬. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৫২

২৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

২৮. নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী, *শ্রীহট্ট প্রতিভা*, সিলেট ১৩৬৮ বাংলা। পৃষ্ঠা ১০৯

২৯. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১০৯

৩০. বিপিনচন্দ্র পাল, *মাহফুজুর রহমান*, বাংলা একাডেমি ১৯৯৯। পৃষ্ঠা ৩৬

৩১. ফজলুর রহমান; প্রকাশনায়, *সিলেটের একশত একজন*, ফখরুল কবির খাঁ ১৯৯৪। পৃষ্ঠা ১২৫-১২৭

৩২. যতীন্দ্র রঞ্জন দে, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের অবদান*, শিলচর ১৯৯৮। পৃষ্ঠা ১১৬

৩৩. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ.বি.বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৯৪। তবে ফজলুর রহমান তাঁর *সিলেটের একশত একজন* গ্রন্থে (পৃ. ১৪৩) মৃত্যুর তারিখ ২৭ আগষ্ট উল্লেখ করেছেন।

৩৪. ফজলুর রহমান, *সিলেটের একশত একজন*, ফখরুল কবির খাঁ ১৯৯৪। পৃষ্ঠা ১৯৮

৩৫. তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন*, আগামী প্রকাশনী ১৯৯৫। পৃষ্ঠা ২৩

নবম অধ্যায়

শিক্ষা ব্যবস্থা

অতি প্রাচীন কালে এ অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি ছিল না। তখন বিদ্যার্থীরা গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা লাভ করতেন। পণ্ডিতেরা ছাত্রদের ভরণ-পোষণ ও পারিতোষিক হিসেবে নিষ্কর ভূমি লাভ করতেন। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে ইটা, পঞ্চখণ্ড, বুরুঙ্গা ও তরফ প্রভৃতি অঞ্চলে টোল ও চতুষ্পাঠী গড়ে উঠেছিল।[১]

চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত শাহজালাল র. কর্তৃক সিলেট বিজয়ের কালেই যে হবিগঞ্জ অঞ্চলে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা ছিল তা কবি জয়ানন্দ রচিত চৈতণ্যমঙ্গল গ্রন্থসূত্রে জানা যায়। এতে কবি সেকালের জয়পুর গ্রামকে[২] একটি সুদৃশ্য ও সমৃদ্ধ নগর হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এতে বলা হয়েছে :

শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
সর্ব্বসুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপম ॥
দীঘী সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
দেউল দেহরা মঠ নানা পুষ্পোদ্যান ॥
সুতার সঞ্জম ঘর নগর চত্বর।
ইষ্টকারয়িত দ্বার প্রাচীর ভিতর ॥
নাটশাল পাঠশাল চৌখণ্ডী বাঙ্গালী।
ধ্বজ কলহংস পারাবত করে কেলি ॥

এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জয়পুরে তখনই পাঠশালা এবং নাট্যশালাও ছিল। অর্থাৎ সেকালেই এখানে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা ও বিনোদনের ক্ষেত্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে সমস্ত বঙ্গদেশে যিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন সেই নীলাম্বর চক্রবর্তী এই জয়পুরবাসী ছিলেন।[৩]

সুলতানী আমল থেকে ফার্সি রাজভাষার মর্যাদা লাভ করায় অফিস-আদালতে ফার্সি ভাষারই প্রচলন ছিল। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ-কর্মচারিকে ফার্সি শিখতেই হতো। আরবি ও ফার্সি ইসলামী শিক্ষার বাহন বিবেচিত হওয়ায় মাদ্রাসা-মক্তবে এ শিক্ষাই চালু ছিল। তরফ অঞ্চলে মুসলিম অভিবাসনের কাল থেকেই আরবি-ফার্সি ভাষার চর্চা শুরু হয়। মুসলিম জনসমাজের উত্তরোত্তর প্রসারের ফলে সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের নিমিত্তে স্থানে স্থানে আরবি ও ফার্সি ভাষার মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপিত হতে থাকে। বিভিন্ন দূর এলাকা থেকে জ্ঞান লাভের জন্য মানুষ আসতেন। এখানকার বহু শিক্ষিত জন দিল্লী ও মুর্শিদাবাদে শিক্ষকতা ও রাজ কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়ে ছিলেন।

হবিগঞ্জের একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, ‘জাগার নাম তরফ, ঘরে ঘরে হরফ।’ অর্থাৎ তরফ বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত ছিল। প্রতি ঘরেই শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা ছিল। এ থেকেই বুঝা যায়, প্রাচীন কালে লস্করপুর তথা তরফ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারতা কতটা ব্যাপক ছিল।

মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান অতি বিনয়ের সাথে তাঁর আত্ম-পরিচয়ে বলেন,

লস্করের পুর খানি আলিম বসতি
মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।

মুসলিম বিজয়ের পর থেকেই এখানে আরবি ও ফার্সি শিক্ষার প্রতি যত্ন নেয়া হয়। তখনই এখানে অনেকগুলো মক্তব-মাদ্রাসা গড়ে উঠে। তরফের শিক্ষিত আলিমগণ দিল্লীর বাদশাহ ও গৌড়ের সুলতানগণের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হতেন। শামস-উল-উলামা, মুলক-উল-উলামা, কুতুব-উল-আউলিয়া প্রভৃতি খেতাবধারী আলিম ও সূফীগণের জন্মস্থান এই তরফ।

তৎকালীন হবিগঞ্জ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের যে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছিল তার প্রমাণ সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী-গুণীজন। সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দীনের পৌত্র সৈয়দ ইব্রাহিম সে আমলেই দিল্লীর বাদশাহ থেকে ‘মালিক-উল-উলামা’ এবং সৈয়দ ইসরাইল ‘মুলক-উল-উলামা’ খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ ইসরাইল ফার্সি ভাষায় ‘মদনুল ফওয়ায়েদ’ নামে কিতাব লিখেন। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান এ বংশেরই কৃতি পুরুষ।

পৈলের সৈয়দ বংশীয় পীর বাদশাহ ফার্সি ভাষায় ‘গন্‌জে তরাজ’ নামে কিতাব লিখেন। একই বংশের শাহ সৈয়দ রেহান উদ্দীন ফার্সি ভাষায় উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখে দিল্লীর সম্রাট থেকে ‘বুলবুলে বাঙ্গালা’ খেতাব পান। তাঁর লিখা ‘মসনভী-ই-বাকুয়ালী’ উর্দু সাহিত্যের এক বিশেষ অবদান।

বানিয়াচঙ্গের মৌলবী মোহম্মদ আরশাদ মোগল আমলেই ‘জরুরুল মোছান্নেফ’ নামক কিতাব লিখেন। এছাড়াও ব্রিটিশপূর্ব কালে এ অঞ্চলের বহু গুণীজন শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান রেখে যশস্বী হয়েছেন।

মোগল আমলে তরফ অঞ্চলে কয়েকটি খারিজিয়া মাদ্রাসা ছিল বলে জানা যায়। নানা সূত্রে জানা যায়, মক্তব নামের এসব মাদ্রাসা মূলত টুল জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল। গ্রামীণ সমাজের কিছু কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি এসব টুলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ফার্সি শিক্ষা প্রদান করতেন। সেখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর আগ্রহী কোনো কোনো ছাত্র মুর্শিদাবাদ বা সুবিধামত অপরাপর শহরে গিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হতেন।

হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সাধারণত নিজ নিজ বাড়িতে বাঙলা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। বানিয়াচঙ্গের কমলা নারায়ণ নামে একজন প্রতিভশালী ব্যক্তি পারস্য, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সেখানে প্রথমে পারস্য ভাষা শিক্ষা দিতেন। পরে সেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিজে শিক্ষকতা করতেন।[৪]

তৎকালে সমগ্র পূর্ববঙ্গে ইংরেজির প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি তেমন ছিলেন না। উচাইলের জমিদার ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত। তাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত বিদ্যালয় থেকে ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ এলাকার বহু ছাত্র জ্ঞান লাভ করেছেন।[৫]

ব্রিটিশ শাসন কালেও অফিস আদালতে ফার্সি ভাষার প্রচলন ছিল। দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মানুষ কর্মপেশায় নিয়োজিত হতেন। ফার্সি শিক্ষা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন:

> *আজিকালি যেমন ইংরেজ সরকারের চাকুরী কিম্বা আদালতে ওকালতি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য লোকে ইংরেজি শিখিয়া থাকে সেকালে সেইরূপ যাহাদিগকে সচরাচর ভদ্রলোক বলে তাঁহারা যত্ন করিয়া ফার্সি শিখিতেন। এখন যেমন আইন আদালতের ভাষা হইয়াছে ইংরেজি, নবাবী আমলে সেইরূপ ফার্সি আমাদের দেশের রাজভাষা ছিল। যাঁহাদের রাজসরকারে চাকুরী করিবার লোভ ছিল তাঁহারা ফার্সি শিখিতেন।*[৬]

তিনি অন্যত্র বলেন :

> *আমাদের গ্রামে বাল্যকালে টোল এবং মোক্তব দুই ছিল। প্রতিবেশী মুসলমান জমিদারদের ভদ্রাসন-সংলগ্ন মসজিদে ফার্সি পাঠশালা ছিল। বিদ্যালঙ্কার উপাধিধারী এক অধ্যাপকের বাড়িতে একটি টোল ছিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ বালকেরা এই টোলে সংস্কৃত পড়িতেন; অন্যান্য গ্রাম থেকেও অনেকে এই টোলে সংস্কৃত পড়িতে আসিতেন, এবং এইখানেই থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেন।*
>
> *এই সকল ছাত্রেরা গ্রামের সম্পন্ন ভদ্রলোকদিগের বাড়িতে থাকিতেন; ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার এ সকল গৃহস্থেরাই গ্রহণ করিতেন। বাবা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশ থাকিতেন, কিন্তু বাড়িতে দেবপূজাদি বা অতিথি অভ্যাগতদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা ছিল। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ বিদেশে থাকিতেন বলিয়া গার্হস্থ্যোচিত কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি হইত না।*[৭]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের শেষ সময়ে **১৮৩৫** খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। **১৮৩৬** খ্রিস্টাব্দে সিলেটে প্রথম ইংলিশ স্কুল (পরবর্তী কালের সিলেট গভর্নমেন্ট পাইলট হাইস্কুল) স্থাপন করা হয়।[৮] কিন্তু ছাত্রাভাবে কিছুকাল পরে তার কার্যক্রম স্থগিত হয়ে পড়ে।[৯] **১৮৩৭** খ্রিস্টাব্দে সরকার ফার্সি ভাষার প্রচলন বন্ধ করার পরও হিন্দু মুসলমান কেউই ইংরেজি শিক্ষায় তেমন আগ্রহ বোধ করেনি।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাবু রামতারক রায়ের চেষ্টায় তরফে একটি জুনিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০] **১৮৫৯** খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলায় সরকারি অনুদানপুষ্ট যে ৭টি এ্যাংলো-ভারনাকুলার (Anglo-Vernacular) স্কুল ছিল তন্মধ্যে তরফের লস্করপুরে স্থাপিত এ স্কুলটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১১] বিদ্যালয়টি পরবর্তীতে হবিগঞ্জ মহকুমা সদরে স্থানান্তর করা হয়।[১২] যা বর্তমান কালের হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় বলে জানা যায়।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুরের প্রাক্তন মুন্সেফ বাবু কাশীনাথ দাস লস্করপুরে একটি ইংরেজি মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩] **১৮৬৭** খ্রিস্টাব্দের তথ্য মোতাবেক উক্ত স্কুলের বার্ষিক সরকারি অনুদান

৩১৬ টাকা ৪ আনা ৯ পাই এবং বেসরকারি উৎস থেকে প্রাপ্ত ২৩০ টাকা ১৪ আনায় ব্যায় নির্বাহ হতো।[১৪]

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলায় ২৮টি শিক্ষাকেন্দ্র এবং ১১২৭ জন ছাত্রের তথ্য জানা যায়। এই ছাত্র সংখ্যার অর্ধেকেই সিলেট শহরে থেকে লেখাপড়া করতো।[১৫]

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের গভর্নমেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু তখন আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের উপযোগী শিক্ষকের তীব্র অভাব ছিল। এ অবস্থা দূরীকরণের জন্য অর্থাৎ পাঠদান বিষয়ে প্রশিক্ষণের নিমিত্তে সরকারি প্রচেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। কয়েক বছরে শিক্ষকের অভাব পূর্ণ হলে স্কুলটির কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।[১৬] এরপর থেকে বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগী অনেকগুলো প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলো পরবর্তী কালে হাইস্কুল হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মাছুলিয়ার চৌধুরীগণ কর্তৃক সেখানে 'মাছুলিয়া বঙ্গবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৭] সমসাময়িক কালে হবিগঞ্জে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যে তরফের ইতিহাসে বলা হয়েছে:

> *বর্ত্তমান সময়ে হবিগঞ্জে একটা এন্ট্রান্স স্কুল ও ইহার এলাকায় ৪টা মাইনর স্কুল, ৬টা ছাত্রবৃত্তি স্কুল, ৭টা ইন্টারমিডিয়েট স্কুল এবং ৭০টি পাঠশালা আছে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় সাহায্যে কতকগুলি স্কুলের কার্য্য চলিতেছে। এখানে উচ্চ শিক্ষার আধিক্য না থাকিলেও অন্যান্য স্থানের তুলনায় সাধারণ শিক্ষার ভাগ অধিক। ইংরাজী ভাষার প্রতি মুসলমানদের পূর্ব্ব হইতেই ভয়ানক ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইংরাজী শিখিলেই নরকগামী হইতে হইবে এবং ইংরাজী পড়াইয়া খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।*[১৮]

তরফের ইতিহাসে বর্ণিত সময়কালের[১৯] পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের তথ্যমতে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জে মিরাশী (চুনারুঘাট) এম. ই. স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[২০]

সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের তথ্যমতে, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় হবিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল।[২১] কিন্তু সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের সময় সেখানে মাত্র দু'টি প্রাইমারি স্কুল থাকার কথা বলা হয়েছে।[২২] সে কারণে হবিগঞ্জ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সালটি প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুরে স্থাপিত স্কুলটিই পরবর্তীতে হবিগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে মেনে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়।[২৩]

স্কুলটি সরকারিকরণের পর হতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে থাকে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ২০ জনের মেধা তালিকায় প্রথম, ষষ্ঠ, অষ্টম ও বিংশতম স্থান দখল করেন এ স্কুলের ৪ জন ছাত্র। তাছাড়া মোট পরীক্ষার্থী ৪০ জনের মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১০ জন ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন এই ৩৮ জন পাস করে স্কুলটি অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করে।[২৪]

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে আদাঐর লোকনাথ স্কুল (মাধবপুর), ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে নবীগঞ্জ জে. কে. হাইস্কুল, ১৯১৮ খ্রি. শায়েস্তাগঞ্জ (হবিগঞ্জ) হাইস্কুল, ১৯২১ খ্রি. জে. কে. এন্ড এইচ. কে. হাইস্কুল (হবিগঞ্জ) ও ছাতিয়াইন বি. এন. হাইস্কুল (মাধবপুর), ১৯২৬ খ্রি. জগদীশপুর জে. সি. হাইস্কুল (মাধবপুর), ১৯২৮ খ্রি. ডি. সি. হাইস্কুল (চুনারুঘাট), ১৯৩০ খ্রি. এ. এ. বি. সি হাইস্কুল (আজমিরীগঞ্জ), ১৯৩৩ খ্রি. আন্দিউড়া হাইস্কুল (মাধবপুর), ১৯৩৫ খ্রি. ষাটিয়াজুরী হাইস্কুল (চুনারুঘাট), ১৯৩৭ খ্রি. ডি. এন ইনস্টিটিউশন (বাহুবল), ১৯৪১ খ্রি. আউশকান্দি আর. পি. হাইস্কুল (নবীগঞ্জ) ও কালিকাপুর হাইস্কুল (মাধবপুর), ১৯৪৫ খ্রি. দিনারপুর হাইস্কুল (নবীগঞ্জ), খুর্শিদ হাইস্কুল (মাধবপুর), লাখাই এ. সি. আর. সি. (লাখাই) এবং সাউথ কাশিমনগর হাইস্কুল (মাধবপুর) প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৎকালে নারী শিক্ষার বিষয়ে সাধারণ মানুষ খুবই অনাগ্রহী ছিলেন। সমগ্র দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা আগ্রহ জন্মালেও মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। হবিগঞ্জের চিত্র এর ব্যতিক্রম ছিল না। তবে তখন থেকেই যে হবিগঞ্জ অঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তরফের ইতিহাসে। এতে বলা হয়েছে :

> *কয়েকজন কৃতবিদ্যা যুবকের উৎসাহে তরফে ৩টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার একটি চর হামুয়ায়, দ্বিতীয়টি সুখরে, তৃতীয়টি দাউদ নগরে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, দাউদ নগরের বালিকা বিদ্যালয়ে নাকি ২/৩টি সম্ভ্রান্ত মুসলমান বালিকা বাঙ্গালা শিখিতেছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাহারা কৃতকার্য্য হউক।*[২৫]

বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যায়, ব্রিটিশ আমলে হবিগঞ্জ অঞ্চলের মাধবপুর থানায় ৭টি, হবিগঞ্জ ৩টি, চুনারুঘাট ৩টি, নবীগঞ্জ ৩টি, বাহুবল ১টি, লাখাই ১টি ও আজমিরীগঞ্জে ১টি মোট ১৯টি মাধ্যমিক স্তরের ও একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের (হবিগঞ্জ) শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হবিগঞ্জ অঞ্চলে শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন ও বিস্তৃতি ঘটে।

বৃন্দাবন কলেজ প্রতিষ্ঠা[২৬]

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে[২৭] হবিগঞ্জ শহরের মনোহরগঞ্জ বাজার নামক স্থানে 'হবিগঞ্জ কলেজ' নামে একটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। বাজারটি বর্তমান কলেজ চত্বর থেকে উত্তর দিকে একশত গজের মধ্যে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। একটি লম্বা বাঁশের ঘরে ক্লাস এবং ছোট্ট একটি একতলা বিল্ডিংয়ে পার্টিশন দিয়ে অধ্যক্ষ, অফিস ও শিক্ষকদের বসার ব্যবস্থা হয়। প্রথম দিকে অনেক চেষ্টা-তদবির করে ৩০/৩৫ জন ছাত্র সংগ্রহের মাধ্যমে পাঠদান কর্মসূচি চালু করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করা ক'জনকে ফুলটাইম ও হবিগঞ্জ বারের কয়েকজন এম এ পাস আইনজীবীর খণ্ডকালীন (অবৈতনিক) শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হয়। ইংরেজির শিক্ষক প্রমোদ রঞ্জন গোস্বামী ভারপ্রাপ্ত হিসেবে প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

যাত্রার প্রারম্ভেই শিক্ষার মান ভাল করলেও এফিলিয়েশনের প্রশ্নে সৃষ্টি হয় সমস্যা। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফিলিয়েশন নিতে হতো। এফিলিয়েশনের জন্য ১০ হাজার টাকার রিজার্ভ

ফাণ্ড এবং কোনো প্রাদেশিক সরকারের রিকগনিশন তখন শর্ত ছিল। এ টাকার জন্য বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে বার বার ধর্ণা দিয়েও কোনো লাভ না হওয়ায় সাংগঠনিক কমিটি সিদ্ধান্ত নিলো, যদি কেউ এককালীন ১০ হাজার টাকা বা তার সমমূল্যের সম্পদ কলেজকে দান করেন তবে তার ইচ্ছামাফিক নামকরণ করা যাবে। কিন্তু এতেও কোনো কাজ হয়নি।

তখন রায় সাহেব নদীয়া চান্দ দাস পুরকায়স্থ নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন সিলেটের ইন্সপেক্টর অব স্কুলস। তিনি একদা সরকারি কাজে হবিগঞ্জ এসে তাঁর আত্মীয় সিলেট লোকেল বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, হবিগঞ্জ বারের আইনজীবী ও কলেজের অন্যতম উদ্যোক্তা গিরীন্দ্র নন্দন চৌধুরীর বাড়িতে উঠেন। গিরীন্দ্র বাবুর কাছ থেকে কলেজের সমস্যার কথা এবং সমাধানের জন্য নানা ব্যক্তিসহ বানিয়াচঙ্গ থানাধীন বিথঙ্গল পরগণাস্থ শ্রীমঙ্গল গ্রামের বৃন্দাবন চন্দ্র দাসের বিষয় অবগত হন। বৃন্দাবন চন্দ্র দাস গিরীন্দ্র বাবুরই মক্কেল ছিলেন। নদীয়া বাবু তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হয়ে পরদিনই গিরীন্দ্র বাবুকে সাথে নিয়ে বিথঙ্গল যাত্রা করেন। সেখানে তিনি বৃন্দাবন দাসকে নানাভাবে বুঝিয়ে রাজি করাতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত দাসবাবু বুঝার জন্য কিছু সময় চাইলে তাতে তাঁরা সম্মত হয়ে পরদিন উত্তরের জন্য পুনরায় বিথঙ্গল যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

বিথঙ্গল যাবার পর বৃন্দাবন দাস তাঁর মায়ের সম্মতিক্রমে এই শর্তে রাজি হন যে, রায় সাহেব কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। নদীয়া বাবুরা তাতে সম্মত হয়ে হবিগঞ্জ ফিরে আসেন। সাংগঠনিক কমিটিকে এ সংবাদ দেবার পর সবাই একজন ভাল অধ্যক্ষ খোঁজার চেষ্টা করেন। অতঃপর রায় সাহেব তাঁর আত্মীয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (খণ্ডকালীন) এবং রিপন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক বিপিন বিহারী দে'কে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের জন্য রাজি করান। বিপিন বিহারী দে খুবই মেধাবি ছিলেন। তিনি মাসিক ২৫ টাকা বেতনে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে যোগদান করেন। তখন অন্যান্য শিক্ষকের মাসিক বেতন ধার্য হয় ১৬ টাকা।

অধ্যক্ষ যোগদানের পরই বৃন্দাবন বাবুকে আহবান জানানো হয় তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য। তিনি আসার পর সাংগঠনিক কমিটি কলেজের নাম 'বৃন্দাবন চন্দ্র কলেজ' নামকরণের কথা জানালে তিনি শুধু 'বৃন্দাবন কলেজ' এবং তাঁর পুরোহিতের ছেলে সুরেশ চক্রবর্তীকে কলেজের হেড ক্লার্ক নিয়োগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সাংগঠনিক কমিটি তাতে সম্মতি প্রকাশের পর তিনি ৩ হাজার টাকা নগদ এবং বাকি ৭ হাজার টাকার হ্যান্ডনোট জমা করেন। কিন্তু স্থায়ী সম্পত্তি হিসেবে হ্যান্ডনোট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় পরবর্তীতে তিনি এর পরিবর্তে ৬০ কেদার জমি কলেজের নামে এই শর্তে দান করেন[২৮] যে, ৭ হাজার টাকা জমা দিলে ৬০ কেদার জমি ফেরত দেয়া হবে।

বৃন্দাবন চন্দ্র দাস প্রদত্ত ৩,০০০ টাকা ও ৬০ কেদার জমি রিজার্ভ ফান্ড দেখিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বৃন্দাবন কলেজ' নামে এফিলিয়েশন প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর শর্ত প্রাদেশিক সরকারের রিকগনিশন প্রশ্নে আবার সমস্যা সৃষ্টি হয়। তখন আসাম সরকার নীতিগত ভাবে কোনো মহকুমা শহরে কলেজের রিকগনিশন দিতে অসম্মত হয়। এমতবস্থায় অধ্যক্ষ বিপিন বিহারী দে তাঁর বন্ধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জীর ছেলে রমা প্রসাদ মুখার্জীর সহায়তায় প্রথমে বেঙ্গল সরকারের রিকগনিশন এবং পরে কলেজের এফিলিয়েশন লাভে সক্ষম হন। তবে অন্য সূত্রে এর একটি বিপরীত তথ্যও জানা যায়। সেমতে, কলেজটির

প্রতিষ্ঠাকালে আসাম গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর ছিলেন চুনারুঘাটের রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত। তিনি এর পূর্বে আসামের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্ঠা ও উদ্যোগে হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজ ও সিলেটের মদন মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়। তখন এ দু'টি কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতিও ছিলেন তিনি।[২৯]

এফিলিয়েশন লাভের পর বৃন্দাবন কলেজ হয় আসাম প্রদেশে চতুর্থ কলেজ। এর পূর্ব পর্যন্ত আসামের শিলংয়ে ১টি, গৌহাটিতে ১টি ও সিলেটে ১টি (মুরারী চাঁদ কলেজ) এই ৩টি কলেজ ছিল।

দুর্ভাগ্যবশত দলিল সম্পাদনের মাত্র ৫ মাসের মাথায় বৃন্দাবন চন্দ্র দাস মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে ৭ হাজার টাকার ২ হাজার টাকা সুদসমেত ৯ হাজার টাকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬০ কেদার জমি বৃন্দাবন দাসের উত্তরাধিকারীকে ফেরত দেয়া হয়। এতে কলেজের রিজার্ভ ফান্ড ১২ হাজার টাকায় উন্নীত হয়।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজ কেন্দ্র থেকে প্রথম বারের মতো আই এ পরীক্ষায় ৩১ জন ছাত্র অংশ নিয়ে সবাই পাস করে। এ ফলাফল ও অধ্যক্ষের বিশেষ তৎপরতায় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই এ কলেজ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন পায়।

দুর্ভাগ্যবশত ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বিপিন বিহারী দে মৃত্যুবরণ করলে অধ্যক্ষ হন কলেজের সিনিয়র অধ্যাপক দ্বিজদাস চৌধুরী। তিনিও যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ১৯৩৯-৪০ শিক্ষাবর্ষে বি.এ.(পাস) কোর্স এবং ১৯৪০-৪১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজি, পলিটিক্যাল ইকনোমি ও পলিটিক্যাল ফিলোসফি এই তিনটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করতে সক্ষম হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগের পর কলেজ চলে আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তখন কলেজে অনার্স কোর্স পড়ার বিধান না থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সব কলেজ থেকে অনার্স কোর্স উঠিয়ে নেয়া হয়।

দেশ ভাগের পর দ্বিজদাস ভারতে চলে গেলে দুই বছর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেজর ডব্লিউ আর মেকোলিফ নামের একজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা। তাঁর সময়ে ১৯৪৯-১৯৫০ শিক্ষাবর্ষে ইন্টারমিডিয়েটে কমার্স কোর্স চালু হয়। এরপরে ১৯৫৩-১৯৫৪ শিক্ষাবর্ষে বিকম (পাস) কোর্স চালু হয়। ১৯৬০-১৯৬১ শিক্ষাবর্ষে ইন্টারমিডিয়েটে সাইন্স কোর্স চালু হয়। ১৯৬৭-১৯৬৮ শিক্ষাবর্ষে বিএসসি (পাস) কোর্স চালু হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক কাজী আইয়ুব আলীকে প্রেষণে এ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে সরকার কর্তৃক নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে কলেজে মিলনায়তন ও লাইব্রেরি ভবন নির্মিত হয়। এ সময়ে বৃন্দাবন কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গঠন করে এর মাধ্যমে কলেজকে জাতীয়করণের দাবি জোরদার করা হয়।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে খোয়াই নদীর গতিপথ পরিবর্তন করার সময়ে তার অগ্রগতি দেখার জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হবিগঞ্জ আসেন। সে সময়ে তিনি খোয়াই নদীর তীরে অনুষ্ঠিত জনসভায় বৃন্দাবন কলেজকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী ০৭-০৫-১৯৭৯

তারিখ থেকে তা কার্যকর হয়। সরকারিকরণের পর ৭ মে থেকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাদেকুর রহমান। ২৮ জানুয়ারি '৮০ থেকে অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বৃন্দাবন সরকারি কলেজের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন।

বর্তমানে যে স্থানে কলেজ ক্যাম্পাস বিদ্যমান সে স্থানটি সিভিল কোর্টের জায়গা ছিল। এর ২.৯৯ একর জায়গা মুন্সেফদের বাসস্থানের জন্য নির্ধারিত ছিল। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে আসাম সরকার এই ২.৯৯ একরসহ মোট ৩ একর ২৭.৫ শতাংশ ভূমি নিষ্কর হিসেবে কলেজের অনুকূলে লিজ দান করে। পরবর্তীতে অধ্যক্ষের বাসস্থানের জন্য পুরাতন হাসপাতাল সড়ক এলাকায় ও ছাত্রাবাসের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন রোডে পাকিস্তান সরকার সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ করে কলেজের অনুকূলে দান করে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে কলেজ সংলগ্ন জেলখানা শহরের বাইরে ধুলিয়াখাল এলাকায় স্থানান্তরিত হলে বাংলাদেশ সরকার সে স্থানটি কলেজের অনুকূলে হস্তান্তর করে। সেখানে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ভবন এবং ছাত্রীদের হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কলেজসমূহে পুনরায় অনার্স কোর্স চালু হয়। কিন্তু উপযুক্ত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় বৃন্দাবন কলেজ এর সুফল পায়নি। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলেজ ছাত্র সংসদ গঠিত হলে এর অভিষেক অনুষ্ঠানে আসেন তৎকালীন পাট মন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। সে অনুষ্ঠানে কলেজের পক্ষ থেকে কলেজের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও অনার্স কোর্স পুনরায় চালু করার দাবি উত্থাপিত হয়। অনার্স কোর্স চালু করতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন আবশ্যক বিধায় তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর সুপারিশের আশ্বাসসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরীর ঘোষণা দেন।

নানা রকম তদবির ও লেখালেখির ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে কলেজে ১. বাংলা ২. পদার্থ বিজ্ঞান ৩. প্রাণী বিজ্ঞান ৪. উদ্ভিদ বিজ্ঞান ৫. হিসাব বিজ্ঞান ৬. ব্যবস্থাপনা ৭. দর্শন এই সাতটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১. ইংরেজি ২. অর্থনীতি ৩. রাষ্ট্র বিজ্ঞান ৪. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫. গণিত ৬. রসায়ন বিজ্ঞান ৭. ইতিহাস ৮. ইসলামী শিক্ষা এই ৮টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হলে বর্তমানে অনার্স কোর্সের সংখ্যা উন্নীত হয় ১৫টিতে।

ইতোমধ্যে ১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. অর্থনীতি ৪. রাষ্ট্র বিজ্ঞান ৫. হিসাব বিজ্ঞান ৬. ব্যবস্থাপনা ৭. প্রাণী বিজ্ঞান ৮. দর্শন এই ৮টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ:

১. কমলাকান্ত গুপ্ত, *কপার প্লেইট অব সিলেট*, সিলেট ১৯৬৭। পৃষ্ঠা ১৩৯

২. বাহুবল উপজেলার মীরপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম জয়পুর। এটি বর্তমান মীরপুর বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত।

৩. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩১১

৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩১৯

৫. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, প্রথম ভাগ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৬৩

৬. বিপিনচন্দ্র পাল, *সত্তর দশক : আত্মজীবনী*, যুগযাত্রী প্রকাশনী, কলিকাতা ১৩৬২। পৃষ্ঠা ২৭

৭. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ২৮

৮. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 423

৯. মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ, *শ্রীহট্ট দর্পণ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ২৫

১০. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৩১

১১. Genaral Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1867-68, Calcutta, Secretariat Press 1868. Page 126

১২. মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, *হবিগঞ্জের ইতিহাস*, প্রকাশক: আখতারুন্নেসা নার্গিস ২০০৭। পৃষ্ঠা ৭৮

১৩. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৩১

১৪. Genaral Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1867-68, (Calcutta, Secretariat Press 1868. Page 126

১৫. Principal Heads of the History and statistics of the Dacca Division 1868. Page 326

১৬. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, প্রথম ভাগ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪

১৭. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৭৬

১৮. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৩১

১৯. *তরফের ইতিহাসর* উপক্রমণিকায় সৈয়দ আবদুল আগফর ১২৯২ সালের ২৭ চৈত্র উল্লেখ করেছেন। এর প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে ১২৯৪ সাল। সে হিসেবে বর্তমান ১৪২৫ সালে (১৪২৫−১২৯৪) ১৩১ বছর হয়। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩১ বৎসর পেছনের গেলে (২০১৮−১৩১) এর ইংরেজি সন দাঁড়ায় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং তিনি যে সিলেটের আসামভুক্তির পর হবিগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার স্বল্পকাল পরবর্তী সময়ের তথ্যই দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রাসঙ্গিক কারণেই এখানে তরফের ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট উৎস-সংস্করণের একটি ভুলের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উক্ত সংস্করণটির ভূমিকা লিখেছেন শেখ ফজলে এলাহী। তিনি তার ভূমিকার শুরুতেই প্রকাশকাল ১২৯৪-এর স্থলে ১২১৪ এবং ১২৯২-এর স্থলে ১২১২ লিখে বইটির সময়কাল সম্পর্কিত একটি বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছেন। গ্রন্থের প্রকাশকাল হিসেবে 'প্রথম সংস্করণ : ১২১৪ বঙ্গাব্দ' এবং ভূমিকার পূর্ব-পৃষ্ঠায় আখ্যাপত্রের ছবি দিয়ে (প্রকাশকাল কিছুটা অস্পষ্ট থাকায়) ক্যাপশন এবং প্রকাশকের 'প্রসঙ্গ-কথা'য়ও '১২১৪ বঙ্গাব্দ' উল্লেখ করায় বিভ্রান্তির ভিত্তি আরো শক্ত হয়েছে। ১২১২ বা ১২১৪ বঙ্গাব্দের ধারণা যে ভুল তার আরো প্রমাণ হল, লেখক তাঁর বইয়ে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের তথ্যও উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৭৯)। ১২১২ সালে ১২৯৩ সালের তথ্য উল্লেখ করা কি সম্ভব? ভূমিকা লেখক কোনো ভাবেই এই ভুলের দায় এড়াতে পারেন না। এটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, অসাবধানতাবশত পাঠক ১২১৪ বঙ্গাব্দের সময়কাল হিসেব করলে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায় নির্দেশ করবে যা বাস্তবতার পরিপন্থী।

২০. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*, Page 424. পরবর্তীতে উল্লেখিত স্কুল সমূহের প্রতিষ্ঠার সনও সংশ্লিষ্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখিত তালিকা থেকে নেয়া।

২১. *Ibid,* Page, 424

২২. *Ibid,* Page, 379

২৩. প্রফেসর নিখিল ভট্টাচার্য, প্রবন্ধঃ বৃন্দাবন কলেজ, *আমার হবিগঞ্জ, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা তৃতীয় সংখ্যা*। পৃষ্ঠা ৯২

২৪. মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, *হবিগঞ্জের ইতিহাস*, প্রকাশক: আখতারুন্নেসা নার্গিস ২০০৭। পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

২৫. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৩২

২৬. *আমার হবিগঞ্জ*, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা পুস্তকে (পৃ. ৯২-১০৫) প্রকাশিত প্রফেসর নিখিল ভট্টাচার্যের 'বৃন্দাবন কলেজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সঙ্কলিত এবং আবশ্যক ক্ষেত্রে কলেজের দফতর ও অন্যান্য সূত্র থেকে সংযোজনকৃত।

২৭. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gezetteers Sylhet (1970)*. Page 426

২৮. রেজিস্টার্ড দানপত্র দলিল নং ২০২৪ তাং ০৫-০৪-১৯৩২।

২৯. ক. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ.বি.বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৯৪। খ. ফজলুর রহমান, *সিলেটের একশত একজন*, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৩

দশম অধ্যায়

হবিগঞ্জ নামকরণ বিতর্ক

কথিত আছে, সুলতানশী সৈয়দ বংশের অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর পুত্র সৈয়দ হবিব উল্লা খোয়াই নদীর তীরে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন– যার নামকরণ করা হয়েছিল 'হবিবগঞ্জ'। কালক্রমে 'হবিবগঞ্জ' পরবর্তীতে 'হবিগঞ্জ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই হবিগঞ্জ নামকরণের এই তথ্যটি সবাই গ্রহণ করেছেন। জানা যায়, একটি বাজার থেকে গড়ে উঠা এই হবিগঞ্জ শহর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে সাবডিভিশনের মর্যাদা লাভ করে।

সবাই জানি ইতিহাস একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের অনিবার্য কষাঘাতে নানা সময়ে নানান তথ্য সংশোধন হয়েছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। বর্তমানে একটি জেলা হিসেবে বাংলাদেশে হবিগঞ্জ-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর প্রাচীনকালীন তথ্যের অপ্রতুলতার দরুন অনেকে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য গবেষণা-অনুসন্ধান করছেন। সে হিসেবে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় নাম সম্পর্কিত পুরনো তথ্যানুসন্ধানের যে চেষ্ঠা করা হয়েছে নিম্নে তা-ই তুলে ধরা হলো।

ইবনে বতুতার হবঙ্ক এবং হবিগঞ্জ

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিলেটকে ৪টি সাবডিভিশনে বিভক্ত করার যে প্রস্তাব করা হয় তাতে আকস্মিক ভাবে 'হবিগঞ্জ' নামটি চয়ন করার পেছনে প্রাচীন কালের গৌরবময় 'হবঙ্গ' নামের কোনো সম্পর্ক আছে কি-না তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু যেখানে তৎকালে রাজস্ব জেলা 'লস্করপুর' ছিল সমগ্র সিলেটের একটি অন্যতম অগ্রসর এলাকা[১]; সিলেটের প্রধান বিচারালয়ও অতীতে সেখানেই ছিল[২] এবং যেহেতু ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠাকালে সেখানেই প্রথম কার্যালয় স্থাপন সত্ত্বেও নামকরণ 'হবিগঞ্জ' করা হয়েছিল সেহেতু বিষয়টির বাস্তবতা অনুসন্ধানের দাবি রাখে। সব রকমের যোগাযোগ সুবিধা থাকা এবং শত শত বৎসরের প্রশাসনিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও সে স্থান বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নৌ-যোগাযোগ সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন একটি খোলাবাজার কেন্দ্রীক দূরবর্তী কোনো এলাকায় হঠাৎ করে সাবডিভিশনের মতো একটি নতুন ও বৃহৎ প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপনের মধ্যে কী তত্ত্ব ছিল?

অনুসন্ধানে দেখা যায়, প্রাচীন শ্রীহট্টের ইতিহাসে 'হবঙ্ক' নামে একটি স্থানের তথ্য আছে। ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা হযরত শাহজালাল (র.)-এর সাথে দেখা করেছিলেন। এইচ. এ. আর. গিব ইবনে বতুতার ভ্রমন বৃত্তান্ত অনুবাদ করেন। তাতে সংশ্লিষ্ট বর্ণনার হবং শহর

ও নীল নদ সম্পর্কিত মন্তব্যে তিনি বলেন, 'বরাকের বাঁ তীরে আজও টিলা বা ছোট ছোট পাহাড় আছে যাকে হাবাং [Habang] বলা হয়। জায়গাটা হবিগঞ্জের সামান্য দক্ষিণে।[৩]

বাংলাপিডিয়ায় 'হবঙ্ক' শহরকে 'হবিগঞ্জ' বলা হয়েছে।[৪] শামসুল আলম একটি বিশ্লেষণে বলেন, আমরা মনে করি বর্তমান হবিগঞ্জ শহরই ইবনে বতুতার কথিত হবংক।'[৫] ড. ওয়াকিল আহমদ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'হবংক বর্তমানে হবঙ্গ টিলা নামে অভিহিত– হবিগঞ্জ শহর থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে' অবস্থিত।[৬] কিন্তু বাস্তবে হবিগঞ্জ শহরের ১০ মাইল দক্ষিণে এরকম কোনো টিলা নেই।

নবীগঞ্জের দিনারপুর পরগণায় হাবাংকিয়া নামে একটি পাহাড় ছিল বলে জানা যায়। কারো কারো মতে এই পাহাড়ের নাম হানাফিয়া। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে এই নামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হাবাংকিয়া, হবংগ, হবংক ইত্যাদি নামে এই পাহাড় পরিচিত ছিল বলে জানা যায়। Travels of Ibn Batuta গ্রন্থে Dr. Samuel Lee এটাকে 'জবং' [Jabang] বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সেটেলমেন্ট জরিপে এই পাহাড়ের নাম লেখা হয়েছে আবাংগি টিলা।[৭]

দিনারপুরের সদরঘাট একটি সুপ্রাচীন নদীবন্দর এবং সেখানে রাজা ভগদত্তের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। বানিয়াচঙ্গও প্রাচীন রাজ্য হিসেবে পরিচিত। বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত এক আজমিরীগঞ্জ ছাড়া সিলেটে এমন আর কোন বাণিজ্য স্থান ছিল না, যা থেকে জলপথে বঙ্গের সাথে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করা যেতো।[৮]

মেজর জেম্স রেনেলের মানচিত্রে সিলেট অঞ্চলের নদীসমূহের গতিপথ পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞ মহল ধারণা পোষণ করেন যে, সম্ভবত কুশিয়ারা নদীর দ্বিধা বিভক্ত কোনো একটি ধারাই ইবনে বতুতার নৌপথ হতে পারে। সিলেটের সকল নদীই মেঘনার উপনদী বিধায় এ ধারণার যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অচ্যুতচরণ চৌধুরীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, কুশিয়ারা বা বরাক নদী ভাঙ্গা বাজারের নিকট মূল বরাক নদী হতে নির্গত হয়ে বাহাদুর পুরের নিকট দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এর উত্তর শাখা বিবিয়ানা নাম ধারণপূর্বক কালনীর সাথে মিশে ধলেশ্বরী নদীতে মিলিত হয়। দক্ষিণ বা দ্বিতীয় শাখা বরাক নামেই নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ হয়ে ধলেশ্বরীতে পতিত হয়েছে।[৯]

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বরাক নদীর যে গতিপথ চিহ্নিত হয় তাতেও একই তথ্য পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, কুশিয়ারা নদীর এক শাখা বরাক নদী। বাহাদুর পুরের নিকট হতে নির্গত হয়ে পশ্চিমাভিমুখে নবীগঞ্জ পর্যন্ত ১৮ মাইল; সেখান থেকে হবিগঞ্জ পর্যন্ত ২৪ মাইল এবং সেখান থেকে ২৫ মাইল পশ্চিমাভিমুখে গিয়ে ভেড়ামোহনায় মিলিত হয়েছে।[১০] উল্লেখ্য ধলেশ্বরী এবং ভেড়ামোহনা পৃথক কোনো নদী নয়, একই নদীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান-নাম। যদি ইবনে বতুতার সিলেট আগমন বিষয়টি সঠিক বলে ধরা হয় তবে হবিগঞ্জ জেলাভুক্ত কোন একটি স্থানই যে প্রাচীন 'হবঙ্ক' বা 'হবঙ্গ' শহর হতে পারে তাতে সন্দেহের সুযোগ সীমিত।

ইবনে বতুতার বর্ণনা চতুর্দশ শতাব্দীর (১৩৪৬ খ্রি)। ফান্‌ডেন ব্রোক (১৬৬০ খ্রিঃ) বাংলার নদ-নদীর একটি নকশা প্রণয়ন করেন। তার মানচিত্রে সিলেটের পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৬৩-১৭৭৩) প্রস্তুতকৃত জেম্স

রেনেলের মানচিত্রের[১১] সাথে ফান্‌ডেন ব্রোক-এর মানচিত্রে বাংলার নদ-নদীর গতিপথের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। অচ্যুতচরণ চৌধুরীর বর্ণনা বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালের। ফান্‌ডেন ব্রোক এবং জেম্‌স রেনেলের মানচিত্রে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাতে কয়েক শতাব্দী পূর্ববর্তী কালের নদীপথ ও নদী তীরবর্তী স্থানের অবস্থান নির্ণয় অতটা সহজ না-ও হতে পারে।

ইবনে বতুতার বর্ণনায় হবিগঞ্জকেই হবঙ্ক বলা হয়েছে কি-না সে প্রশ্ন আসতেই পারে। সংশ্লিষ্ট বর্ণনায় বাঙলার বিভিন্ন নদী ও স্থাননামে যে বিভ্রান্তি দেখা যায় তার আলোকে এ ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ভ্রমণ বৃত্তান্তে চারটি স্থান ও তিনটি নদীর নাম অবগত হওয়া যায়। স্থানগুলি হল 'সুদকাও' 'কামরু' 'হবঙ্গ' ও 'সুনুরকাও'। নদীত্রয় হচ্ছে 'গঙ্গা', 'যুন' ও 'নহর-উল-আজরক'। 'সুদকাও' বর্তমান চট্টগ্রাম, 'কামরু' কামরূপ এবং 'সুনুরকাও' সোনারগাঁও হিসেবে স্বীকৃত। নদীগুলির মধ্যে 'যুন' কে যমুনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১২]

'নহর-উল-আজরক' এবং 'হবঙ্গ' এর ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা যায়। এইচ ব্লকম্যান 'নহর-উল-আজরক'কে ব্রহ্মপুত্র বলে মনে করেন।[১৩] এইচ.এ.আর গিভ এটিকে মেঘনা নদী বলে মনে করেন।[১৪] কর্নেল এইচ ইউল[১৫] এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী[১৬] সুরমা হিসেবে মনে করেন। অনুরূপ ভাবে 'হবঙ্গ' শহরের অবস্থান সম্পর্কেও নানা রকম অভিমত আছে। কোনটি সঠিক তা নিশ্চিত করে বলার সুযোগ সীমিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভিন্ন আলোচনার বিষয়।

এ মুহূর্তে শুধু এ টুকুই বলা যায়, ইবনে বতুতা নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে 'হবিগঞ্জ'কে 'হবঙ্গ' বলেছেন কিনা কিংবা ইবনে জুযাঈ কর্তৃক ইবনে বতুতার বর্ণনা লিখার সময় 'হবিগঞ্জ'কে 'হবঙ্গ' লিখা হয়েছে কি-না তা যেমন বলা যায় না; তেমনি কালক্রমে 'হবঙ্গ' থেকে 'হবিগঞ্জ' শব্দের রূপান্তর ঘটেছে কি-না তা-ও স্পষ্ট করে বলার উপায় নেই। তবে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে যেমন ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'আজমিরগঞ্জ'কে 'আজমর্দন' বলা হয়েছে সেরকম ভাবে এ বর্ণনায় কোনো ভাবে 'হবিগঞ্জ'ই 'হবঙ্গ' হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

হবিবউল্লা প্রতিষ্ঠিত বাজারের অবস্থান নির্ণয়

সৈয়দ হবিব উল্লাহ কর্তৃক খোয়াই নদীর তীরে বাজার প্রতিষ্ঠা এবং তা থেকে 'হবিগঞ্জ' নামকরণের ধারণাটি সর্বপ্রথম আসে 'শ্রীহট্ট দর্পণ' পুস্তিকা থেকে। মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ কর্তৃক রচিত পুস্তকটি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে:

> *১০০ বৎসরের অধিক হইল পং তরফ মৌজে সুলতানশীর জমিদার সৈয়দ আব্দুল্লাহ সাহেবের পূর্ব্ব পুরুষ মৃত সাহা সৈয়দ হবিবউল্লা সাহেব হবিগঞ্জে বাজার বসাইয়াছিলেন। এই বাজার তাহাদেরই আছে; হিন্দু জমিদারগণও অংশীদার হইয়াছেন।*[১৭]

সৈয়দ হবিবউল্লার অধঃস্তন পুরুষ দাবিদার সৈয়দ আব্দুল্লাহ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ণনাটি প্রকাশের কাল ১৮৮৬ খ্রি.। এর একশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ বা এর কাছাকাছি সময় বাজারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবনে খালদুনের কাল গণনার সূত্রানুযায়ী প্রতি তিন পুরুষে একশত বৎসর। সেমতে সৈয়দ আব্দুল্লাহ সৈয়দ হবিবউল্লার প্রপৌত্র হওয়ার কথা। অথচ দেওয়ান নূরুল

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী[১৮], অচ্যুৎচরণ চৌধুরী[১৯] প্রভৃতি কারোর তথ্যেই সৈয়দ হবিবুল্লাহর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে 'সৈয়দ আব্দুল্লাহ' নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সে হিসেবে জনাব মাহাম্মদ আহমদকে তথ্য সরবরাহকারী কথিত আব্দুল্লাহ চরিত্রটি কাল্পনিক মনে করাই সঙ্গত।

অপর দিকে সৈয়দ আবদুল আগফর কর্তৃক তরফের ইতিহাস প্রণীত হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে (১২৯২ বঙ্গাব্দ)।[২০] প্রকাশের বিবেচনায় তরফের ইতিহাস ও শ্রীহট্ট দর্পণ সমসাময়িক। এর অন্তত এক দশক পূর্বে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে লস্করপুর থেকেই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।[২১] তরফের ইতিহাস তরফের সৈয়দ বংশোদ্ভোত বিখ্যাত ব্যক্তি কর্তৃক তাদেরই পূর্বপুরুষ ও তাদের খ্যাতি সম্বন্ধে লিখিত। সমসাময়িক কালের যে তথ্যটি এ অঞ্চলের না হয়েও মৌলবীবাজারে বসে মাহাম্মদ আহমদ সাহেব তাঁর বইতে উল্লেখ করলেন; সে তথ্যটি সৈয়দ আবদুল আগফর সংশ্লিষ্ট সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে, তরফে থেকে, তরফ ও সৈয়দ বংশের ভূ-সম্পত্তির হিস্যা সংক্রান্ত নানা তথ্য সন্নিবেশিত করা সত্ত্বেও হবিবগঞ্জ বাজার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ না করার বিষয়টি আমাদের ভাবিত করে।

মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ প্রদত্ত তথ্যই হবিগঞ্জ নাম সম্পর্কিত প্রথম উল্লেখ। অথচ সেখানে হবিববুল্লাহ তাঁর নিজ নামে বাজার বসিয়েছিলেন বলা হয়নি– বলা হয়েছে '*সৈয়দ হবিবউল্লা সাহেব হবিগঞ্জে বাজার বসাইয়াছিলেন*'। এ থেকে তিনি তাঁর নিজ নামে সংশ্লিষ্ট বাজার বসিয়েছিলেন তা নিশ্চয় প্রমাণিত হয় না। বরং এমনটি ভাবাই যৌক্তিক যে, তিনি 'হবিগঞ্জ' নামক স্থান বা জনপদে একটি বাজার বসিয়েছিলেন। অথচ পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ এই বর্ণনাকে পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত হবিগঞ্জ নামক স্থানের নামকরণের সাথে যুক্ত করে একটি অনাকাঙ্খিত বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছেন।

আরো ভাবিত হতে হয় এ জন্যে যে, মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ প্রদত্ত তথ্যের বরাতে নামকরণ সম্পর্কিত বর্ণনামতে আনুমানিক ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে খোয়াই নদীর তীরে 'হবিবগঞ্জ বাজার' প্রতিষ্ঠিত হয়। জেমস রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, বরাকের দক্ষিণ তীরে যেখানে 'হবিবগঞ্জ' নামে একটি স্থান বা জনপদের উল্লেখ রয়েছে, তার বেশ পূর্বদিকে উত্তরমুখী একটি সরু নদী (খোয়াই) প্রবাহিত হয়ে হবিগঞ্জের উত্তর-পূর্ব দিকে তেঘরিয়ার কাছাকাছি বরাকের একটি বাঁকে মিলিত হয়েছে। এতে প্রথমত: অনুমিত হয় হবিগঞ্জ নামক স্থানটি তখন খোয়াই নয়, বরাকের তীরে অবস্থিত ছিল। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও বলা হয়েছে, খোয়াই নদীর বাম তীরে ছিল হবিগঞ্জ শহরের আবাসিক এলাকা এবং বরাক নদীর বাম তীরে অবস্থিত ছিল বাজার।[২২] দ্বিতীয়ত: কথিত ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'বাজার প্রতিষ্ঠার' অনেক পূর্বেই সংশ্লিষ্ট স্থানে 'হবিবগঞ্জ' নামক স্থান বা জনপদের অবস্থিতি ছিল। পরবর্তীতে বরাক ও খোয়াই নদীর সঙ্গমস্থলটি ক্রমাগত ভাঙ্গনের ফলে ধীরে ধীরে আরো পশ্চিম দিকে শহরের কাছাকাছি স্থানে চলে আসে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেখানে হবিবগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে– বর্তমান শহরের চিড়াকান্দি থেকে বগলা বাজার পর্যন্ত এলাকাটি অতীতে বরাকের তীরবর্তী সোণারচর নামে পরিচিত ছিল। সেখানে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বালুচরের মদনমোহনের আখড়া হতে জয়রাম দাস নামে এক ব্যক্তি এসে একটি আখড়া স্থাপন করেন। জয়রাম দাসের গুণে মুগ্ধ হয়ে সুলতানশীর জনৈক জমিদার সোণারচর

নামক স্থানটি দেবত্র দান করেন। এরপর থেকে চরটি 'বাবাজির চর' নামে খ্যাত হয়। আখড়াটি তখন 'পুরাণবাজার' নামক স্থানে ছিল, পরে তা শহরে স্থানান্তরিত হয়।[২৩] বাবাজির চরের পশ্চিম পাশেই সুঘরের হরিচরণ দেবের পত্নী হরসুন্দরী বগলামুখীর নামে একটি দেবালয় স্থাপন করেন। এই দেবালয়ের সেবা-ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি সেখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করে ছয় শত টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। উক্ত বাজারটিই 'বগলা বাজার' নামে পরিচিত।[২৪] এই বগলা বাজার নামটি বর্তমানেও বহাল আছে।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুর থেকে হবিগঞ্জে সাবডিভিশন কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়।[২৫] এরপর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র অর্ধ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি শহর প্রতিষ্ঠার কালেও সংশ্লিষ্ট হবিগঞ্জ বাজারের কথা সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়নি। সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, যখন মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ হবিবুল্লার নামে নামকরণের ধারণাটি দেন তখনও সাবডিভিশনের কার্যক্রম লস্করপুর থেকেই সম্পন্ন হচ্ছিলো। যে কারণে এই কল্পিত ধারণাটি সৈয়দ আবদুল আগফর তাঁর তরফের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করেননি। প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট এলাকাটিতে যে সৈয়দ ফতার কর্তৃত্ব ছিল তার প্রমাণ হলো এর শতাধিক বৎসর পরে নাতিরাবাদ নামক গ্রামের সৃষ্টি। কথিত আছে, উক্ত গ্রামটি সৈয়দ ফতার অধস্তন ৪র্থ পুরুষ সৈয়দ মোহাম্মদ নাতির তার নিজ নামে আবাদ করেন।[২৬]

বর্তমান পুরাণ মুন্সেফী এলাকায় প্রথমে বিচারালয় স্থাপিত হয়; জেলা কার্যালয় এলাকায় মহকুমা কার্যালয়, কালেক্টরী ও থানা এবং অন্যান্য অফিসাদি স্থাপিত হয়। বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় স্থাপনের কারণে সেখানে যে অগ্রসর সমাজের গোড়াপত্তন হয় তাদের সুবিধার্থে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পুরাণ মুন্সেফী থেকে কোর্ট স্টেশন পর্যন্ত অর্ধ্ব বর্গমাইল এলাকা নিয়ে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। বর্তমান পুরাণ বাজার এলাকা এই অর্ধ্ব বর্গ মাইল এলাকার অন্তর্গত ছিল না। সুতরাং যে বাজারকে কেন্দ্র করে শহর এবং মহকুমার নামকরণ দাবি করা হয় সে বাজার এলাকা নবগঠিত পৌর এলাকার বাইরে থাকবে তাকি সম্ভব?

সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, তখন (১৯১৩) যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এ শহরে দু'টি বাজার ছিল যা খোলা জায়গায় বসতো।[২৭] এ জন্যে বাজার দু'টি মহকুমা শহর প্রতিষ্ঠার পর বহিরাগত মানুষের আধিক্য হেতু সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। যদি ধরেও নেয়া হয়, এ দুটি খোলা বাজারের একটিই হবিবগঞ্জ বাজার তা হলে প্রথমেই প্রশ্ন আসে, মাত্র অর্ধ্ব বর্গমাইলের এই ছোট্ট শহরটি হবিগঞ্জ বাজার তথা পুরাণ বাজার এলাকাটিকে আকর্ষণ করে কি-না। এরপর প্রশ্ন আসে যে, সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধ্ব শতাব্দী পূর্বে এ বাজারের অস্তিত্ব ছিল কি-না কিংবা একটি বাজার প্রতিষ্ঠার অর্ধ্ব শতাব্দী পরও সেটি খোলা বাজার হিসেবেই স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল কি-না? গেজেটিয়ারে উল্লেখিত সেই খোলা বাজারের নামে ও স্থানে হঠাৎ করেই নবীগঞ্জ, শঙ্করপাশা ও লস্করপুরের মতো প্রতিষ্ঠিত রাজস্ব জেলা এলাকাকে বাদ দিয়ে সাবডিভিশন সদর স্থাপিত হয়ে গেল?

এসব কারণে এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানের আবশ্যকতা দেখা দেয়। অনুসনধান সূত্রে জানা যায়, সৈয়দ হবিবউল্লা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের মহাকবি সৈয়দ সুলতান ওরফে সৈয়দ মিনা'র প্রপৌত্র

ছিলেন।[২৮] সৈয়দ সুলতানের সময়কাল ১৫৫৫-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ।[২৯] সৈয়দ হবিবউল্লার পিতা সৈয়দ হেদায়েত উল্লা তদীয় বৈমাত্রেয় ভাই সৈয়দ ফতা কর্তৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও বাড়ি হতে বিতারিত হওয়ার পর সৈয়দ ফতা এককভাবে জমিদারী শাসন করেন। পরবর্তীতে আপোষে তরপ পরগণা থেকে সম্পত্তির এক তরফ বা অংশ প্রাপ্ত হয়ে অন্যত্র বাড়ি করে তথায় বসবাস করেন। এই এক অংশ বা এক তরফ প্রাপ্তি থেকে তার পরবর্তী বংশধর 'তরফদার' হিসেবে পরিচিত হন।[৩০]

বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, যেখানে সৈয়দ ফতা হেদায়েত উল্লাকে সম্পূর্ণ সম্পত্তি থেকে বিতারিত করেন এবং তিনি পরিস্থিতিগত কারণে অর্ধেকের পরিবর্তে তরফ এলাকায় সামান্য অংশ নিয়ে বাড়ি থেকে বিতারিত হন সেখানে তদীয় পুত্র সৈয়দ হবিব উল্লা কর্তৃক ফতার অংশে বাজার স্থাপন কি সম্ভব?

হবিবগঞ্জ বাজার প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য কাল ১৭৮৬ খিস্টাব্দ বা তারও পূর্বে। অতীতে তরপের সীমা অনেক বিস্তৃত থাকলেও দশসনা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ খ্রি.) সময় তা ছিল না। তখন তা সঙ্কুচিত হয়ে বর্তমান চুনারুঘাট, বাহুবল ও হবিগঞ্জ সদরের পূর্বাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সাতআনি জমিদারী থেকে সৈয়দ হবিব উল্লা যে অংশ প্রাপ্ত হন তা তরপের ৭নং তালুক হিসেবে বন্দোবস্ত হয়। তখন এর ভূমির পরিমাণ ছিল ৯০২ একর।[৩১] এই ৭নং তালুকটি যে বর্তমান হবিগঞ্জ এলাকায় নয় বরং চুনারুঘাট এলাকাস্থ তরপ পরগণায়ই ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আসলে সৈয়দ হবিবউল্লা পিতার সাথে সুলতানশী থেকে বিতারিত হয়ে পরবর্তীতে তরফের মুচিকান্দি (চুনারুঘাট) এলাকায় গিয়ে সেখানে তাঁর নামে একটি মৌজা বা গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন– যার নাম হয় 'হবিবপুর'। বর্তমান চুনারুঘাট ইউনিয়নে এই হবিবপুর মৌজা ও গ্রাম বিদ্যমান। সেখানে খোয়াই নদীর তীরে তিনি তাঁর নিজ নামে একটি বাজারও প্রতিষ্ঠা করেন– যা 'হবিবুল্লা বাজার' হিসেবে খ্যাত ছিল।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে ১৯১০-এর পূর্ববর্তী কালের ৩৬৮টি বাজারের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের তখন পর্যন্ত মোট ৬টি থানায়[৩২] ৬৭টি বাজারের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে 'লস্করপুর' ও 'হবিবুল্লা বাজার' নামে মুচিকান্দি তথা চুনারুঘাট থানার অন্তর্গত দু'টি বাজারের উল্লেখ রয়েছে।[৩৩] তবে বর্তমান কালের কোনো তথ্যে এ দুটি বাজারের উল্লেখ না পাওয়ায় ধারণা করা যায়, মহকুমা ও থানা কার্যালয় হবিগঞ্জে স্থানান্তরের পর উভয় বাজারই ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমনি ভাবে এর পূর্বে সেখানকার বন্দর বাজার ও উর্দু বাজার বিলুপ্ত হয়েছিল।[৩৪] তখন লস্করপুর ও সুলতানশী উভয় পক্ষের জমিদারদের কাছারী ছিল লস্করপুর।[৩৫] সুলতানশী হাবেলীর বর্তমান সময়ের খ্যাতিমান সাহিত্যসেবী সৈয়দ হাসান ইমাম হোছেনী চিশতীর বক্তব্য থেকে জানা যায়:

> *এক তরপের অধিবাসী বলে লোকে এখন ও হেদায়েত উল্লার বংশধরকে তরপদার বলে থাকে। এ বংশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে সুলতানশী উত্তরবারী ও পূর্ব সুলতানশীতে বসবাস করছেন। এ ছাড়া ও আর ও কয়েকটি জায়গায় সৈয়দগণ বসবাস করছেন। সেগুলি হল আউশ পাড়া, লাকড়ি পাড়া, বিরামচর, মাজিয়াইল, দক্ষিণ নরপতি, মশাজান ইত্যাদি।*[৩৬]

বাস্তবতা হলো, সিলেটে মুসলিম বিজয়ের প্রথম দিকেই বরাক ও খোয়াই নদীর মোহনার কাছাকাছি 'হবঙ্গ' নামে একটি জনপদ ছিল। ইবনে বতুতার বর্ণনায় যে হবঙ্গ-এর তথ্য পাওয়া যায় তাতে এটি একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ভাবার সুযোগ নেই। বরং একটি অঞ্চল এবং এর অভ্যন্তরে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম-হাট থাকা অবাস্তব নয়। এই হবঙ্গ জনপদের একাংশে শৌণ্ডিক জাতীয় (মদ-ব্যাবসায়ী) লোকেরা উৎকৃষ্ট চিড়া তৈরি করে বিক্রী করতো। এ কারণে স্থানটি চিড়াকান্দি হিসেবে খ্যাত হয়। চিড়াকান্দি নামক স্থানের নিকটেই বরাকের সাথে খোয়াই নদীর সংযোগ ঘটেছে।[৩৭]

তবে স্থানটি যে অতীতে বিখ্যাত কোনো জনপদ ছিল না তাতে সন্দেহ নেই। যে টুকু পরিচিতি ছিল তা হয়তো বরাক ও খোয়াই এই দুই নদীর সঙ্গমস্থল হিসেবেই। যে কারণে সেখানে পরগণা, রাজস্ব জিলা কিংবা আজমিরীগঞ্জের মতো কোনো ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদি ছিল না। তাই বোধ হয় ১৯১৩ সালে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠনকালেও সেখানে কোনো স্থায়ী বাজারের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি।

বর্তমান পুরাতন খোয়াইমুখের সাথেই নাতিরাবাদের অবস্থান। সেখান থেকে বগলাবাজার পর্যন্ত স্থানটি দেবত্র ও আখড়া থাকায় এবং হবিবউল্লার পিতৃসম্পত্তির অবস্থিতি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট স্থানে হবিবউল্লা কর্তৃক বাজার প্রতিষ্ঠার ধারণাটি নাকচ হওয়ার দাবি রাখে। অপরদিকে অন্য এক সূত্রে জানা যায়, হবিব উল্লা সুলতানশী থেকে বিতারিত হয়ে হবিগঞ্জ শহরের গোড়াপত্তনের বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা প্রতিষ্ঠা করার হলেও সেখানে কার্যক্রম শুরু হয় আরো অনেক পরে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যখন শহরের গোড়াপত্তন করা হয় তখন তা বর্তমান পুরাণ মুন্সেফী এলাকা থেকে যাত্রা শুরু হয়। লস্করপুর থেকে মুন্সেফী কার্যালয় সেখানেই প্রথম স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে বর্তমান জজকোর্ট এলাকায় মুন্সেফী কার্যালয় স্থানান্তর করা হলে পুরাণ মুন্সেফী এলাকাটি তাদের আবাসিক এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

লস্করপুর, হবিগঞ্জ ও মুচিকান্দি থানার তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়ঃ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের যে ১০টি থানার তথ্য পাওয়া যায় তাতে লস্করপুর থানার নাম থাকলেও হবিগঞ্জ বা মুচিকান্দি নামের উল্লেখ নেই।[৩৮] এর অনেক পর পর্যন্ত লস্করপুর থানার অধীনে মুচিকান্দি আউট পোষ্ট ছিল। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুর থানা আসাম প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন পায়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুর থেকে থানা কার্যালয় হবিগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়।[৩৯] মুচিকান্দি আউট পোষ্টটি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ থানার মর্যাদা লাভ করে।[৪০] ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ থেকে পৃথক হয়ে বাহুবল নামে নতুন থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুচিকান্দি থানাটি সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে চুনারুঘাট নামে এবং স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৪১] এতে বুঝা যায়, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুচিকান্দি থানা হিসেবে লিপীবদ্ধ ছিল।

লক্ষণীয় বিষয় হলোঃ ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দেই হবিগঞ্জ সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠার সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন জারি হয়েছিল। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লস্করপুরে থানা প্রতিষ্ঠার পর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে এটি হবিগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুচিকান্দি থানার অধীন লস্করপুর ও হবিবুল্লা বাজারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তখনও এই দুটি এলাকা লস্করপুর জিলাধীন ছিল এবং মুচিকান্দি থেকে হবিগঞ্জে স্থানান্তর হয়নি।

যে কোনো নামে কোনো এলাকা প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে হবিগঞ্জ নামকরণ এবং তা বর্তমান স্থানই নির্দেশক তা বিবেচনায় আনা অবাস্তব কিছু না। প্রশাসনিক কোনো প্রতিষ্ঠানও যোগাযোগ এবং পারিপার্শ্বিক সুবিধা বিবেচনায় সম্পূর্ণ নতুন স্থানে স্থানান্তর বা প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব কি অযৌক্তিক নয়। কিন্তু যেখানে সৈয়দ হবিব উল্লার অধিকার ছিল এমন তথ্য-প্রমাণ নেই, সেখানে তৎকর্তৃক বাজার প্রতিষ্ঠা এবং এটি প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দী পরেও খোলা বাজার হিসেবেই অব্যাহত থাকা কি সম্ভব? সম্ভব হলেও সেই অখ্যাত ও অতি সাধারণ বাজারটির নামে কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ করেই নতুন সাবডিভিশনের নামকরণ এবং একটি ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক স্থান থেকে সেখানে সদর দপ্তর স্থানান্তরের ধারণাটি বিস্ময়কর নয় কি?

মহকুমার নামকরণ সম্পর্কিত তুলনামূলক বাস্তবতা

আমাদের জানা আছে, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহকুমার জন্য 'হবিগঞ্জ' নামটি প্রস্তাব ও ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাস্তবায়ন যখন হয় তখন বর্তমান হবিগঞ্জ স্থানটিতে না ছিল কোনো পরগণা, রাজস্ব জিলা, থানা বা অন্য কোনো প্রশাসনিক ইউনিট; না ছিল কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সড়ক যোগাযোগ। পক্ষান্তরে লস্করপুর যেমন ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এলাকা তেমনি সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কেন্দ্র বিশেষত ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে নবাবী নিজামত শাখার সিলেট অঞ্চলের সদও দপ্তর। স্থানটি স্কুল, বাজার ও আধুনিক সমাজ বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র। যোগাযোগ ক্ষেত্রেও ছিল তৎকালীন সময়ের বাস্তবতায় উন্নত সুবিধা। হবিগঞ্জ যে খোয়াই নদীর তীরে সেই একই নদীর তীরে লস্করপুরও অবস্থিত। তাছাড়া বৃহৎ নৌযান চলাচলের জন্য তৎকালে যে লস্করপুর এলাকায় খোয়াই নদীর পর্যাপ্ত নাব্যতা ছিল তার প্রমাণতো চুনারুঘাট নামকরণের মধ্যেই নিহীত।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কথিত 'হবিবগঞ্জ বাজার' এলাকায় এমন কোনো গুণীজনের তথ্য জানা যায়নি, যিনি সমসাময়িক কালে ব্রিটিশ সরকারে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিলেন এবং সেই সক্ষমতার কারণে একটি প্রতিষ্ঠিত স্থান থেকে স্থানীয় সবচাইতে বড় সরকারী দপ্তর স্থানান্তরে সফল ভূমিকা পালন করতে পারেন। বরং এর উল্টো চিত্রই বাস্তবসম্মত ছিল। লস্করপুর অত্রাঞ্চলের প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক এলাকা এবং সেখানকার সৈয়দ পরিবারের সদস্যরাই খ্যাতিমান ছিলেন বিধায় তাদের প্রভাব সরকারের বিভিন্ন মহলে তখনও যথেষ্ট ছিল।

লস্করপুর সিলেট-কুমিল্লা সড়কটির পাশেই অবস্থিত হওয়ায় সড়ক যোগাযোগের প্রশ্নে এর সাথে তৎকালীন হবিগঞ্জের কোনো তুলনাই চলে না। প্রাচীন তথ্যে দেখা যায়, সিলেট-মৌলভীবাজার-শ্রীমঙ্গল-শায়েস্তাগঞ্জ-চুনারুঘাট-তেলিয়াপাড়া অভিমুখী উক্ত সড়কটি[৪২] তেলিয়াপাড়া থেকে মাধবপুর হয়ে কুমিল্লার সাথে সংযুক্ত হয়েছে।[৪৩] ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের সময়ও হবিগঞ্জের সাথে আন্তজেলা সড়ক যোগাযোগ ছিল না। এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে হবিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়নসহ হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ রাস্তা নির্মাণ হয়। রেল যোগাযোগ আরো পরের ঘটনা বিধায় প্রসঙ্গটি অনুল্লেখ্য।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ সাবডিভিশন প্রতিষ্ঠার পর লস্করপুরেই (কোটান্দর) প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। সেখান থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা কার্যালয় ও ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে থানা কার্যালয় হবিগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর হবিগঞ্জ থেকে শায়েস্তাগঞ্জে স্থানান্তরের একটি প্রক্রিয়া চলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি।[৪৪]

বিস্তারিত আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তথ্যের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা লিপীবদ্ধ হলো। এতে যে বিষয়গুলো বেড়িয়ে আসে তা হলো :

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের খোয়াই ও বরাকের সঙ্গমস্থল প্রচীন হবঙ্গ এলাকাই হবিগঞ্জ জনপদ ছিল কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। চিড়াকান্দি, নাতিরাবাদ, পুরাণ মুন্সেফী ও বর্তমান জজকোর্ট এলাকা হয়তো তারই সম্প্রসারিত অংশ। পুরাণ বাজার এলাকাটি যেহেতু দুই নদীর সঙ্গমস্থলবর্তী একটি নবোত্থিত চরাঞ্চল ছিল সেহেতু চতুর্দশ শতাব্দীর প্রাচীন হবঙ্গ জনপদ তার থেকে আরো দূরে ভাবাই সঙ্গত। কারণ বর্তমান খোয়াই নদীর প্রশস্থতা দিয়ে প্রাচীন কালের খোয়াই বা বরাককে বিচার করা যাবে না। প্রাচীনকালে এর প্রশস্থতা ও গভীরতা সেই পরিমান ছিল যে পরিমাণ হলে বিশাল বিশাল নৌযান চলাচল করা সম্ভব। সেকালে বরাকের এই অংশ দিয়ে আসাম পর্যন্ত জাহাজ-স্টিমার যে চলাচল করতো তার প্রমাণ ইবনে বতুতার ভ্রমণপথ। সেই সুপ্রশস্থ নদীতে প্রাকৃতিক কারণে যে অস্বাভাবিক ছন্দ পতন ঘটেছে তার প্রমাণ বরাক নদী। আজকের প্রজন্ম ভাবতে পারবে না যে, খোয়াইমুখের বিপরীত দিকে যে স্থানে উমেদনগর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত সে স্থানটিই ছিল খোয়াই ও বরাকের সর্বশেষ সংযোগস্থল। এর পূর্বে এই সংযোগ স্থলটি আরো কিছু উজানে অবস্থিত ছিল।

যেহেতু ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হবিগঞ্জ মহকুমা শহরে দু'টি খোলা বাজার ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত কোনো বাজার ছিল না সেহেতু কথিত বাজারের ধারণাটি অমূলক বিবেচিত হওয়াই সঙ্গত। সে কারণে এই বাজারের সাথে মহকুমা নামকরণের সম্পৃক্ততা অবাস্তব। তাই নাম প্রস্তাবের দুই যুগেরও অধিক কাল পরে (১৮৬৭-১৮৯৩) লস্করপুর থেকে সাবডিভিশন, থানা ও রাজস্ব কার্যালয় হবিগঞ্জে স্থানান্তরের বিষয়টি সে বাস্তবতাকে প্রশ্রয় দেয় না।

বাবাজির চর ও বগলা বাজারের তথ্য মতে ইংরেজ অধিকারের পূর্বেই স্থানটি দেবত্র হয়ে যাওয়া এবং পারিবারিক কলহের সূত্রে সুলতানশী থেকে বিতারিত হয়ে পরবর্তীতে তরপের ৭নং তালুকের মালিক সৈয়দ হেদায়েত উল্লা তনয় হবিব উল্লা কর্তৃক এখানে বাজার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যুক্তির মানদন্ডে প্রশ্নবিদ্ধ। তাই তরফাধীন লস্করপুর এলাকার হবিবুল্লা বাজারটিকেই সৈয়দ হবিবউল্লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজার মনে করা যৌক্তিক।

হবিগঞ্জ নামকরণের ব্যাপারে আরো একটি মত এ রকম যে, 'হবি' অর্থ 'ঘৃত'। এখানে উৎকৃষ্ট মানের ঘি বা হবি পাওয়া যেতো বলে হবি থেকে হবিগঞ্জ নামকরণ হয়। কিন্তু আভিধানিক অর্থে 'হবি' সাধারণ ঘি নয়– যজ্ঞের আগুনে যে ঘৃতাহুতি দেয়া হয় কেবল সে ঘিকেই 'হবি' বা 'হব্য' বলা হয়।

'হবঙ্গ' শব্দের আভিধানিক কোনো ব্যাখ্যা নেই। 'হবিবগঞ্জ' কোনো ব্যক্তির নামে হওয়াই সম্ভব। তবে আরব দেশীয় পর্যটকের বর্ণনায় বানান বা উচ্চারণ বিভ্রাটের কারণে হবিগঞ্জ-ই 'হবঙ্গ' হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয়। আবার অনেকে বানিয়াচঙ্গের মতো হবিগঞ্জকেও একটি প্রাচীন জনপদ মনে করেন। ভৌগোলিক দিক থেকে বানিয়াচঙ্গের পার্শ্ববতী এলাকা এটি। বানিয়াচঙ্গ নামকরণের বিষয়ে বহুমত থাকলেও এটিকে একটি সুপ্রাচীন জনপদ গণ্য করে সুকুমার সেন বলেন, 'পূর্ববঙ্গের এক-আধটি স্থান-নামে (যেমন, বানিয়াচঙ্গ) তিব্বত-চীনীয় ভাষার চিহ্ন থাকায় মনে করিতে পারি পূর্বকালে এসব অঞ্চলে হয়তো তিব্বত-চীনীয় ভাষী কিরাত জাতির পটি বা "পকেট" ছিল।'[৪৫]

হবঙ্গ শব্দেও তিব্বত-চীনীয় ভাষার এই চিহ্ন রয়েছে বিধায় এটিকেও বানিয়াচঙ্গ-এর মতো প্রাচীন তিব্বত-চীনীয় ভাষী কিরাত জাতির আবাসস্থল ভাবা যায় কিনা এবং তিব্বত-চীনীয় ভাষার শব্দ কিনা ভবিষ্যত গবেষকরাই হয়তো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। তবে হবিগঞ্জ নামে প্রাক-ব্রিটিশ কালেই যে একটি জনপদ ছিল তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

যদিও ইবনে বতুতার বর্ণনায় অন্যান্য স্থান নামের ভুল বানানের মতো 'হবিগঞ্জ'কেই 'হবঙ্গ' বলা হয়েছে না-কি 'হবঙ্গ' থেকে 'হবিগঞ্জ' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে তা স্পষ্ট নয় তবু প্রাচীন এই জনপদ অতীতে একেবারে গুরুত্বহীন ছিল তেমনটি বোধ হয় না। নিশ্চয় সেখানে এমন কোনো ঐতিহ্যের উপস্থিতি ছিল যা বরাকের কড়াল গ্রাসে নিপতিত হয়েছে এবং অবহেলার কারণে সে ঐতিহ্যের তথ্য ইতিহাসের আবর্তে হারিয়ে গেছে।

এ ধারণা পোষণ করা সঙ্গত নয় যে, কোনো একটি খোলা বাজারকে কেন্দ্র করে একটি শহর ও মহকুমার নামকরণ হয়েছে; বরং বানান ও ভাষা বিভ্রাটের কারণে 'হবিগঞ্জ'ই ইবনে বতুতার ভ্রমন বৃত্তান্তে 'হবঙ্গ' হিসেবে উল্লেখ হয়েছে মনে করাই যৌক্তিক। তাই বলা যেতে পারে যে, 'হবিব' নামধারী কোনো ব্যক্তির নামানুসারেই সংশ্লিষ্ট এলাকাটির হবিবগঞ্জ নামকরণ হয়ে থাকবে। তবে সে ব্যক্তি সৈয়দ হবিবউল্লা কিনা সেটাই প্রশ্ন।

বিস্তারিত আলোচনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হবিবগঞ্জ খোয়াই নয় বরাকের তীরবর্তী একটি জনপদ ছিল। সৈয়দ হবিবউল্লার সময়কালের পূর্ব থেকেই বরাকের তীরে 'হবিবগঞ্জ' নামে একটি জনপদ ছিল; সে জনপদের অন্তর্গত সোনার চর এলাকায় প্রথমে বগলা বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। হবিগঞ্জ এলাকাটি সৈয়দ হবিবউল্লার মালিকানাধীন ছিলই না এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত খোয়াই নদীর তীরবর্তী হবিবুল্লা বাজারটি মুচিকান্দি (বর্তমান চুনারুঘাট) এলাকায় অবস্থিত ছিল। তাই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, হবিবগঞ্জ নামে বাজার নয়– এর বহু পূর্বকাল থেকেই সেখানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল– যা অপর কোনো হবিব নামধারী ব্যক্তির দ্বারা স্মরণাতীত কালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে থেকেই হবিগঞ্জ স্থাননামের উৎপত্তি।

তথ্যনির্দেশ:

১. মোগল সম্রাট জাহঙ্গীরের সময়ে 'চাকলে জাহাঙ্গীর, জিলা লস্করপুর' নামে খ্যাত ছিল। [সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস,* উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৫৫]

২. লস্করপুরে তহশীল কাছারী ছিল। তহশীলদার, শিকদার (বিচারক), কাজী প্রভৃতি রাজ কর্মচারীরা সেখানে বসবাস করতেন। সেখানেই সিলেটের মুন্সেফী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। [মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন; *শিলহটের ইতিহাস,* উৎস সংস্করণ ২০০৬। পৃষ্ঠা ২৬২]

৩. শেখ জালাল উদ-দিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরেক বড়, সুনির্মিত শহর হাবাঙ্ক *(ঐধনধহয়)* সফরে গেলাম। তার মধ্য দিয়ে কামারু পর্বত থেকে নেমে আসা একটা নদী আড়াআড়ি বয়ে গেছে– নাম নীল নদী *(ব্লু রিভার+ সেটা মেঘনা নদী ছাড়া আর কোনটা হতে পাওে না। এবং বরাকের বাঁ তীরে আজও টিলা বা ছোট ছোট পাহাড় আছে যাকে হাবাং (ঐধনধহম) বলা হয়। জায়গাটা হবিগঞ্জের সামান্য দক্ষিণে।)* লাকনওটি থেকে বাংলাদেশে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে এ নদী ব্যবহৃত হয়। মিশরের নীল নদের মতো এই নীল নদীর দুতীরেও পানির চাকা, বাগান ও বাড়িঘর আছে। মুসলমান শাসিত হিন্দু প্রজারা থাকে সেসব গ্রামে। আমরা সে নদী দিয়ে পনরদিন ধরে একের পর এক গ্রাম পেরিয়ে এলাম। সেটার দু' তীরে এত বেশি বাগান, ঘরবাড়ি আর মানুষ, মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি কোন বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। নদীতে প্রচুর নৌ-যান, একটা অন্য একটার মুখোমুখি হলেই ড্রাম বাজিয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানায়। সুলতান ফখর উদ-দিনের নির্দেশে এই নদী দিয়ে আসা-যাওয়া করতে দরবেশদেরকে কোন খাজনা দিতে হয় না, বরং তাদেরই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাঁর তরফ থেকে। তাছাড়া কোন দরবেশ শহরে ঢুকলে তাকে অর্ধেক দিনার নগদ অর্থ দেয়ারও রেওয়াজ আছে। [এইচ. এ. আর. গিব, ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা (বঙ্গানুবাদ : ইফতেখার আমিন); ঐতিহ্য ২০০৪। পৃষ্ঠা ২২১]

৪. *বাংলাপিডিয়া* প্রথম খণ্ড, সম্পাঃ সিরাজুল ইসলাম,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৪; পৃষ্ঠা ৪১৭

৫. শামসুল আলম, *হযরত শাহ্ জালাল (রহ.)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৮। পৃষ্ঠা ২১৬

৬. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক,* আনিসুর রহমান ১৯৯০। পৃষ্ঠা ২৪

৭. Rajaniranjan Dev, *Shahjalal,* Sylhet 1911. Page 51

৮. মুফ্তি আজহারউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি,* উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৬

৯. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, প্রথম ভাগ,* উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ১০-১১

১০. মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ, *শ্রীহট্ট দর্পণ,* উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ১৯

১১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জরিপবিদ ও প্রকৌশলী জেমস রেনেল ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ১৭৬৩ থেকে ১৭৭৩ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে বঙ্গীয় নদীব্যবস্থার এক সেট মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ইহাই রেনেলের মানচিত্র হিসেবে পরিচিত। [সিফাতুল কাদের চৌধুরী, রেনেলের মানচিত্র, *বাংলাপিডিয়া* অনলাইন ভার্ষন। সংগ্রহ : ০১-০৯-২০।]

১২. এইচ এ আর গিব-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইবনে বতুতা ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর রাজধানীতে ফিরে গিয়ে সুলতান আবু ইনানের দরবারে তাঁর ভ্রমন বৃত্তান্ত পেশ করেন। এটিকে ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা দিয়ে তা লিখে রাখার জন্য সুলতান তাঁর একান্ত সচিব ইবনে জুযাঈকে নির্দেশ দেন। ইবনে জুযাঈ লিখিত গ্রন্থই এইচ এ আর গিব ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এতে তিনি বলেন, 'কয়েক জায়গায় নামের বেলায়ও ভুল পাওয়া গেছে, বিশেষ করে অ-মুসলিম দেশের বেলায়। আরবী আর ফার্সী ছাড়া কোন ভাষা জানতেন না ইবনে বতুতা, সে ক্ষেত্রে এরকম ভুল হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।

১৩. মুফ্তি আজহারউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৬

১৪. এইচ. এ. আর. গিব, *ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা*, (বঙ্গানুবাদ : ইফতেখার আমিন), ঐতিহ্য ২০০৪। পৃষ্ঠা ২২১

১৫. Col. H. Yule, *Indian Antiquary 1879,* Page 211

১৬. N. K. Bhattasali, *Bengal Past and Present,* Page 154

১৭. সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২৮। তিনি তথ্য হিসেবে সুলতানশী বংশ ধারার অধঃস্তন পুরুষ সৈয়দ আব্দুল্লা'র উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

১৮. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল র.*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ **১৯৯৫**। পৃষ্ঠা ৪৬২-৪৬৩

১৯. হবিব উল্লাহর পুত্র কুরবান আলী, তৎপুত্র ফরজন্দ আলী, তৎপুত্র আরজুমান্দ আলী, তৎপুত্র ইবনে আলী, তৎপুত্র আব্দুস সাত্তার ও আব্দুল জব্বার (এ দু'জন *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত* প্রণয়নকালে জীবিত ছিলেন) [অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৮৫]

২০. বইটি প্রকাশিত হয়েছে দু'বৎসর পর **১২৯৪** বঙ্গাব্দে।

২১. সেখান থেকে **১৮৯৩** খ্রিস্টাব্দে থানা কার্যালয় এবং **১৮৯৬** খ্রিস্টাব্দে মহকুমা কার্যালয় হবিগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়।

২২. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers SYLHET*, East Pakistan Government Press, Dacca 1970. Page 392

২৩. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩০৯

২৪. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ৩০৯-৩১০

২৫. *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল। তথ্য সংক্ষেপ : এক নজরে হবিগঞ্জ দ্র.।

২৬. সুলতানশী পূর্ব হাবেলীর বংশ সিজরা মতে, সৈয়দ মোহাম্মদ ফতা– সৈয়দ মোহাম্মদ নাসির– সৈয়দ মোহাম্মদ আছির– সৈয়দ মোহাম্মদ নাজির– সৈয়দ মোহাম্মদ নাতির। [দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ **১৯৯৫**। পৃষ্ঠা ৪৬১] ইবনে খালদুনের বংশগণনার হিসাব মতে প্রতি তিন পুরুষে **১০০** বছর।

২৭. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers SYLHET*, East Pakistan Government Press, Dacca 1970. Page 379

২৮. সুলতানশী বংশ সিজরা মতে, সৈয়দ সুলতান -এর পুত্র সৈয়দ আহমদ তৎপুত্র সৈয়দ ফতা ও সৈয়দ হেদায়ত উল্লা। সৈয়দ হেদায়ত উল্লার পুত্র সৈয়দ হাবিবুল্লাহ। [দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ **১৯৯৫**। পৃষ্ঠা ৪৬২]

২৯. নন্দলাল শর্মা, *সিলেটের সাহিত্য স্রষ্টা ও সৃষ্টি*, প্রকাশক: আলহাজ্ব মোহাম্মদ বশির মিয়া ২০০৯। পৃষ্ঠা ৪৮৫

৩০. সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৫৩

৩১. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩৮৫

৩২. তখন পর্যন্ত হবিগঞ্জে নবীগঞ্জ, মাধবপুর, মুচিকান্দি, লাখাই, বানিয়াচঙ্গ ও হবিগঞ্জ এই ৬টি থানা ছিল যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে উল্লেখিত আছে।

৩৩. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট (খ)।

৩৪. লস্করপুরে তরপ বিজয়ী মুসলিম বাহিনী বসবাস স্থাপনের পর সেখানে সময়ের ব্যবধানে বন্দর বাজার ও উর্দু বাজার নামে যে দু'টি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় (সৈয়দ আবদুল আগফর, *তরফের ইতিহাস*, উৎস সংস্করণ ২০০৮। পৃষ্ঠা ৪৬) ব্রিটিশ অধিকারের পরবর্তী দলিল পত্রে এর উল্লেখ না থাকায় সেগুলো বিলুপ্ত হয়েছে বলে মেনে নিতে হয়।

৩৫. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৭৩

৩৬. সৈয়দ হাসান ইমাম হোছেনী চিশতী, *তরফ এর ইতিকথা ১ম খন্ড*, প্রকাশক: সৈয়দ মইনুল হাসান ১৯৮৭। পৃষ্ঠা ৩৯

৩৭. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩০৯

৩৮. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা*, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩। পৃষ্ঠা ১৬৪

৩৯. সৈয়দ আহমদুল হক ও সৈয়দ গাজীউর রহমান, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল। পৃষ্ঠা ৩১৮

৪০. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজাল। পৃষ্ঠা ৩৩৯

৪১. No. 176 G. J., dated the 10th January, 1922

৪২. S. N. H. Rizvi, *East Pakistan District Gazetteers SYLHET*, East Pakistan Government Press, Dacca 1970. Page 183

৪৩. *Ibid*, Page, Page 184

৪৪. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৩০৯ (ফুটনোট-২)

৪৫. শ্রীসুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৭। পৃষ্ঠা ৭

পরিশিষ্ট ১

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ, লস্করপুর ও শঙ্করপাশা কালেক্টরি বিভাগভুক্ত পরগণার তথ্যবিবরণী[১]

ক্রমিক নং	পরগণার নাম	মৌজা/গ্রাম সংখ্যা	তালুক সংখ্যা	ভূমির পরিমাণ (একর)	রাজস্বের পরিমাণ (টাকা)
১.	আগনা	৮৩	১৩৭	৩১,০৮৮	১,৩১২
২.	আনন্দপুর	৫	২	০	০
৩.	উচাইল	০	২৯	৭,৮৯৬	৩,৭৬০
৪.	উসাই নগর	১৬	৬	১৬৯	১৮৩
৫.	কাসিম নগর	০	১৬০	৬,০৪৬	৩,৭৫৩
৬.	কিসমত বাজু সতরসতী	৩২২	১০	১,১৩৮	২০৬
৭.	কুরশা	৪৮	১৯৫	১৫,৭৮৯	১,৯৫০
৮.	গদাহাসন নগর	১৪৪	৫৪৩	৮,০৬৯	৬,৬৯৯
৯.	গিয়াস নগর	১৩	৪২	১,২২৩	৩৭৩
১০.	চৌকী	২৭	৬১	৪,৭৪৪	১,০৭৬
১১.	জনতরী	৩৬	৮৫	৮,৭০৯	৮৪৩
১২.	জলসুখা	৭৫	৬৮	১২,১৩২	২,৮৩১
১৩.	জোয়ান শাহী	৪০	১২	৫,০৪২	১,১৬৪
১৪.	জোয়ার বানিয়াচঙ্গ-২	১৫৯	৩৩৮	৬৩,৫৮৬	৭,০৭৮
১৫.	তরফ	৬৩০	১,৬০১	৫০,৯৯৬	৪৪,০০০
১৬.	দাউদ নগর	১৮	১৭	৮,৬৪০	৫,৭৫০
১৭.	দিনার পুর	৭৩	৬৮৩	২৭,৩৬২	৩,৯৯৪
১৮.	নুরুলহাসন নগর	০	৭০	৩,১৩২	২,৭৮৪
১৯.	পুটিজুরী	১২৩	১৮৯	৬,১৩৬	১,৭৫৪
২০.	ফৈজাবাদ	৬১	১১৫	১,৩২৮	৫৫৮
২১.	বাজু সতরসতী	৩৩	৫৬	২,৭৫৮	৩২২
২২.	বাজু সুনাইতা	০	১৭৭	৯,৬৮৩	৭১৭
২৩.	বানিয়াচঙ্গ(কসবা)	৩২২	৩,৫৮৫	১,০৬,৮৭৬	১০,৮৬৫
২৪.	বামৈ	১৩৭	৩৩৩	৮,৮৫১	৩,৭৭৫
২৫.	বিথঙ্গল	১৯	১৭	৭,৮৪৫	২,২০১
২৬.	বেজোড়া	১০২	১,২৯৪	৫২,৩৫৬	৩,০৭৬
২৭.	মগিসপুর	৫	৮	৮৯২	১৮১

২৮.	মনতলা[২]	০	০	৬,৭১১	০
২৯.	মান্দারকান্দি	২৩	১,৩১৩	৮,০৫৮	১,৫১৯
৩০-৩১.	মুড়াকড়ি[৩]	৮	৪	১,৪৭৯	৪৩৯
৩২.	রঘুনন্দন	১২	২	১১০	১৫৭
৩৩.	রিচি	১১	২৫	১১,৭০৫	১,২০৬
৩৪.	রিয়াজপুর	০	২	১১৬	৪৩
৩৫.	লাখাই	৩৫	১৬০	২৭,২২৩	৩,৭১০
	সর্বমোট =	**২,৫৮০**	**১১,৩৩৯**	**৫,০১,১৭৭**	**১,১৮,২৭৯**

১ ক. অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ-প্রথম ভাগ*, উৎস সংস্করণ ২০০২। পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯। (উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠায় আনন্দপুরের রাজস্ব '০' টাকার স্থলে '৯৭' টাকা ও দাউদ নগরের রাজস্ব '৫৭৫০' এর স্থলে '৫৭৫' টাকা উল্লেখ করা হয়েছে।) খ. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হজরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, এ.বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০। পৃষ্ঠা ১৯২-২৯৩।

২ ১৮৬১-৬৪ খ্রিস্টাব্দের সার্ভে অনুযায়ী মন্তলা ত্রিপুরা জেলার চাকলে রোশনাবাদের ৫৩টি পরগণার অন্তর্গত দেখানো হয়েছে। উক্ত তথ্যে ভূমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৬,৭১১ একর। [শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, অক্ষর সংস্করণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২৭১]

৩ ৩০ ও ৩১ ক্রমিকে মুড়াকড়ি নামে দুইটি পরগণা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো সূত্র এটি সমর্থন করে না বিধায় মুড়াকড়িকে একক পরগণা গণ্য করা হলে পরগণা সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৪টিতে।

পরিশিষ্ট ২

পুটিজুরি প্রকাশ (পুটিজুরি পরগণার ঐতিহাসিক বিবরণ), কলকাতা, ১৮৭২। পৃষ্ঠা ৪৮-৫১ থেকে চয়নকৃত।

পুটিজুরিবাসী যত, জমীদার মনমত,
অভিমত করিলা সকলে।
পুরকায়স্ত চৌধুরী, দৃঢ় রূপ পণ করি,
ডবল করিবে কর বলে ॥
বুঝা যাবে কিছু পাছে, সেদিন কি এখন আছে,
মিছে মিছে হবে সব সলা।
রাইয়ত জিরতে যত, করি দৃঢ় পঞ্চায়ত,
ডবলেতে দেখাইল কলা ॥
গ্রামে গ্রামেতে কাছারী , আদলতে ফৌজদারী,
সামিল কালেক্টরী তাতে।
রায়ত নায়ক সব, করি সবে অনুভব,
বিচারক হয় নানা মতে ॥
বিচারক তিন জন, গাঁয়ে গাঁয়ে নিরূপণ,
আজ্ঞামাত্র প্যাদাগণ ধায়।
বিচারেতে গোল ঘটে, সরদার ডেকে উঠে,
"আস্তে কহ বড়া গোল হ্যায়" ॥
নেড়ে লোক ছিল যত, জমীদারে করি হত,
অনাহত কটু কত কহে।
বিড়ালের অধিকার, মূষিকে করিল ছার,
পিপীলিকা যেন গিরি বহে ॥
যার কাম তারে সাজে, অপরের ঢোল বাজে,
বাজে কি না বাজে টের পাবে।
চাষার কি এত সাজে, ভর্ত্তা ছাড়ি ভৃত্ত ভজে,
বিষম সম্পদে মজে সবে ॥
চাষী লোক বিচারক, পুলকিত মক্মক্,
ধক্ধক্ জ্বলে জমীদারে।
জমীদারী অধিকার, সকলি করিল ছার,
বাজার ভাঙ্গিল তৎপরে॥
নেকড়া নেঙ্গটী পেটে, আহার ঘটে না ঘটে,
বুদ্ধি আর কত হবে ঘটে?
তবে যে গৌরব ঘটা, কৌতুক বুঝিবে কেটা,

হেসে হেসে মরি বুক ফেটে ॥
চাষারে বিচারে মারি, করিল সেসন জারী,
সারি সারি কত লোকে ভূষা।
খচমচ সভাকার, নৈবচ নৈবচ সার,
কিসে পাবে বিচারে দিশা ॥
আপীলের দরবার, করে সবে সরদার,
দেশের পশ্চিমে স্নানঘাটে।
মুসলমান হিন্দু যত, প্রতিজ্ঞায় সবে রত,
জমীদার পড়িল সঙ্কটে ॥
গুরু নারায়ণ কর, ভ্রাতাসহ অগ্রসর,
তন্ন তন্ন বিবেচনা করি।
রায়ত বিদ্রোহী নামে, অভিযোগ নামে নামে,
নালিস করিল ফৌজদারী ॥
চৌধুরী গোলকচন্দ্র, ভেদিলেক ব্রহ্ম রন্ধ্র,
দরখাস্ত ফৌজদারীতে করে।
দেশে এই দুরবস্থা, লিখে সব বস্তা বস্তা,
দিস্তা দিস্তা কাগজে না ধরে ॥
বৈঠক সাহেব মোকী, প্রচুর প্রমাণ দেখি,
রাখিলেম সবে জমানতে।
হইয়া অতি ত্রস্তব্যস্ত, শশব্যস্ত গলবস্ত্র,
পদস্থ রায়ত বিধিমতে ॥
সরদার প্রজাগণে, জমীদার সন্নিধানে,
একরার ছিল সমুদয়।
আমরা রায়ত সব, হেন আর না করিব,
যতদিন জমীদারী রয় ॥

সহায়ক গ্রন্থসূত্র

১. *আবহমান বাংলা*, সম্পাঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, প্রকাশনাঃ মোহাম্মদ আমিনুল হক ১৯৯৩।

২. *আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম*, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ; বাংলা একাডেমি ১৯৭৮।

৩. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা প্রথম খণ্ড*, ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩।

৪. *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা দ্বিতীয় খণ্ড*, ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩।

৫. *উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত*, সিরাজুল হোসেন খান, ঝিনুক প্রকাশ ২০০২।

৬. *এনুয়েল ম্যাগাজিন ১৯৮৫-৮৬*, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ।

৭. *কপার প্লেইট অব সিলেট*, কমলাকান্ত গুপ্ত, সিলেট ১৯৬৭।

৮. *কুমিল্লা জেলার ইতিহাস*, সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি : আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, কুমিল্লা জেলা পরিষদ ১৯৮৪।

৯. *চর্যাপদে সিলেটী ভাষা*, মুহম্মদ আসাদ্দর আলী; প্রকাশক: আব্দুল নূর ২০০২।

১০. *জালালাবাদের কথা*, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমি ১৯৮৩।

১১. *ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা*, এইচ. এ. আর. গিব (বঙ্গানুবাদ : ইফতেখার আমিন); ঐতিহ্য ২০০৪।

১২. *তরফ এর ইতিকথা ১ম খণ্ড*, সৈয়দ হাসান ইমাম হোছেনী চিশতী; প্রকাশক: সৈয়দ মইনুল হাসান ১৯৮৭।

১৩. *তরফের ইতিহাস*, সৈয়দ আবদুল আগফর, উৎস সংস্করণ ২০০৮।

১৪. *তরফজ্যোতি-৪*, সম্পাঃ শাহ মনসুর আহমেদ সেলিম, তরফ সাহিত্য পরিষদ ২০১৫।

১৫. *দি লাস্ট মোগল*, উইলয়াম ড্যালরিম্পেল অনু. আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, ঐতিহ্য ২০০৭।

১৬. *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, পল্লব পাবলিশার্স ১৯৮৮।

১৭. *প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধে হবিগঞ্জ*, মুহম্মদ সায়েদুর রহমান; উৎস প্রকাশন ২০১১।

১৮. *প্রসঙ্গ বিচিত্রা*, সৈয়দ মোস্তফা কামাল; প্রকাশক: সৈয়দ মোস্তফা মুবিন ২০১০।

১৯. *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, ৯২তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উদযাপন স্মারক, বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র ১৯৯৭।

২০. *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসী শব্দের অভিধান*, সালাহ্উদ্দীন আহমেদ, প্রকাশ ১৯৯৩।

২১. *বাংলা সাহিত্যের পথিকৃত কোরেশী মাগন*, দেওয়ান মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান চৌধুরী; বন্ধন প্রকাশনী ১৯৯১।

২২. *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের ইতিহাস*, জে.এম. বেলাল হোসেন সরকার ও অন্যান্য, হাসান বুক হাউস ১৯৯২।
২৩. *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার কুমিল্লা*, সাধারণ সম্পাদক : মুহম্মদ হাবীবুর রশিদ (১৯৮১)।
২৪. *বাংলাদেশ : বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*, সম্পাঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাগর পাবলিশার্স ১৯৯১।
২৫. *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)*, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, সপ্তম সংস্করণ ১৯৮১।
২৬. *বাংলাদেশের ইতিহাস* সম্পাঃ ড. এম এ রহিম ও অন্যান্য, নওরোজ কিতাবিস্তান ১৯৮১।
২৭. *বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন*, কাজী আজহার আলী। সূচিপত্র ২০০৩।
২৮. *বাংলাপিডিয়া প্রথম খণ্ড*, সম্পাঃ সিরাজুল ইসলাম,বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৪।
২৯. *বাংলাপিডিয়া* অনলাইন ভার্সন, সংগ্রহ: ১৮-০৭-২০১৮।
৩০. *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, সিরাজুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি ১৯৮৯।
৩১. *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭)*, ড. আবদুল করিম; বড়াল প্রকাশনী ১৯৯৯।
৩২. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, আব্বাস আলী খান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১৯৯৫।
৩৩. *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, ডক্টর এম. এ. রহিম; বাংলা একাডেমি ১৯৮২।
৩৪. *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ওয়াকিল আহমদ, প্রকাশক: আনিসুর রহমান ১৯৯০।
৩৫. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, শ্রীসুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৭।
৩৬. *বাঙালীর ইতিহাস*, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়; প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬।
৩৭. *বিপিনচন্দ্র পাল*, মাহফুজুর রহমান; বাংলা একাডেমি ১৯৯৯।
৩৮. *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, সম্পাঃ মো. আবদুল আজিজ ও অন্যান্য; বৃহত্তর সিলেট ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ ১৯৯৭।
৩৯. *ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ইতিবৃত্ত*, সম্পাঃ শোয়েব চৌধুরী, প্রকাশক: এডভোকেট আবদুল লতিফ এম.পি ১৯৯৯।
৪০. *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ)*, অধ্যাপক কে. আলী, আলী পাবলিকেশনস ১৯৮৯।
৪১. *ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়*, লিওনার্দ মোজ্‌লে অনু. মোয়াজ্জম হোসেন, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৭।
৪২. *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের অবদান*, যতীন্দ্র রঞ্জন দে; শিলচর ১৯৯৮।
৪৩. *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, শ্রী কেদারনাথ মজুমদার; ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ ১৯৮৭।
৪৪. *ময়মনসিংহের বিবরণ*, শ্রী কেদারনাথ মজুমদার; ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ ১৯৮৭।
৪৫. *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, ইরফান হবিব, কে .পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী (কলিকাতা) ১৯৮৫।

৪৬. *মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা*, আসকার ইবনে শাইখ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৮।
৪৭. *মাসিক মদিনা* (৯৩ সংখ্যা) ১৯৯৩।
৪৮. *মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, রব্বানী চৌধুরী, ঢাকা ২০০০।
৪৯. *রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস*, শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, দ্বিতীয় অক্ষর সংস্করণ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।
৫০. *শিকড়ের সন্ধানে শিলালিপি ও সনদে আমাদের সমাজ চিত্র*, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী; প্রকাশক: সৈয়দা তাহেরা বেগম ২০০১।
৫১. *শিলহটের ইতিহাস*, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন; উৎস সংস্করণ ২০০৬।
৫২. *শ্রীহট্ট দর্পণ*, মৌলবি মাহাম্মদ আহমদ, প্রথম প্রকাশ: ১৮৮৬, উৎস সংস্করণ ২০০২।
৫৩. *শ্রীহট্ট প্রতিভা*, নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী; সিলেট ১৩৬৮ বাংলা।
৫৪. *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি*, মুফ্‌তি আজহারউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী; উৎস সংস্করণ ২০০২।
৫৫. *শ্রীহট্টে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন স্মৃতিকথা*, চঞ্চলকুমার শর্মা।
৫৬. *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত উত্তরাংশ*, অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, উৎস সংস্করণ ২০০২।
৫৭. *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ*, অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি; উৎস সংস্করণ ২০০২।
৫৮. *শ্রীহট্টের ইতিহাস*, প্রণয়ন ও প্রকাশনায় : শ্রী মোহিনীমোহন দাস গুপ্ত ১৯০৩।
৫৯. *সত্তর দশক : আত্মজীবনী*, বিপিনচন্দ্র পাল; যুগযাত্রী প্রকাশনী, কলিকাতা ১৩৬২।
৬০. *সিলেট : ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি।
৬১. *সিলেট পরিক্রমা*, ফজলুর রহমান, প্রকাশক: আব্দুল জলিল ২০০২।
৬২. *সিলেট বিভাগের ইতিহাস*, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী; প্রকাশক: সৈয়দা তাহেরা বেগম ২০০৬।
৬৩. *সিলেট বিভাগের পরিচিতি*, সৈয়দ মোস্তফা কামাল; রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স ২০০২।
৬৪. *সিলেট বিভাগের ভৌগলিক ঐতিহাসিক রূপরেখা বিবিধ*, সৈয়দ মোস্তফা কামাল; প্রকাশক: শেখ ফারুক আহমদ ২০১১।
৬৫. *সিলেট বিভাগের প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থা*, মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা। প্রকাশক : কানিজ ফাতিমা ১৯৯৮।
৬৬. *সিলেটে আমার বারো বছর*, রবার্ট লিন্ডসে, অনুঃ আবদুল হামিদ মানিক; মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট ২০০২।
৬৭. *সিলেটে ইসলাম*, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫।
৬৮. *সিলেটের একশত একজন*, ফজলুর রহমান; প্রকাশনায়: ফখরুল কবির খাঁ ১৯৯৪।
৬৯. *সিলেটের আরও একশত একজন*, ফজলুর রহমান; প্রকাশক: তবস্‌সুম রহমান ২০০০।
৭০. *সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন*, তাজুল মোহাম্মদ; আগামী প্রকাশনী ১৯৯৫।
৭১. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, ফজলুর রহমান; প্রকাশনায় : আলহাজ্ব এম. এ. সাত্তার ১৯৯১।
৭২. *সিলেটের সাহিত্য স্রষ্টা ও সৃষ্টি*, নন্দলাল শর্মা; প্রকাশক: আলহাজ্ব মোহাম্মদ বশির মিয়া ২০০৯।

৭৩. *সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান*, সম্পাঃ অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম ও ডক্টর সৈকত আসগর, রহমান গ্রুপ অব ইণ্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৩।
৭৪. *স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি*, নীরদকুমার গুপ্ত, শিলচর ১৯৭৪।
৭৫. *হজরত শাহ্ জালালও সিলেটের ইতিহাস*, সৈয়দ মুর্তাজা আলী; এ. বি. বুক ষ্টোর্স ১৯৭০।
৭৬. *হজরত শাহ্ জালাল (রহ.)*, শামসুল আলম; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৮।
৭৭. *হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড*, মুহম্মদ সায়েদুর রহমান। উৎস প্রকাশন ২০১০।
৭৮. *হবিগঞ্জ পরিক্রমা*, সম্পাঃ ডাঃ মোহাম্মদ আফজল ও সৈয়দ মোস্তফা কামাল, হবিগঞ্জ ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ।
৭৯. *হবিগঞ্জের ইতিহাস*, মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী; প্রকাশক: আখতারুন্নেসা নার্গিস ২০০৭।
৮০. *হবিগঞ্জের মুসলিম মানস*, সৈয়দ মোস্তফা কামাল; প্রকাশক : ডাঃ মোহাম্মদ আফজল ১৯৯১।
৮১. *হযরত শাহ্ জালাল কুনিয়াভি (রহ.)*, এ. জেড. এম শামসুল আলম, খোশরোজ কিতাব মহল ২০০১।
৮২. *হযরত শাহজালাল র.*, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫।
৮৩. *অপ্রকাশিত ডায়েরি*, ডা. মোর্তজা চৌধুরী।
৮৪. *A Brief History of the Surveys of the Sylhet District*, T. Shaw and A. B. Smith; Shillong, Assam Secretariat Press 1971.
৮৫. *Assam District Gazetteers*, B. C Allen, Vol. II.(Sylhet). Caledonian Steam Printing Warks 1905.
৮৬. *Bengal Past and Present*, N. K. Bhattasali.
৮৭. *Bangladesh District Gezetter Comilla*, General Editor : Nurul Islam Khan; Government Press, Dacca 1970.
৮৮. *East Pakistan District Gazetteers SYLHET*, General Editor : S. N. H. Rizvi M.A. East Pakistan Government Press, Dacca 1970.
৮৯. *Gazette notification* No. 176 G. J., dated the 10th January, 1922.
৯০. *Gazette notification* No. 4511 L.R., dated the 28th March, 1956.
৯১. *Gazetteer of Bengal and North East India*, B. C. Allen, E. A. Gait, Mittal Publications 1993.
৯২. *Genaral Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1867-68*, Calcutta, Secretariat Press 1868.
৯৩. *History of Bangladesh 1704-1971, Economic History*, Sirajul Islam (Edit.), Asiatic society of Bangladesh 2007.
৯৪. *Imperial Gazetteer of India Vol. xiii*, Ed. James Sutherland Cotton, Sir Richard Burn, Clarendon Press, Oxford 1908.

৯৫. *Indian Antiquary 1879*, Col. H. Yule.
৯৬. *Latter from the Collector of Sylhet to the Commissioner of Revenue*, 15 May 1843. Sylhet District Records, Letter Sent, Vol. 388.
৯৭. *Note on the Old Revenue Surveys of Bengal, Bihar, Orissa and Assam*, F. C. Hirst; (Thacker, Spink & Co. Calcutta, p-1, (f.n.)
৯৮. *Physical and Political Geography of the Province of Assam* 1896.
৯৯. *Population Census of Bangladesh-1974*. District Census Report Comilla.
১০০. *Principal Heads of the History and statistics of the Dacca Division* 1868.
১০১. *Report of the History and Statistics of the District of Sylhet*, A. L. Clay (ed.); Central Press Company 1868.
১০২. *Report on the Re-assessment of Ilam. Pratabgarh Taiyatwari and other Temporarily-Setted Estate in the District of Sylhet*, Giris Chandra Das.
১০৩. *Shahjalal*, Rajaniranjan Dev, Sylhet 1911.
১০৪. *A Statistical Account of Assam*, W W Hunter *Vol. II.(Sylhet)*, Spectrum Publication, Guwahati 1998.
১০৫. *THE AIN-I-AKBARI (Vol. 11)*, Abul Fazl Allami; Translated by H. Blochman.
১০৬. https://bn.wikipedia.org/wiki